NOT TO BE ISSUED

সাহিত্যিকী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা গবেষনা সংসদ

Bengali Manuscript Library

সাহিত্যিকী

সম্পাদক
গোলাম সাকলায়েন

NOT TO BE ISSUED

বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রিকা পরিষদ

ড. কাজী আবদুল মান্নান
ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
ড. আবদুর রহীম খোন্দকার
জনাব আবদুল খালেক মিয়া
জনাব এরাদত হোসেন মোল্লা
ড. গোলাম সাকলায়েন (সম্পাদক)

সাহিত্যিকী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

সাহিত্যিকী শরতে ও বসন্তে দু'বার প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য ও মৌলিক গবেষণা এবং ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা এই পত্রিকায় সাদরে গৃহীত হয়।

9713

গ্রাহক হ'তে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে

এজেন্টদের শতকরা ২৫ ভাগ কমিশন দেওয়া হয়। ১০ কপির কম নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। উপযুক্ত ডাক টিকিটসহ মূল্য পাঠালে পত্রিকা পাঠানো হয়।

প্রতি সংখ্যা পত্রিকার দাম ৮'০০ (আট) টাকা মাত্র।

M. L. 324
01 প্রতিষ্ঠান

বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
রাজশাহী।

নলেজ হোম
গভর্ণমেণ্ট নিউ মার্কেট,
ঢাকা-২

সাহিত্যিকী

সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গবেষণা পত্রিকা

১৪শ বর্ষ | বসন্ত সংখ্যা | ১৩৮৪

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১

মুহম্মদ মজিরউদ্দিন মিয়া
রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা :
দেশ-কাল ১৮৭৭—১৯১১ ২২

আবদুর রহীম খোন্দকার
ন্যাশোএল বা আনুষ্ঠানিক গীত-এর বাংলা ব্যাকরণ ৬১

মুখলেসুর রহমান
ধর্মের ষাঁড় ১০৯

আমানুল্লাহ আহমদ
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবার প্রেম :
'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১১৩

গোলাম সাকলায়েন
মোহাম্মদ মজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের
'বিলাতী বর্ণনা রহস্য' ১৫৪

ওয়াকিল আহমদ
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সাহিত্য ও মন :
একটি বিচার ১৯১

শাহানারা হোসেন
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও
বাঙালী মুসলিম নারী জাগরণ ১৯৯

পুস্তক সমালোচনা

আসাদুজ্জামান ২৩২

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল ২৪৮

গোলাম সাকলায়েন কর্তৃক বাংলা গবেষণা সংসদ, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত এবং মোঃ আবদুল লতীফ কর্তৃক ইউনিক প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

নিবেদন

'সাহিত্যিকী'-র বর্তমান সংখ্যা (১৪শ বর্ষ, ১৩৮৪) প্রকাশিত হ'ল। এই গবেষণা পত্রিকা-খানি যথারীতি নিয়মিতভাবে বের করার জন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট, কিন্তু নানা অসুবিধার কারণে বর্তমান সংখ্যাটি কিছিৎ বিলম্বে প্রকাশিত হ'ল বলে আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

যে কোন সমাজেই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কোন না কোন সংগঠনকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকে বাংলাদেশের মুসলিম জাগৃতির ইতিহাস আলোচনায় বহুকটি সমিতি বা সংগঠনের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'মহামেডান লিটারারী সোসাইটির কথা। ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড এলগিনের উৎসাহ ও সহযোগিতায় নবাব আবদুল লতিফ এ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে দেশী মুসলমানের সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টাই ছিল মহামেডান লিটারারী সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। নবাব আবদুল লতীফ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই সোসাইটির সঙ্গে জড়িত থেকে মুসলিম সমাজের চিন্তা-ধারার উন্নতি ও বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয় বলেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেন।

১। "Abdool Lateef founded in 1863 ... ... with the encouragement and co-operation of the then Viceroy Lord Elgin, the Mohamedan Literary Society of Calcutta"— An East Bengal Worthy : Nawab Bahadur Abdool Lateef by his son A. F. M. Abdool Ali. DACCA REVIEW. May 1911. Page 42.

২। আনিসুজ্জামান— মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৬— পৃঃ ৮৬।

পরবর্তী কালে ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (পরে 'সেন্ট্রাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে পরিচিত) নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহামেডান লিটারারী সোসাইটির ন্যায় এই সমিতিও ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। ইংরেজ শাসনের প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে এই এ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। লিটারারী সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ, অন্যদিকে ধীরে ধীরে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।[৩] ১৮৮২ সালে এই এ্যাসোসিয়েশন তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড রিপনের কাছে প্রেরিত এক স্মারকপত্রে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সরকারী চাকুরীতে তাদের দাবী প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সারা ভারতে ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ৫৩টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাত্র পূর্ববঙ্গেই সমিতির ৮টি শাখা ছিল।[৪] সমিতির নাম মহামেডান সোসাইটি হলেও যে কোন অমুসলমান এই সংগঠনের সদস্য হতে পারতেন।

উনিশ শতকে ঢাকায়ও দু'টি সংগঠন স্থাপিত হয়—'সমাজ সম্মিলনী' ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী।'

'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর।[৫] এর সম্পাদক ছিলেন মৌলবী ওবেদুল্লাহ্। জাতীয় উন্নতি

৩। আনিসুজ্জামান— প্রাগুক্ত— পৃঃ ৮৮।

৪। Syed Murtaza Ali— PERSONALITY PROFILES, 'Syed Amir Ali'— Dacca, 1965, Page 37-8.

৫। 'নব পত্রিকা' (১২৮৭ সন / ১৮৮০ ৮১ খৃঃ) — ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেস, মার্চ ১৮৮ । পৃঃ ২৪ ২৫।

সাধন ছাড়াও এই সম্মিলনীর একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সাধন। সম্মিলনীর এই উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করে :

> "পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ইদানীং হিন্দু ও মুসলমানদিগের ঐক্য সংস্থাপনার্থ স্থানে স্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল, ঢাকায় 'সমাজ-সম্মিলনী' নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। ... যাহাতে স্থানে স্থানে হিন্দু মুসলমানের একতা সংস্থাপনার্থ ঢাকার সমাজ সম্মিলনীর ন্যায় সভা সংস্থাপিত ও সভার উদ্দিষ্ট কার্য সুসম্পাদিত হয়,— এতদ্বিষয়ক বক্তৃতাদিতে সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা প্রদত্ত হইয়া যাহাতে উভয় জাতির মধ্যে একীভাব জন্মে, দেশহিতৈষিগণের সর্ব প্রযত্নে তদনুরূপ অনুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য।"[৬]

ঢাকা 'সমাজ সম্মিলনী সভা'র সাহায্যার্থে নবাব আহ্‌সানউল্লাহ্ খাঁ বাহাদুর তিনশত টাকা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে তিনি এই সভার 'অভিভাবক' হবেন বলে স্বীকৃত হন।[৭] ঢাকার 'পূর্ববঙ্গসম্ভূমি' গৃহে মাসে মাসে এই সভার অধিবেশন হতো। ১৮৮০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এমনি এক সভায় একজন টোলের পণ্ডিত ও জনৈক সুশিক্ষিত মুসলমান 'জাতিসাধারণ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা' ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন।[৮] এই সম্মিলনী এক বৎসরের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করেছিল কি না আমাদের জানা নেই। ১৮৮০ সালের পরে এই সমিতির ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে বিশেষ কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

৬। 'ঢাকা-প্রকাশ', ৭ বৈশাখ ১২৮৭ (১৮৮০ খৃঃ)।
৭। 'ঢাকা প্রকাশ'— ২৩ চৈত্র ১২৮৬ (১৮৮০ খৃঃ)।
৮। 'ঢাকা প্রকাশ', ৭ ভাদ্র ১২৮৭ (২২ আগষ্ট ১৮৮০ খৃঃ)।

'সমাজ সম্মিলনী সভা'র সম্পাদক মৌলবী ওবেদুল্লাহ্ বা ওবায়দুল্লাহ্ আল্ ওবায়দী সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ঢাকা মাদ্রাসা (পরবর্তী কালে 'ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ' বর্তমানে 'নজরুল ইসলাম কলেজ') ১৮৭৪ সালের ১৬ই মার্চ স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে তিনি হুগলী কলেজে ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এ সময় সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন তাঁর একজন প্রিয় ছাত্র। মৌলবী ওবেদুল্লাহ্ শুধু আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন না, ইংরেজী ভাষায়ও ছিল তাঁর অসাধারণ অধিকার। আমীর আলী ও মৌলবী ওবেদুল্লাহ্‌র যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৮৬৭ সালে সৈয়দ কেরামত আলীর 'মখযুল উলূম' গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ওবেদুল্লাহ্ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের ফার্সী গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন' এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত ফার্সী কাব্য 'দীওয়ান-ই-ওবায়দী' ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঢাকা মাদ্রাসায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আবদুল আজিজ (পরে খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত) ও কবি কায়কোবাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ, তাঁরই সুপারিশক্রমে কায়কোবাদ ডাক বিভাগের চাকুরী লাভ করেন।[১] ১৮৮৫ সালে মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর দৌহিত্র।

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ ওবায়দীর বিয়োগ দুঃখে শোকার্ত হয়ে ঢাকা কলেজের তদানীন্তন ছাত্র নওশের আলী খাঁ ইউসুফজী 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রেরণ করেন। 'ঢাকা প্রকাশের ন্যায় ক্ষুদ্রায়তন পত্রিকায়' উক্ত কবিতার সম্যক প্রকাশ সম্ভবপর

১। Syed Murtaza Ali— PERSONALITY PROFILES, 'Obaidullah Al-Obaidi Subrawardy,' 1965, P. 42.

নয়' বিবেচনার অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়। ঢেউ কলমিব্যাপী এই কবিতার শেষ দুটি স্তবক নিম্নরূপ :

ওবেদী দেশের হিত সাধিকার তরে
পোষিত যে মহামন্ত্র আপন অন্তরে—
হিন্দু আর মুসলমান
না হইলে একপ্রাণ
স্বদেশের সুখ আশা মরিচীকা সার,
ভারতের ভবিষ্যত কেবল আঁধার।
মাতৃভূমি সেবাব্রত করিতে সাধনা,
ওবেদী করিলা প্রাণে যে মন্ত্র জপনা,
দেশের জাতীয় প্রাণ,
না ধরিলে একতান,
দেশের দুর্দশা কভু না হবে মোচন,
ওবেদী জপিল মন্ত্র 'সমাজ মিলন'।[১০]

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্‌র প্রিয় ছাত্র আবদুল আজিজও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ওবেদী বিয়োগ নামে একটি শোকগাঁথা প্রকাশ করেন (ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মার্চ ১৮৮৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮, দাম ছ' পয়সা)।

'সমাজ সম্মিলনী' ক্ষণস্থায়ী হলেও তা ঢাকার তদানীন্তন মুসলমান সমাজে যে বিশেষ চেতনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নব্যশিক্ষিত তরুণ ছাত্রসমাজ আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছুদিনের মধ্যে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের নাম 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'।

১০। 'ঢাকা প্রকাশ', ১০ চৈত্র ১২৯২ (২২ মার্চ ১৮৮৫)।

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' বা Dacca Mohammedan Friends Association ১৮৮৩ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১] মুসলমান সমাজের হিত সাধনই এই সমিতি বা সম্মিলনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নানা কারণে প্রথম কয়েক বৎসর সম্মিলনীর কার্যাবলী প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীতে সম্মিলনীর সম্পাদক আব্দুল মজিদ বি. এ. লিখেছিলেন: "বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও সেই সময় সম্মিলনী কেবল শৈশবাবস্থায় থাকায় এবং স্থানীয় লোকসমূহ হইতে যথোপযুক্ত সহানুভূতি না পাওয়াতে বিশেষতঃ এক কালে সেই উচ্চতর আশা সম্পন্ন হওয়া কষ্টকর বিধায় সভা গত বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবতী হইয়াছিলেন।" সম্মিলনীকে প্রথম বৎসর বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি এবং সভ্যগণের পরিশ্রম ও চেষ্টায় সম্মিলনী সে বাধা অতিক্রমে সক্ষম হয়।

সম্মিলনীর সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা নির্ধারিত হয়েছিল ন্যূনপক্ষে দু' আনা। প্রতিষ্ঠাকালে চাঁদাদাতা সভ্যের সংখ্যা ছিল ২৩

১১। 'The First Annual Report of the Dacca Mohamedan Friends Association: 1883. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণ ১৮৮০ সাল।' গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৮৪। পৃষ্ঠা— ১।

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল আহমদ হাসান দানী রচিত 'Dacca' (১৯৮৩, পৃঃ ১২১) গ্রন্থে, আজিমুল্লান হারদয়ের সম্পাদিত 'A City and its Civic Body' (১৯৬৬, পৃঃ ২২) গ্রন্থে এবং সুফিয়া আহমদ রচিত 'Muslim Community in Bengal, 1884-1912' (১৯৭৩, পৃঃ ২৪৮-৪৯) গ্রন্থে লিখিত হয়েছে ২৪শে মে ১৮৮০। তারিখটি ভুল।

এবং বার্ষিক আয় ছিল মাত্র সাড়ে চার টাকা। কার্যনির্বাহক বা অধ্যক্ষ সমিতির সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হতো। অধ্যক্ষ সমিতির সম্মতিক্রমে 'অশক্তিপ্রযুক্ত চাঁদা না দেওয়া সত্ত্বেও কয়েকজনকে সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত করা হয়েছিল। এক বৎসর পর সম্মিলনীর সভ্যসংখ্যা হয় ৪৩ এবং তৃতীয় বৎসরে সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১০২।

নিম্নলিখিত কয়েকজনকে নিয়ে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয়েছিল :—

"নৌলভী হিম্মত আলী বি. এ.—সভাপতি ও প্রতিনিধি
আবদুল মজিদ—সম্পাদক ও প্রতিনিধি
হেমায়েত উদ্দিন—সহকারী সম্পাদক ও প্রতিনিধি
মোহাম্মদ রহীম—সহকারী সম্পাদক ও প্রতিনিধি
মকবুল আহমদ—কোষাধ্যক্ষ
আজার আলী—মফস্বল প্রতিনিধি
মজ্জেহুর হোসেন—মফস্বল প্রতিনিধি
সৈয়দ হজরত আলী—মফস্বল প্রতিনিধি
মাহাম্মদ ফাজেল—মফস্বল প্রতিনিধি
নওয়াজেস আলী—মফস্বল প্রতিনিধি
মাহাম্মদ ছাদেক—মফস্বল প্রতিনিধি

সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে পরবর্তী-কালে 'নৌলভী মোহাম্মদ রহীম সাহেব' সভ্যশ্রেণী থেকে অবসর গ্রহণ ও কর্মচারীপদ পরিত্যাগ করেন এবং সেপদে নৌলভী আজমল আলী সাহেব নিযুক্ত হন।

সম্ভবতঃ ঢাকা বাহাদুরগঞ্জের মুন্সি নূরবক্স সাহেবের বাসায় সম্মিলনীর দফতর ছিল। তাই প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণীর শেষ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় :—

বিজ্ঞাপন

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর নিকট কেহ কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে অথবা কোন পত্র লিখিবার আবশ্যক হইলে ঢাকা কলেজে অথবা ঢাকা নাহতটুলী শ্রীযুক্ত মুন্সি নূরবক্স সাহেবের বাসায় সম্পাদকের নিকট লিখিলেই হইবে।

আবদুল মজিদ
সম্পাদক।

সম্মিলনীর সভাপতি জনাব হিম্মত আলী ১৮৮১ সনে হুগলী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা কালে তিনি ঢাকা কলেজে বি. এল. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। উক্ত কলেজ থেকে তিনি ১৮৮৬ সনে বি. এল. পাশ করেন।[১২]

জনাব আবদুল মজিদ নোয়াখালী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৪ সনে বি. এ. এবং ১৮৮৬ সনে বি. এল. পাশ করেন।

জনাব হেমায়েত উদ্দীন ১৮৮৬ সনে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি বরিশালের একজন সুপরিচিত শিক্ষাবিদ্ ছিলেন। পরে তিনি খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।[১৩]

জনাব মোহাম্মদ রহীম বা আহাদুর রহীম আহিদ (পরে স্যার আহিদ সোহরাওয়ার্দী নামে খ্যাত) ১৮৮৬ সনে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি মৌলবী ওবায়দুল্লাহর জামাতা এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা।

১২। মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্—সেকালের গ্রাজুয়েট, 'মাসিক মোহাম্মদী', মাঘ ১৩৪৭। পৃষ্ঠা ২৮৩-২৮৪।

১৩। সৈয়দ মুর্তাজা আলী—সেকালের মুসলমান গ্রাজুয়েট, 'মাহে নও' অগ্রহায়ণ ১৩৭৩। পৃষ্ঠা ৮।

জনাব আজমল আলী বা নকবুল আহমদের কোন পরিচিতি পাওয়া যায়নি। ১৮৮৬ সন পর্যন্ত ঢাকা কলেজ থেকে যাঁরা বি. এ. বা বি. এল, পাশ করেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকায় এ দু'জনের নাম নেই।

কার্যনির্বাহক সভার সভ্য না হলেও সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল আজিজ (পরে খান বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত)। তিনি সম্মিলনীর সভাপতি হিম্মত আলীর অনুজ। তিনি ১৮৮৬ সনে বি. এ. পাশ করেন। আবদুল আজিজ দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি 'কবিতা কলিকা' ও 'ওবেদি বিয়োগ' নামে দুটি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। অধ্যাপক আবুল ফজলের মতে—

> "[ওবেদি-বিয়োগ গ্রন্থে] যে সুন্দর মার্জিত ভাষা, বেগবান ছন্দ ও ভাব আছে সেকালের মুসলমান রচিত সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। ইতিহাসের দিক হইতেও এই পুস্তক খানির মূল্য অত্যন্ত বেশী; সেই পুঁথি-সাহিত্যের দোভাষী ভাষা-প্রপীড়িত পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন সুন্দর, সাধু, মার্জিত বাংলা লেখা মুসলমান লেখকদের পক্ষে সত্যই বিস্ময়কর"।[১৪]

সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোয়াজউদ্দীন আহমদও ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৮৮০ সনে তিনি সম্মিলনীর কাজে ঢাকায় কিছুদিন অবস্থান করেন। আত্মজীবনীতে তিনি বলছেন :

> "ঢাকা নগরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কার্যের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধে—বিশেষতঃ

১৪। আবুল ফজল—ওবেদি-বিয়োগ। 'বুলবুল', পৌষ চৈত্র, ১৩৪০। পৃঃ ২৪১।

> অক্লান্ত কর্মী সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল আযিয, বি. এ, মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন"।[১৩]

পরে আর একবার ঢাকায় এসে তিনি ৬ মাস সম্মিলনীর কাজে সহযোগিতা করেছিলেন।

মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ বালিকাদের শিক্ষার জন্য 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র অনুরোধে 'তোহ্‌ফাতুল মোস্‌লেমিন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ রচিত হয়।[১৪] অন্যত্র ('পাক-পাঞ্জেতন'-এর ভূমিকায়) রেয়াজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন :

> 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (তোহ্‌ফাতুল মোসলেমিন গ্রন্থের) ছাপার আংশিক ব্যয় প্রদান পূর্বক অনেকগুলি পুস্তক গ্রহণ করিয়াছিল"।[১৫]

সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে ঢাকার 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল প্রেসে'র কর্তৃপক্ষ সভার অনুষ্ঠানপত্র অর্ধমূল্যে মুদ্রিত করেন।

১৫। মোহাম্মদ ইদরিস আলী রচিত 'মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ' (পৌষ ১৩৬৫) গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত— পৃঃ ২৬।

১৬। সৈয়দ এমদাদ আলী—'মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন'—মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪০। পৃঃ ৪২৩।

১৭। প্রাগুক্ত 'মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত (পৃঃ ৩৩)।

প্রথম বৎসর "ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী"র সাধারণ সভার চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভার অধিবেশনের জন্য ঢাকা মাদ্রাসার তদানীন্তন সুপারিন্টেডেন্ট মৌলবী ওবেদুল্লাহ্ সাহেব মাদ্রাসাগৃহ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। ৪র্থ অধিবেশনে বরিশাল নিবাসী মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্পর্কে একটি ভাষণ প্রদান করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম বৎসর সম্মিলনীর প্রধান কার্য ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। যে উদ্দেশ্যে 'প্রথম বার্ষিক শ্রেণী থেকে শুরু করে ৫ম বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা নির্বাচন এবং উক্ত পাঠ্য-তালিকা অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। বাংলা এবং উর্দু—দু'ভাষার মাধ্যমেই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষার নিয়মাবলী নিম্নরূপ—

১। "বঙ্গবাসী যে কোন মুসলমান মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়ম মত দিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

২। মহিলাগণ আপন আপন অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ব স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

৩। মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

৪। কোন পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষার সময় পুস্তকের কোন ব্যক্তির অথবা অন্য কোন প্রকারের সাহায্য গ্রহণ করিলে তাঁহার পরীক্ষা গৃহীত হইবে না।"

পরীক্ষার এই নিয়ম অনুসারে ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মন-সিংহ এবং কলকাতা থেকে মোট ৩৭ জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল—১৪ জন উর্দু ভাষায় ও ২৩ জন বাংলা ভাষায়। তন্মধ্যে উর্দু বিভাগে ১২ জন এবং

বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। প্রথম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা ১৮৮৩ সালের ২৬শে মে নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কৃতী ছাত্রীদের বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। মৌলবী রেয়াজউদ্দীন আহমদ পুরস্কারের জন্য তাঁর রচিত 'বোধোদয় তত্ত্ব' ১১ কপি এবং 'পদ্যপ্রসূন' ৭৫ কপি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার তৃতীয় বৎসরে কলকাতা, হুগলি, ঢাকা, শ্রীহট্ট নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থান থেকে অনেক বালিকা পরীক্ষা দেয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় ৮০/৯০ টাকা মূল্যের নানারূপ দ্রব্য পুরস্কার প্রদত্ত হয়। ১৮৮৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার একটি বিবরণ 'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত হয় :

> "আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর তৃতীয় বার্ষিকী পুরস্কার প্রদর্শন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সভাস্থলে যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতী জন্মিয়াছে, ঢাকার মুসলমান সমাজ নিস্তেজ নহে। ঢাকার প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী বৃদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৌলবী গোলাম মাওলা, মৌলবী রেয়াউদ্দীন আহম্মদ, মৌলবী হাসান আলী, মৌলবী রেজায় করিম, চৌধুরী আবদুল গফুর প্রভৃতি জমিদার এবং মৌলবী আবুল খায়র মহাম্মদ ছিদ্দিক এম. এ. সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঢাকা মাদ্রাসা ও পণ্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত অধ্যাপক ঢাকা কলেজ ইত্যাদি গণ্যমান্য লোক ও বহুতর মুসলমান ছাত্র সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সুবিজ্ঞ সভাপতির ক্রীড়াময়ী ভাষা, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহোদয়ের সারগর্ভ সংক্ষেপ উক্তি এবং বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তেজস্বিনী বক্তৃতা সমস্তই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।.....

মাত্র দুই বৎসরে সম্মিলনীর কার্যক্ষেত্র যেরূপ প্রশস্ত, আয় যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সভার অনুষ্ঠাতৃদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া পারিনা। আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে ঢাকার মুসলমান সমাজের শিরোভূষণ শ্রীযুক্ত নবাব আবদুল গণি বাহাদুর এই হিতকর কার্যে তাঁহাদের সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।[১৮]

'ঢাকা প্রকাশে' প্রকাশিত এই সংবাদের শেষাংশে ঢাকার নবাব বাহাদুরদের সাহায্য ও সহানুভূতি যাচ্ঞা করা হয়। 'ঢাকা সমাজ সম্মিলনী'র সাহায্যার্থে নবাব আহসানউল্লাহ্ খাঁ যেমন ৩০০ টাকা দান করেছিলেন, সুহৃদ সম্মিলনীর বরাতে অনুরূপ কোনও দানের কথা জানা যায় না। তার কারণ হয়তো এই যে 'সমাজ সম্মিলনীর' সঙ্গে যেমন ছিলেন মৌলবী ওবেদুল্লাহ্, 'সুহৃদ সম্মিলনীর' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অনুরূপ কোনও ব্যক্তিত্ব। এই সম্মিলনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন যাঁরা—তাঁরা ছিলেন কলেজের ছাত্র অথবা সদ্য-স্নাতক কয়েকজন প্রাণদীপ্ত তরুণ যুবক। তাঁদের ছিল না বিত্ত অথবা পদমর্যাদা, কিন্তু তাঁদের ছিল উদ্যম, কর্মস্পৃহা এবং সমাজসেবার অদম্য আগ্রহ।

'সুহৃদ সম্মিলনী' জনসাধারণের কাছ থেকেও খুব বেশী সাহায্য পায়নি। ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠান পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সাহায্য-তালিকা দেখলেই তা বুঝা যায়। তাতে সর্বোচ্চ সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৫ টাকা। সম্মিলনী স্ত্রীশিক্ষা ছাড়া অন্য কোন জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিল না বলেই হয়তো এর ক্রিয়াকর্মে সাধারণের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, স্ত্রীশিক্ষার জন্য পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের এরূপ ব্যবস্থা সমসাময়িককালে বহু সমিতি বা সম্মিলনীরই কার্যপ্রণালীর

১৮। 'ঢাকা প্রকাশ', ৬ পৌষ ১২৯২ (২০ ডিসেম্বর ১৮৮৫)।

অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত এজাতীয় সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'শুভসাধিনী সভা' (প্রতিষ্ঠা-১৮৬৯), 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' (প্রতিষ্ঠা-১৮৭০), 'গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভা' (প্রতিষ্ঠা-১৮৮০)।

১৮৮৬ সালের শুরুতে সম্মিলনী নতুন কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করে। '১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্রে' সম্পাদক মুসলমান সমাজের তদানীন্তন অবস্থা ব্যাখ্যা করে সুদৃঢ় সম্মিলনীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমান জাতির সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন। বিদ্যাশিক্ষাই জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায় বিবেচনায় সম্মিলনী ১৮৮৬ সালের দিকে কার্যক্রম স্ত্রীশিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে পুরুষ শিক্ষার উন্নতি বিধানেও মনোযোগী হয়। কৌতূহলী পাঠকদের জন্য ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্রের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

> ...ভ্রাতৃগণ! আপনারা বঙ্গীয় মুসলমানদিগের বর্তমান দুরবস্থার কথা একবার নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখেন কি। বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ কি নিমিত্ত অবনতির চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়াছেন আপনারা কখনও তাহার প্রকৃত কারণানুসন্ধান করিয়া থাকেন কি? "শিক্ষা" এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে অন্তঃকরণে স্বতঃস্বতই একটি অচিন্তানীয় ও অভাবনীয় ভাব সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষাই মনুষ্য জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ইহার অভাবে কেহ উন্নত অবস্থা-পন্ন হইতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে না। আজ উনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে সর্বত্র উন্নতির যে একটি প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে যে তরঙ্গের অভিঘাতে পৃথিবী এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোড়িত হইয়াছে তাহাও কেবল বিদ্যা শিক্ষারই প্রভাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের নিজীব মুসলমান-বৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব।...

...বর্ত্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারেন এই সকল গুরুতর কার্য সম্পাদনের জন্য "মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবার হইতে আমরা কর্ত্তব্য পথে আরও একটু অগ্রসর হইব এরূপ মনে করিয়াছি। অর্থাৎ আমাদিগের সভার আয়ের কিয়দংশ জাতীয় পুরুষশিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে।

...ঝিনুক দ্বারা সমুদ্র সিঞ্চন আর এই সভার এহেন সামান্য আয়ের দ্বারা মুসলমানদিগের পুরুষশিক্ষার উন্নতি বিধান করা উভয়ই সমান। এই নিমিত্ত আমরা সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, আপনারা জাতীয় অভাব দূরীকরণার্থে, জাতীয় উন্নতি সম্পাদনার্থে, পবিত্র মহম্মদীয় নীতির অনুমোদিত এরূপ একটি গুরুতর কার্যে সাহায্য প্রদান করিতে অগ্রসর হউন। হায়! আপনাদের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান দুরবস্থার তুলনা করিয়া কি কখনও আপনারা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন না?...

...আজ মুসলমানগণ আপনাদের দুরবস্থা পরম্পরায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট আসন লাভ করিবার অনুপযুক্ত ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? স্মরণ করিতেও বিজাতীয় মর্ম্মবেদনায় নিপীড়িত ও নিরাশার তীব্র বিষে বিকলচিত্ত হইতে হয়। আর কতকাল আমরা এই অজ্ঞান তামসে সমাচ্ছন্ন থাকিব?

...পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকদিগের স্বধর্মের প্রতি যেরূপ অনাস্থা এবং অনাদর তাহা স্মরণ করিলেও অভাবনীয় মর্মপীড়ায় নিপীড়িত হইতে হয়। পূর্ব পুরুষদিগের অবিশ্রান্ত ধর্মাচরণের সহিত আমাদের উদাসীনতার তুলনা করিলে তাঁহাদের বংশধর বলিয়া গৌরবান্বিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, আপনাদিগকে তাঁহাদিগের সহিত একজাতীয় জীব বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়।

বৈষয়িক কার্যানুরোধে এদেশীয় মুসলমান বালকদিগকে মাতৃভাষা বাঙ্গলা এবং রাজভাষা ইংরেজী পড়িতে হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কুত্রাপিও ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্তই নাই। তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংরেজী এবং বাঙ্গলা শিক্ষার বিরোধী বাস্তবিক ধর্ম শিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ধর্মপ্রবণ প্রাচীন সম্প্রদায় যে এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য কি? এই সকল শোচনীয় অভাব দূরীকরণার্থে "মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী" আমাদের সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম শিক্ষার কোন প্রকার উপায় অনুষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বিধিমত যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বালকদিগের স্মরণ করা আবশ্যক যে সম্মিলনীর সহায়তা অপেক্ষা নিজ নিজ চেষ্টার উপরই তাহাদের ধর্মশিক্ষা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে"।[১১]

১১। 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী — ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র'। পৃঃ ১-৭

অনুষ্ঠানপত্রের শেষে সম্পাদকের নাম মুদ্রিত হয় 'আবদুল মজিদ বি. এ. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত এই অনুষ্ঠান পত্রে সম্পাদকের নাম 'আবদুল

১৮৮৬-৮৭ সালে সম্মিলনী পুরুষ শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কারণ সম্ভবতঃ অর্থাভাব। সে বছর সভার আয় ছিল ২৩৩ টাকা ২ আনা ৫ পাই এবং ব্যয় ১৪০ টাকা ৪ আনা ১৩ মাত্র। ১৮৮৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী জগন্নাথ স্কুলের গৃহে মুহূদ সম্মিলনীর ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণীতে প্রকাশ, ১৮৮৬-৮৭ সালে সম্মিলনীর প্রয়ত্নে কলকাতা, হুগলি, বরিশাল, শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ থেকে ৪৭ জন বালিকা বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১৮৮৭ ও ১৮৮৮ সালে সম্মিলনীর কর্মপরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' সূত্রে জানা যায় :—

> "সম্মিলনী ১৮৮৭ সনে ৬ জন ছাত্রকে এবং একটি পাঠশালাকে মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। এ বৎসর তাঁহারা ১ জন ছাত্রকে এবং একটি পাঠশালাকে মাসিক সাহায্য দিতেছেন। তন্মধ্যে ২ জন ছাত্র কলেজে, ১ জন মেডিকেল স্কুলে, ২ জন আরবি ও অপর ৪ জন ইংরেজি ও বাঙ্গলা পড়েন। এতদ্ব্যতীত পীড়িত ও অসহায় দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করাও সম্মিলনীর অন্যতম কর্তব্য। সম্মিলনী ২।৩ জন পীড়িত ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন এবং কর্মচারীগণ তাহাদের শুশ্রূষা করিয়াছেন। কলিকাতা এবং মোড়াগালে সম্মিলনীর ২টি শাখা সভা এবং বরিশাল টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে সম্মিলনীর এজেন্ট নিযুক্ত আছেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী সিরাজল

মজিদ' কলমের কালিতে কেটে লেখা হয় 'আবদুল আজিজ' এবং তাঁর নীচে ইংরেজীতে স্বাক্ষর — 'Abdul Aziz Sec. সম্ভবতঃ ১৮৮৬ সালে বি. এ. পাশ করার পর আবদুল আজিজ কিছু দিনের জন্য সম্মিলনীর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

২০। 'ঢাকা প্রকাশ' — ২ ফাল্গুন ১২৯৩ (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭)।

ইসলাম খাঁ বাহাদুর সাহেব কলিকাতায় শাখা সভার সভাপতি"।[২১]

মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সপ্তম বৎসরে (১৮৮৮-১৮৮৯) কার্য-নির্বাহক সভার গঠন নিম্নরূপ ছিল :—

মৌলবী আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এম. এ. (ঢাকা কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট)— সভাপতি

কাজী নাজিউদ্দীন (জমিদার) ও মৌলবী সৈয়দ আওলাদ হোসেন (স্পেশিয়াল সাব রেজিষ্ট্রার)— সহকারী সভাপতি

আবদুল মজিদ বি. এল. (অডকোর্টের উকীল)— সম্পাদক

অলিউর রহমান (শিক্ষক, নাকু মাদ্রাসা)— সহকারী সম্পাদক

সৈয়দ এমদাদ আলী (ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও পার্বত্য এসিষ্টেন্ট) সদস্য

আবদুল গফুর (শিক্ষক, নাকা মাদ্রাসা)— সদস্য

হাফেজ আবদুল্লাহ্ (অধ্যাপক)— সদস্য

আবদুল মুমিন (আরবী ও পারসী অধ্যাপক)— সদস্য

আবদুল ওয়াহিদ বি. এ. (শিক্ষক মাদ্রাসা)— সদস্য

আবদুল হক বি. এ. (মুন্সেফ রেজিষ্ট্রার কাছি)— সদস্য

মোহাম্মদ হাসান বি. এ. (রেজিষ্ট্রার অফিসের হেডক্লার্ক)— সদস্য

এ ছাড়া এ সময়ে নবাব পরিবারের খাজে মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, খাজে মোহাম্মদ মসলুম সাহেব, খাজে আবদুল লতিফ সাহেব, জমিদার সৈয়দ গোলাম মোস্তফা সাহেব, সৈয়দ হাসান আলী সাহেব, কাজি নিজামউদ্দীন সাহেব প্রভৃতি ঢাকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণ সম্মিলনী সভার সভ্য[২২] ছিলেন বলে জানা যায়।

২১। 'ঢাকা প্রকাশ'— ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৫ (ডিসেম্বর ১৮৮৮)।

২২। 'ঢাকা প্রকাশ' ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৫।

প্রথম বৎসরের কার্যনির্বাহক সভার সঙ্গে তুলনায় সপ্তম বৎসরের কার্য-নির্বাহক সভার একটি বিশিষ্টতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে এই সভার সদস্যগণ এই শহরের সাধারণ ব্যক্তি অথবা বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সম্মিলনী শুধুমাত্র তরুণ যুবসমাজ বা ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নবাব পরিবারের ও কয়েক জন এ-সময়ে সম্মিলনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আমাদের দেশে জনহিতকর সংগঠনের আয়ু সাধারণতঃ দীর্ঘ হয় না। কারণ প্রধানতঃ অর্থাভাব ও নিঃস্বার্থপরায়ণ কর্মীর অভাব। এ দুটি কারণে মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কর্মোদ্যমও ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। ১৮৮৯ সাল থেকে এর ক্রিয়াকর্মের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে আবার শেষবারের মত সম্মিলনীর নাম দেখতে পাই।

১৯০৩ সালের শেষে ঢাকা ও ময়মনসিংহ নিয়ে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব ঘোষণা করা হয়। এখন থেকে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অনুষ্ঠিত বিরাট সাধারণ জনসভায় মুসলমান-দের মধ্যে বক্তৃতা করেন বালিয়াদীর জমিদার চৌধুরী কাজেম উদ্দীন আহম্মদ সিদ্দিকী।[২০] তাঁর প্রচেষ্টায় ২৫শে জানুয়ারী (১৯০৪) ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 'ঢাকা প্রকাশ' সূত্রে জানা যায় :

> "বালিয়াদীর খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত চৌধুরী কাজেম উদ্দীন আহাম্মদ সিদ্দিকী সাহেবের যত্নে গত ২৫শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়, উক্ত সাহেবের ঢাকা বেচারামের দেউরীস্থিত বাটীর প্রাঙ্গনে 'ঢাকা মহম্মদীয়ান ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন

২০। 'ঢাকা প্রকাশ', ২৬ পৌষ ১৩১০ (১০ জানুয়ারী ১৯০৪)।

এসোসিয়েসনের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ঢাকা বয়রসিংহ আসামভুক্ত হওয়ার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জন্য একটি সভা আহূত হয়।... প্রায় ৩০০ জন সভ্য তথায় উপস্থিত ছিলেন।... মহসীন ফাণ্ডের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলে শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া সকলেই বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত গভর্ণমেণ্টের নিকট বর্ত্তমান প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন"।[২৪]

লক্ষণীয় বিষয়, প্রধানতঃ শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায়ই মুসলমানেরা আসামের সঙ্গে ঢাকা-ময়মনসিংহ অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। ১৯০৪ সালেই ফেব্রুয়ারী মাসে লর্ড কার্জন ঢাকা-ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম সফর ক'রে জনসাধারণের প্রতিবাদের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করেন। পূর্ব পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে তিনি আসাম ও পূর্ববঙ্গের সম্মিলিত প্রদেশ গঠন ও ঢাকায় প্রদেশের রাজধানী স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। সে প্রস্তাব প্রায় সর্বস্তরের মুসলমানের কাছে অভিনন্দিত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর এই নতুন প্রদেশ গঠিত হয় এবং সে দিনই ঢাকার নবাবগৃহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় **Mahomedan Provincial Union** নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সভার অস্তিত্ব লোপ পায়।[২৫]

সুহৃদ সম্মিলনীর আয়ু মাত্র ১২ বৎসর। 'জাতির সার্বিক উন্নতি সাধন' — এই মহৎ প্রেরণা নিয়ে কয়েকজন তরুণ যুবক যে সংগঠন গড়ে তুলেছিল, পরবর্তী কালে তার সঙ্গে যুক্ত হলেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সম্মিলনীর অর্থাভাব ছিল।

২৪। 'ঢাকা প্রকাশ', ১৭ মাঘ ১৩১০,(৩১ জানুয়ারী ১৯০৪)।

২৫। Ahmed Hasan Dani, 'Dacca', 2nd edn, 1962. Dacca ; Page 123.

কিন্তু অভাব ছিল না কর্মীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী কালে পুরুষ শিক্ষা এবং সমাজসেবার মধ্যে কর্মসূচী সম্প্রসারিত হয়। এমন কি শেষ দিকে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিয়ে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও সম্মিলনীর কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তাদের সামর্থ্য ছিল ক্ষুদ্র, আয়ুও ছিল স্বল্পকালীন — তবু মুহূর্তের জন্য হলেও তারা সচকিত করেছিল, চোখ মেলে তাকিয়েছিল নিজেদের দিকে এবং বাইরের জগতের দিকে। ইতিহাসে যেমন কোন তুচ্ছ ঘটনাই তুচ্ছ নয় ঠিক তেমনি, সমাজের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও 'সুহৃদ সম্মিলনী'র ন্যায় ক্ষুদ্র ও স্বল্পকালীন সংগঠনের অবদান নিতান্ত সামান্য নয়।

9713

রবীন্দ্র-ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশ-চেতনা ঃ দেশ-কাল ১৮৭৭-১৯১১

মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া

।। এক ।।

সাহিত্য-শিল্প স্বয়ংভূ নয়, বরং দেশকালসাপেক্ষ — সমাজ স্বদেশ এবং জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কাল ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ-মানসে যে তরঙ্গ-কম্পন জাগে, বিশেষ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে নতুন সংস্কারে।[১] বস্তুত, কোন কালের সাহিত্যই পারিপার্শ্বিক জীবন ও বাস্তব-প্রেক্ষিতকে অস্বীকার করতে পারে না :

> 'যেমন ভূস্তর পর্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি-উদ্গম, আগ্নেয়, ভূমিসঞ্চরণ, কালে কালে ভূমি পরিবর্তের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্ধারিত করিয়া বিচিত্র সৃজনী শক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন — তেমনি যে সকল প্রলয় শক্তি ও সৃজনী শক্তি মনুষ্যত্বকে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে, সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়।'[২]

প্রাচীন সাহিত্যে সামাজিক চেতনা ছিল গৌণ। মধ্যযুগের বাংলা কাব্য — বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্যসমূহ, রোমান্টিক আখ্যানকাব্যসমূহ এবং ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন পারিপার্শ্বিকতা এবং কিছু কিছু বাস্তব চিত্র। চতুর্দশপদের সাহিত্যের চিত্র অর্থনৈতিক

বাস্তবতা ও জীবন ধারার পরিচয়, তবে এ-সব 'বিশুদ্ধ সমাজ-সচেতন শিল্প'[৩] নয় এবং ঐ সকল নিদর্শনে 'সমসাময়িক বাংলাদেশেরও বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই'।[৪] ইংরেজের বঙ্গ বিজয় (১৭৫৭ খ্রীঃ) ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান ঘটিয়ে পত্তন করেছে আধুনিক যুগের এবং বাঙালী জাতিকে পরিচালিত করেছে এক আশ্চর্য নিয়তিপথে।[৫] পরাজয়ের গ্লানি এবং সুদীর্ঘ বঞ্চনার মাঝেও ইয়োরোপের জন্য শক্তি বহন করে এনেছিল ফারাস্তরের বাণী।[৬]

ব্রিটিশ বিজয়ের পর কোম্পানি-সরকারের সাম্রাজ্য-বিস্তার, বাণিজ্য-প্রসার, প্রশাসনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শ্বেতাঙ্গকর্মচারী ও ফিরিঙ্গি-মুৎসুদ্দিগণের অবাধ শোষণ এবং অরাজক-পদ্ধতির ভাগ্যোন্নয়ন-প্রয়াস চলেছে পরবর্তী অর্ধশতাব্দী। শাসক শ্রেণীর নির্যাতন ও নানারূপ ভাঙা-গড়ার মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কিছুসংখ্যক বাঙালির মধ্যে এই আত্মজাগরণ-বাসনা। ইয়োরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস ও জীবনবোধের স্পর্শে বাঙালির মধ্যে এই আত্মপ্রত্যয়ের সূচনা প্রত্যক্ষ করা যায়। রামমোহন রায়ের কলকাতা বাস আরম্ভ কাল, ১৮১৫-'১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।[৭] ঐতিহাসিকগণ এই আত্মজাগরণকে আখ্যায়িত করেছেন রেনেসাঁ নামে। বাংলার রেনেসাঁ ইয়োরোপীয় রেনেসাঁর মত কর্মধারী ছিল না, কারণ এদেশে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় সম্পূর্ণ পরাধীন পরিবেশে এবং তা বাইরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ।[৮] তবু, ক্রমাগত কালের প্রবাহে দীর্ঘতোয়া নবজাগৃতি রেখাটী স্রোতস্বিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ (১৪৫০-১৮৫০) যেমন সামন্তবাদ থেকে গণতান্ত্রিক জীবনে উত্তরণ ঘটিয়েছে; ভিক্ষি-কোপারনিকাস, গলটেয়ার-নিলবেগানের জন্ম দিয়েছে, বিপুল বিজ্ঞান-অভিযাত্রার দ্বারা জাতিকে সমৃদ্ধির তুঙ্গ-শিখরে পৌঁছে দিয়েছে; বাংলার রেনেসাঁও তেমন না হলেও রামমোহনের ধর্মীয় পুনর্গঠন ও সংস্কারসাধন, মধুসূদনের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাব সম্মিলনমুখী মহাকাব্য, তাঁর দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ, ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশ-বোধ, বঙ্কিমচন্দ্রের নবজীবনবাদ বাঙালিকে নতুন আশায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আর এই সব আশা-এষণার অবিমুরিণীয় পরিণতি ঘটল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনসাধনায়।

।। দুই ।।

রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনার কাল-সীমা হল প্রাপ্ত বয়স্কতার যুগ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত। চৌষট্টি বৎসর (১৮৭৭-১৯৪১) ধরে তিনি তাঁর গল্পগুলি লিখেছেন — এই সুদীর্ঘ কালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও অগ্রগতির প্রেক্ষিতকে স্বীকরণ করেই সেগুলি গড়ে উঠেছে।

কবি তাঁর প্রথম গল্প ''ভিখারিণী' (ভারতী, শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৮৪-১২৭৭) থেকে 'পণরক্ষা' (ভারতী, পৌষ ১৩১৮/১৯১১) প্রকাশ পর্যন্ত চৌত্রিশ বছর সময়ে গল্প লিখেছেন ৭১টি। এই গল্পগুলির আপেক্ষিক কালসীমা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কালের সমাজ বিবর্তনের রূপ, সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গ-বিক্ষেপ এবং চিরন্তন বাংলার বর্ণ-গন্ধ গল্পগুলির বহিরঙ্গে অন্তরঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে লেখকের দৃষ্টি আপন দেশ ও উল্লিখিত কালেই সর্বদা সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা হয়ে উঠেছে ব্যাপক ও নির্বিশেষ। যেমন, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সহমরণ আইনত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল কিন্তু ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'মহামায়া' গল্পে রবীন্দ্রনাথ অংকন করেছেন ঐ নিষ্ঠুর প্রথার ছবি। ঘটনা বিগত যুগের — লেখকের মোনালিটিক মন সেই বিগত যুগের কাহিনীর মাধ্যমে চিরন্তন মানবতাকে উদ্ঘাটিত করেছে। দূর কালের মত দূর দেশ এবং ইতিহাস চিত্রও স্থান পেয়েছে রবীন্দ্র ছোটগল্পে। দালিয়া, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ-এর মত গল্পে রূপায়িত হয়েছে বৃহত্তর মানবসত্য — দেশকালের ক্ষুদ্র পরিসীমা হয়েছে বিলুপ্ত। কাব্য-নাটক উপন্যাসে কবির দেশ-চেতনা ক্রমাগত ঘরে উঠেছে আদর্শায়িত — তিনি বিস্তৃত হতে চেয়েছেন ভৌগোলিক সীমারেখা।[১] কিন্তু তিনি ভারতীয় বা বিশ্বনাগরিক হ'লেও বাংলাই ছিল তাঁর স্বদেশ-অনুভূতির কেন্দ্র-বিন্দু।

'Fate had it that Tagore was very much a patriotic Bengali. Possibly for that he was never an Indian Chouvinist. He was a world citizen whose patriotism spread out from a centre in Bengal.'[১০]

ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে আমাদের গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ — সভ্যতা ছিল গ্রাম-নির্ভর ও কৃষি-ভিত্তিক।[১১] ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়ায় সেই নিস্তরঙ্গ স্বয়ংভর জীবন-ব্যবস্থা গেল ভেঙে — ভূমির নতুন বন্দোবস্ত, শিল্পের বিপর্যয় ও কৃষির বিপত্তিতে সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই হল বিপর্যস্ত। দুর্ভিক্ষের এমন প্রকোপ দেখা গেল যে দেশ শ্মশান হয়ে উঠল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরও বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, ১৮৭৫ থেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে দেড় কোটি লোক তাতে মৃত্যু বরণ করেছে।[১২] এই ধ্বংসের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, তা হল নগর সভ্যতার উদ্ভব — গ্রাম অর্থনীতি ক্রমাগত বিপর্যস্ত হল এবং গড়ে উঠল নগর অর্থনীতি। এতে সমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটল বিপুল পরিবর্তন। গ্রাম জীবনের সেই দুর্ভাগ্য-বেলা দিনেই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন মধ্যবঙ্গের পদ্মা-ইছামতি-আত্রাই-নাগর বিধৌত অঞ্চলে জমিদারির কার্য-উপলক্ষে।

॥ তিন ॥

রবীন্দ্রনাথের জন্মাব্দ ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ ভারত ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ[১৩] এবং বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ।[১৪] কবির জন্মলগ্নের দুই-দিগন্ত নানা কর্মপ্রবাহে ও আন্দোলন-আলোড়নে ছিল চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ; একদিকে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপন (১৮৫১ খ্রী:, কাজ আরম্ভ ১৮৫৫ খ্রী:), রেলপথ স্থাপন (১৮৫৩), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৪), বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ (১৮৫৬), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), কলকাতা মাদ্রাজ বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭), ইস্টইন্ডিয়া

কোম্পানির বিলোপ সাধন (১৮৫৮), নীলহাঙ্গামা (১৮৫৯), 'নীলদর্পণ' প্রকাশ (১৮৬০) — অন্যদিকে 'মেঘনাদবধ' প্রকাশ (১৮৬১), বিচার ও সুশাসনের প্রয়োজনে হাইকোর্ট স্থাপন ও আইন পরিষদ গঠন (১৮৬২), 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ (১৮৬৫), হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭), 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রকাশ (১৮৬৮), আবদুল্লাহ্ কর্তৃক বিচারপতি নরম্যান হত্যা (১৮৭১), শের আলী কর্তৃক ভাইসরয় মেয়ো হত্যা (১৮৭২), সুরেন্দ্রনাথের পদচ্যুতি (১৮৮৭) ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ (১৮৭৫) ইত্যাদি ঘটনা বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনকে আলোড়িত করেছিল গভীরভাবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও আন্তর্জাতিক ঘটনা বাঙালি জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করেছিল। জন স্টুয়ার্ট মিলের On Liberty (1859), Comte and positivism (1865), Subjection of women (1869), হারবার্ট স্পেনসারের Education : Intellectual, Physical, Moral (1862), মার্কস্-এর Capital (1867), ম্যাক্সওয়েল-এর 'ইলেকট্রিসিটি এ্যাণ্ড ম্যাগনেটিজম্', দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' (১৮৬৬), টলস্টয়-এর ওয়র এ্যাণ্ড পিস্ (১৮৬৯), ভিজারেকশন (১৮৯৯), ইবসেনের ডল্‌স হাউস (১৮৭৯) প্রভৃতি গ্রন্থ, পণ্ডিতের কোয়ান্টন থিয়োরি, ভূতত্ত্ব ও পদার্থ বিদ্যার নানা আবিষ্কার বাঙালি চিন্তায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল.— সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় তার কিছু সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে :

পত্রিকা	আলোচ্য বিষয়	কাল
বঙ্গ দর্শন	কমৎ-দর্শন (একনিষ্ঠ প্রেম ও বালক বালিকাদের প্রেম-প্রসঙ্গ)	শ্রাবণ ১২৭৯ / ১৮৭২
	মিল ডারউইন ও হিন্দু ধর্ম	১২৮১-৮২ / ১৮৭৩-৭৪
,,	কমতের আদর্শ নারী	চৈত্র ১২৮২ / ১৮৭৪
আর্য দর্শন	মিল ও স্বাধীনতাবাদ	১২৮৮ / ১৮৮২

,,	ম্যাটসিনির জীবনী	১২৮২ / ১২৮৪
ভারতী	সামাজিক ক্রম বিকাশ	আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৯০
,,	ডারুইন	চৈত্র ১২৮৫ / ১৮৭৮
বান্ধবী	স্পেনসারের Education থেকে সার সংকলন	চৈত্র ১২৮৫

বাংলাদেশের এই সব পত্র পত্রিকা যখন পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছে তার সমকালে আমেরিকার 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকা ভারতের পরাধীনতা, দারিদ্র্য, ঔপনিবেশিক নির্যাতন সম্পর্কে প্রকাশ করছে মৌলিক নিবন্ধাবলী।[১৩] এ ছাড়া সমকালীন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাও সারা বিশ্বের সচকিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্যারিবলডির সিসিলি অভিযান (১৮৬০), ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম, আমেরিকায় দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধন (১৮৬৩), রাশিয়ায় দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে টলস্টয়, গোগল, তুর্গেনিভ (১৮১৮-১৮৮৩) প্রভৃতির সাহিত্যিক প্রতিবাদ এবং দাস-প্রথার বিলোপ, ফ্রাংকো-প্রুসিয়ান যুদ্ধ (১৮৭০) ইত্যাদি ঘটনা বির্যাতিত মানুষের প্রাণে আশা ও আলোড়ন জাগিয়েছিল। পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তার মাধ্যমে আগত যুক্তিবাদী মানবিক চেতনা আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের যে শুভ ক্রিয়া বাঙালি চিন্তার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে, এবং তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে।

॥ চার ॥

জাতীয় চেতনার উন্মেষণ ও লালনের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশোত্তর প্রয়াস বিপুল ও বহুমুখী। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারত-ব্যীয়সভা (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন) এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের শাসন ব্যাপারে আলোচনা এবং শাসনকার্যে স্বদেশীয়-দের অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে এই সভা সক্রিয় প্রয়াস চালাত, এর আদর্শে

বোম্বেতে 'বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন' এবং পুনায় 'ডেকান এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়েছিল।[১৬] কোম্পানির নিকৃষ্টতর শাসনে অতিষ্ঠ মানুষ অনেক সময়ই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত ; ১৮৫৪-৫৫ খ্রীস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ তারই নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ এই নিরীহ বিচার বঞ্চিতদের বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেছেন :

'১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গভর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের বরণা আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন নালিশ হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল, যাহারও ফুরাইয়া গেল — পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গভর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল'।[১৭]

সাঁওতাল বিদ্রোহের এই বিবরণ হয়ত তথ্য-শুদ্ধ নয়, তবে ইংরেজের পৈশাচিক নির্মমতা সত্য, এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের যুপকাষ্ঠে এই প্রাণদান ভারতের জনজাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়। অতঃপর আসে সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রসঙ্গ। এ সম্পর্কে যতই মতভেদ থাক, আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমাদের শিল্প সাহিত্যেও এর প্রভাব উপেক্ষনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত গল্প 'দুরাশা' এবং 'গোরা' উপন্যাস লিখেছেন এই বিদ্রোহের পটভূমিতে। 'দুরাশা' গল্পের নায়ক কেশব লাল বলেছে : 'গোখাদক গোরা লোকদে আর্যাবর্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।'[১৮]

নীল যন্ত্রাচার বাঙালি কৃষকজীবনে অর্ধশতাব্দীকাল অভিশাপরূপে চেপে বসেছিল — শেষ পর্যন্ত দরিদ্র অর্ধমৃত প্রজাকুল বেপরোয়া হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহ নতুন রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিয়েছিল :

> It was the indigo-disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed it was the first revolution in Bengal after the advent of the English. ..... Nothing like oppression ... ... at least roused the half-dead Bengali and infused spark in his cold frame [১৯]

রবীন্দ্র সাহিত্যে নীল অত্যাচারের বিস্তারিত পরিচয় নেই। তবে 'চতুরঙ্গ' (১৩২২) উপন্যাসে কবি স্পষ্টই বলেছেন, যে কুঠিয়ালরা 'হাজার হাজার গরীব চাষার রক্ত নীল করিয়াছিল তার বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে।'[২০] 'পোস্টমাস্টার' গল্পে নীল কুঠির সংক্ষিপ্ত-প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে হিন্দুমেলার অবদান স্মরণীয় — স্বদেশানুরাগ আত্মনির্ভরতার শিক্ষা প্রচারই শুধু নয় এই মেলা 'স্বাধীনতার' স্বপ্নও দেখেছিল। ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে নাট্যকার মনোমোহন বসু আশা করেছিলেন, 'ঐক্যতানরূপ মহাবীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে' যে 'মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক' তারই ফল হবে 'স্বাধীনতা'।[২১]

১৮৭৭ সালে প্রিন্স্ অব ওয়েল্স্ ভারত সফরে আসেন। তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য দিল্লীতে এক বিলাসবহুল দরবার বসে। সেই সময় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে দক্ষিণ ভারতে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যু বরণ করে। একদিকে রাজ সংবর্ধনায় কোটি কোটি টাকা অপচয় অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু ; এতে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। হিন্দু মেলায় পঠিত 'দিল্লীর দরবার' (১৮৭৭) কবিতায় তিনি সংবর্ধনাকারীদের হীনমন্যতার প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[২২] সমসাময়িককালে, প্রেস আইন, মফঃ-নিয়ন্ত্রণ আইন, অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন এমনি সব অধিকার খর্বকারী আইনের প্রবর্তনে গণ মনে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার

হয়েছিল। এর পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পদচ্যুতি এবং কারাদণ্ড সেই ক্ষোভে নতুন ইন্ধন যোগায়। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে ইতালির বিপ্লবী নেতা এবং মুক্তি সংগ্রামের নায়ক ম্যাটসিনির গৌরবময় আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ম্যাটসিনির জীবনী প্রকাশ করলেন — বাঙালি যুব-মনে ম্যাটসিনির প্রভাবের কথা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> It was Mazzini, the incarnation of the highest moral forces in the political arena — Mazzini the apstle of Indian unity, the friend of human race that I presented to the youth of Bengal. Mazzini worked through the young.[১]

ম্যাটসিনির জীবনী, তাঁর 'ডিউটিজ অব ম্যান' (Duties of Man) গ্রন্থ এবং ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে খুব বলা যে মুক্তি-প্রেরণা জেগেছিল তারই ফলে নব্য-ইতালির যুব সংগঠন কার্বনারির অনুকরণে বাংলাদেশের নানাস্থানে গড়ে উঠল গুপ্ত সংস্থা। এই সব সংস্থার প্রত্যেক সদস্যকে ইতালির মতো নিজের বুক থেকে রক্ত নিয়ে শপথ করতে হত।[১৪] রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও 'সঞ্জীবনী সভা' নামে এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছিলেন। 'ন্যাশনাল থ্রেড ফ্যাক্টরি' উত্তেজনার আগুন পোহাবার জন্য কবিও তার সদস্য হয়েছিলেন।[১৫] এই সব সংস্থা মুক্তির কোন সুষ্ঠু কার্য-সূচী দিতে পারেনি — এদের মূলধন ছিল স্বপ্নচারী ভাবনা আর অবাস্তব কল্পনা। সমকালীন আন্দোলনের স্থূল চরিত্র ছিল 'ভারত মাতার' জন্য উচ্চকণ্ঠে চীৎকার, তার উদ্ধারের জন্য 'ন্যাশনাল ফণ্ড' গঠন, ভ্রাতা-ভগিনী সম্বোধনে 'জিঙ্গোইস্ট আস্ফালন'। বাস্তব রাজনীতি থেকে কবি দূরে ছিলেন কিন্তু এই ধরনের এক্সিটেশনকে রচনার মাধ্যমে সমালোচনা করলেন — 'চেঁচিয়ে বলা,[১৬] জিঙ্গো আস্ফালন,[১৭]

'ন্যাশন্যাল ফণ্ড'[১৮] প্রবন্ধগুলি তাঁর এই অনুভূতির ফসল। দেশ উদ্ধারের নামে উচ্চবৃত্তি আর ব্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি হবার গৌখিন বাসনাকে কবি তাঁর 'এক রাত্রি' (১৮৯২) গল্পে বিদ্রূপ করেছেন।

সরকারের দমনমূলক আইন ও নির্যাতন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত প্রবলতর হচ্ছিল; ইলবার্ট বিল আন্দোলনে দেশবাসীর পরাভব এবং শ্বেতাঙ্গদের জয় ভারতীয়দের মধ্যে সংহতিবোধ জাগিয়ে দেয়। দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করলেন তীব্রভাবে এবং সেই প্রয়োজনের ফলরূপে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হল। এবার দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিকভাবে, অনেকটা শৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা অর্জনই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যতঃপর সংস্থা বৃহত্তর কার্যসূচী হাতে নিতে থাকে। কবি ১৮৯৫-৯৬তে জমিদারির ভার নিয়ে শিলাইদহ চলে যান। কলকাতার রাজনীতি থেকে কতকটা প্রয়োজনে এবং কতকটা স্বেচ্ছায় তিনি দূরে থাকলেন। এ-সময় তাঁর মনে প্রবলভাবে একটা বাস্তব প্রশ্ন জেগেছিল: ইংরেজ শাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং নানা প্রকার ভাঙাগড়ায় দেশে ক্রমাগত শ্রেণী-বৈষম্য বাড়ছে, গ্রাম নগরের ব্যবধান বাড়ছে, দেশের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণ মানুষ ও দেশের প্রাণ-সত্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই অনুভূতির বৈষয়িক বিকাশ ঘটেছে পোস্ট-মাস্টার, খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন, ছুটি, সুভা প্রভৃতি গল্পে।

কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী — তাঁরা ক্রমাগত ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট সংস্কার, মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল বোর্ড, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রশাসনে দেশীয়দের দাবি উত্থাপন করলেন। ১৮৯১ সালে সরকারকে কংগ্রেস-নেতারা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন যে, দেশীয় প্রতিনিধি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে দেশ শাসন চলতে পারেনা। কিন্তু নেতৃবৃন্দ একদিকে ছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ থেকে দূরে, অন্যদিকে তাঁদের অতি-নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ মানুষের দুঃখমোচনে কোন বাস্তব ফলোদয় ঘটাতে পারছিল না।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে দাদা ভাই নওরোজির সভাপতির ভাষণে যে ইংরেজ তোষণ ২৯শে প্রকাশ পায় তাতে দেশের এক শ্রেণীর মানুষ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হন।

দেশের নেতারা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদনাত্মক নির্যাতনের অবসান কামনা করছিলেন তখন শাসক গোষ্ঠির ঔদ্ধত্য আর নির্মমতা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। মফঃস্বল ও গ্রাম-গঞ্জ থেকে দেশীয়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতনের খবর প্রতিদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। সুবিচারের সকল দরজা তাদের জন্য হয়ে উঠেছিল রুদ্ধ — অপমানের কোন প্রতিকার হচ্ছিল না। ইংরেজের পদাঘাতে পৃষ্ঠা বিদীর্ণ হলেও 'নেটিভদের' জন্য ন্যায়-বিচার ছিল অপ্রাপনীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুবিচারের অধিকার (সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১ / ১৮৯৪), রাজা ও প্রজা (১৮৯৮) ইত্যাদি প্রবন্ধে রীতিমত ক্ষোভের সঙ্গে এসব ব্যাপার আলোচনা করলেন। কংগ্রেসের মডারেটপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্যেও কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে (১৮৯৫) সভাপতির ভাষণে বিচারের ক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় এবং দেশীয়দের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ দিলেন।[৩০] কংগ্রেসের প্রতি শাসকদের যে আস্থা ছিল তাও ক্রমাগত বিলিন হতে লাগল। এই অবস্থায় অপমানের প্রতিকারের পথ-নির্দেশ দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘ ও রৌদ্র, রাজনিদ্রা এবং দুর্বুদ্ধি গল্পে।

দেশের মানুষ এমনভাবে আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়েছিল, পরাধীনতা আর দারিদ্র্যে এমনভাবে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে, যে-কোন ধরনের অপমান ও ক্ষতির কারণ ঘটলেও মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস তাদের হত না। এমন কি বিপদের দিনে কোন সৎসাহসী ত্যাগী সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেও অত্যাচারিত তার অপমান গোপন করে যায় ফলে তাকেই লাঞ্ছিত হতে হয়। 'গ্রামের লোকেরা দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মোকদ্দমা পাটের কারবার'[৩১] এসব নিয়েই থাকত, 'একজন বাঙালি যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালি তাহা কৌতূহল ভরে দেখে এবং সুহৃদ্ভে অপমানের প্রতিকার

সাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না ... ... ইংরেজের নিকট হত ও আহত হইবার মূল কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে'—। কবি বাঙালির এই স্বভাবের পরিবর্তন কামনা করেছিলেন। সমসাময়িক কবিতায়ও কবির এই অনুভূতি ধরা পড়েছে :

কারে দিব দোষ বন্ধু কারে দিব দোষ !
বৃথা করো আস্ফালন বৃথা করো রোষ।
যতই কাগজে পড়ি যত দিই গালি
কালামুখে পড়ে তব কলঙ্কের কালি।
সে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ
তারই কাছে তারই পরে তোমার নালিশ !
নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে
পরাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে।
তবে ঘরে নত শিরে চুপ করে থাক্
সাপ্তাহিক দিগ্বিদিকে বাজায়নে ঢাক।[৩২]

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে' কবি বাঙালির হীনমন্যতার কথা তাঁর সতর বছর বয়সে বিলাত যাত্রাকালের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন' বাঙালিরা ইংরেজের কাছে তার স্বদেশের লোকদের ও আচার ব্যবহারের নিন্দে করে'।[৩৩]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সারা বিশ্বে লুণ্ঠন ও নির্যাতনের তাণ্ডব-লীলা চালিয়েছিল। আফ্রিকার সোনা ও খনিজ সম্পদের লোভে সেখানে নির্মম হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়েছিল। ইংলণ্ড ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে নাটাল থেকে উগাণ্ডা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ দখল করে। ট্রুথ পত্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের খবর পড়ে কবির ধারণা আরও দৃঢ় হয় যে, 'ইংরেজ য়ুরোপে যত সভ্য' অন্যত্র তত নয়। 'আমি ইংরাজ আমি তোমার সোনার খনি তোমার গরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি, এই হল ম্যাটাবিলির অবস্থা তেমনি ভারতের অবস্থা — "শতকোটি

ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্স্-চেঞ্জের ক্ষতি পূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেই জন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্য দ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাংকাশায়ারের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পাবলিক ওয়ার্কস্ কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ ফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।''[৩৯] এইভাবে দেশবাসীর অস্থি-নিষ্কাশন করে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রশাসন ব্যবস্থা ইংরেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল তার নির্লজ্জ আচরণ মাঝে মাঝেই অনাবৃত হয়ে পড়েছে — 'নেব ও রৌদ্রে'র ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-অধিকর্তার দাম্ভিক ও হঠকারী আচরণ, 'দুর্বুদ্ধি'র দারোগা ও সিপাই-দের অমানুষিক আচরণ-বস্তুত চিরন্তনকালের শাসক-শোষকেরই পরিচয় বহন করে।

ইংরেজ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উত্তেজনা কমিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে এদেশে স্থায়ী করতে চেয়েছিল। তার নিজস্ব সৃষ্টি জমিদার-রায়বাহাদুর-গোষ্ঠির আনুগত্যের প্রতি আস্থা রেখেই সুকৌশলে প্রশাসনিক ভেদনীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৯২ সালে যে লেজিসলেটিভ কাউনসিল গঠিত হয়েছিল, তাতে যে বেসরকারী মনোনীত ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন তাঁরা জমিদার ও রায়বাহাদুর সম্প্রদায়েরই প্রতিভূ। লর্ড সত্যেন সিংহ বা রাজা পারীমোহন মুখার্জির স্বাভাবিক নেতৃত্বের মোহে মত্ত ছিলেন। জনগণের সেবায় নয়, রাজ সম্মান এবং খেতাবের প্রতি অস্বাভাবিক মোহবশত এঁরা নির্লজ্জভাবে ইংরেজ-তোষণে তৎপর ছিলেন। এদের আভিজাত্যবোধ আর খেতাবলোলু-পতার প্রতি কবির বিদ্রূপ ঝলসিত হয়েছে ঠাকুরদা (১৩০২) এবং 'রাজটিকা' (১৩০৫) গল্পে। 'নুখুড়ের বনাম বাঁড়ুজ্জে' প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'সেকালের-জমিদারগণের হিত কার্যের ধারা' 'দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল'। 'তখন হিতকর্ম রাজ সম্মানের মূল্য স্বরূপ ছিলনা। পূর্বকালে জমিদারদের যেরূপ গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিলনা।'[৩৫]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মহারাষ্ট্রে যে বিপ্লবী চেতনার সূত্রপাত হয় দেশমান্য টিলকের নেতৃত্বে, তা বাংলায়ও ছড়িয়ে পড়ে. অবশ্যি ১৮৭১-৭২ সালে শের আলী আর আবদুল্লাহ বাংলার মাটিকে আগেই তা' দিয়ে রেখেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর (১৯০১) পর অনেকে ধারণা করেছিলেন যে, বিগত শতকের সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত হবে কিন্তু তা হয়নি বরং ব্রিটেনকে উপনিবেশ সমূহে নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভারতবর্ষে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে যে রাজনৈতিক তপ্ত হাওয়া বইতে আরম্ভ হয়েছিল তা ক্রমাগত জোরদার হয়েছিল শাসক গোষ্ঠির হঠকারিতায়। দক্ষ প্রশাসন প্রবর্তনের উচ্চাকাংক্ষা এবং আভিজাত্যগর্বী শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অশোভন উক্তি উত্তেজনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। লর্ড কার্জনের ইচ্ছা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে নেটিভ ল ইন্টারফেরেন্স দুর্বোধ্য লালফিতা থেকে মুক্ত করে শিক্ষার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করা, কলকাতা কর্পোরেশনে সংখ্যাগুরু ব্রিটিশ-সদস্য নিয়োগ এবং রাষ্ট্রিক সংস্থায় পুনর্গঠন সাধন।[৩] কিন্তু তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় বিল ও বঙ্গভঙ্গ বিলের গূঢ় উদ্দেশ্য যে বাঙালির রাজনৈতিক চেতনাকে দুর্বল ও খর্ব করা, তা দেশবাসীর বুঝতে দেরি হয়নি। ঘটনা অঘটন-পটিয়সী এই দুই বিল বাংলার মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উৎপাতের বীজ উপ্ত করে। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশিত হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ইচ্ছানুসারে কলকাতা কর্পোরেশনের দেশীয় সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই সরকারী পদক্ষেপের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ বিপিন-অরবিন্দ গোষ্ঠির মনঃপুত ছিলনা, তাঁরা ব্যাপক বর্জনের কার্যসূচী প্রণয়ন করেন — শুরু হয় পণ্য বর্জন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন।

ভারতে যখন বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা কার্যকরী হতে যাচ্ছে সেই সময় জাপান রাশিয়ার রাজকীয় শক্তিকে বিপর্যস্ত করে জয়ী হয়। এই প্রথম একটি প্রাচ্য জাতির নিকট একটি ইয়োরোপীয় শক্তির পরাজয়। ইতিপূর্বে চীন সান ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে মাঞ্চিন পণ্য বর্জনে যে সাফল্য অর্জন করেছিল সে সংবাদ সাময়িকীর মাধ্যমে এশিয়াবাসীরা জেনেছিল। জাপান জয়ী হয়েছিল

আধুনিক মারণাস্ত্রের সাহায্যে, চীন ও ভারত রাজনৈতিক জয়ের প্রয়াস পেল অর্থনৈতিক-বয়কট আন্দোলনের দ্বারা। এশীয় জাতি সমূহের মধ্যে এল নিদ্রাভঙ্গের লগ্ন। ভারতের রবীন্দ্রনাথ, জাপানের ওকাকুরা এবং সিংহলের অনন্ত কুমার স্বামী এশিয়ার জাগরণের অনুকূলে প্রচার করলেন মানবতাবাদী এশীয়-দর্শন — ইয়োরোপীয়-উগ্রজাতীয়তাবাদে তাঁদের অনাস্থা।[৩৭] স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

It was he who first preached eschewing all voluntary associations with the official activities and of applying ourselves to the organization of our economic, social and individual life independently of off cial help and control. Though the boycott of British goods as a protest against partition of Bengal originated with others and was adopted by the political leaders of the country, at a public meeting assembled in the Town Hall of Calcutta, it was Rabindra nath who first propounded an elaborate scheme for the practical boycott of the administration to the farthest limits that the laws of the land allowed us to do.[৩৮]

দেশবাসীর অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকরী হল। অতঃপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন: একদল ক্রমেই হয়ে উঠলেন রুদ্রপন্থী, অন্যদল নরমপন্থীরূপে নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য মোচনের প্রতি কারো মনোযোগ ছিলনা — রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনই তাদের লক্ষ্য ছিল। সহরে বসে জনগনের নামে আন্দোলন,

প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বর্জনের জবরদস্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিমুখ হলেন। তিনি পল্লীর নিভৃত কোণে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শিলাইদহ ও পতিসরের পল্লী পুনর্গঠনমূলক কার্যক্রম — তাঁত, তাঁত-স্কুল, কৃষিব্যাঙ্ক-কারণ, কৃষিব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে তিনি স্বয়ংভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ও কৃষকদের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পেলেন। কবির তাঁতের কাপড় উৎপাদন, স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, তাঁতীস্কুল স্থাপন, স্বদেশী কাপড় বিক্রয় ভাণ্ডার স্থাপন প্রয়াসের প্রতিবিম্ব পড়েছে 'পথরক্ষা' (১৯১১) গল্পে।

জাতীয়তাবাদীরা রাজনীতির ধারাকে পরিচালিত করলেন শক্তি-পূজার দিকে। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করল এবং ১৯০৭ সালে নরমপন্থী ও চরমপন্থীরা প্রকাশ্য সংঘর্ষের মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন — সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকল মডারেটপন্থীদের হাতে। অন্যদিকে বিপ্লবী তৎপরতা আরম্ভ হল। কয়েক বছরের মধ্যেই পুলিশের হাতে অনেক সন্ত্রাসবাদী হিংসাত্মক কার্যকলাপের নাকাল। ১৯০৮ সালে সকল পূর্ব-উদাহরণ ভঙ্গ করে মোজাফ্ফরপুর দুর্ঘটনা সমগ্র জাতিকে চমকে দিল। নেতারা একে অন্যের প্রতি দোষ চাপিয়ে প্রত্যেকেই ভাল মানুষ সাজবার প্রয়াস পেলেন। কবি এবারে নিজ বক্তব্য স্পষ্ট করেই প্রকাশ করলেন তাঁর পথ ও পাথেয় (১৯০৮) প্রবন্ধে :

'বহুদিন হইতে বাঙালি জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান মোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই ... ... বাংলাদেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই অগ্নিমূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্যদেশের কোন স্ত্রৈণী পুরুষ অবলাত্মানী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই।'[৩৯]

কবির বিশ্বাস ইয়োরোপের অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। তবু তিনি মনে করেন অন্যায় উৎপীড়ন ও হিংসাত্মক কাজ, ইংরেজ বাঙালি যে-ই করুক তা অশুভ। 'এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার বোঝা লইয়া যাইবে। ..... ন্যায় ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে।' তার এই বক্তব্যের সমালোচনা হল কিন্তু কবি নিজ বিশ্বাসে অটল থাকলেন। বিলাতি পণ্যের বহ্নুৎসব, সংকীর্ণ দেশপ্রেম, উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রতি তিনি বিমুখ। তবে, অহিংস সত্যাগ্রহের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল — তার 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক তারই প্রতীক। মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অনেক আগে তার অহিংস সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা।

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ও স্বদেশী আন্দোলনের চাপে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়, তাই ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশায় মর্লে-মিন্টো সংস্কার কার্যকরী করা হয়। কিন্তু এই সংস্কারেও শাসন শৃঙ্খলা ফিরে এল না, ভারত সচিব মর্লে বুঝতে পারলেন এই অস্থিরতার কারণ নিহিত আছে আরও গভীরে, তাই বাংলাকে একত্রীকরণের ব্যবস্থা করা হল।[৭] দিল্লীর দরবারে (১৯১১) সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল যে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে বাংলা একত্রীকরণ কার্যকরী হবে। এই নিয়মতান্ত্রিক বিজয়ে বাঙালেটগণ উল্লসিত হলেন কিন্তু বিপ্লবী তৎপরতার অবসান লক্ষ্য করা গেল না। রাজধানী প্রবেশকালে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের হাতির উপর বোমা নিক্ষেপ করলেন বাঙালি বিপ্লবীরা। তারপর সরকার ঘোষণা করলেন :

> Whatever value we may attach to provincial autonomy of decentralization, we cannot overlook ourselves, or let local Government overlook, the imperial aspects of any weekness or defects in administration.[৮]

রাষ্ট্রকীয় শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দূরীকরণের ইচ্ছার অন্য নাম নির্যাতন। বাংলা একত্রীকরণের পর দেশের রাজনৈতিক ধারা প্রতি পরিবর্তন করল। রুদ্রপন্থী রাজনীতি এবং বিপ্লবী তৎপরতার প্রতি রবীন্দ্র নাথের অনীহা চিরকাল থেকে গেছে — পরবর্তী ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায় উপন্যাস ; নামগুর গল্প ও শেষ কথা ছোটগল্পে সেই মনোভাবেরই পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

৪ পাঁচ ৪

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশ ছিল ধনধান্যে পুষ্পে ঐশ্বর্যময়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই আরম্ভ করল বেপরোয়া লুণ্ঠন — যুদ্ধ জয়ের পুরস্কার স্বরূপ ক্লাইভ মীরজাফরের নিকট থেকে লাভ করে ২৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, অন্যদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা লাভ করে সাড়ে চার কোটি টাকা। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কোম্পানির কর্মচারীরা যে উৎকোচ আদায় করেছিল তার পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ পাউণ্ড।[৮] দেওয়ানি লাভের পর দেশের জমির মালিক হল কোম্পানি — সমস্ত পূর্ব বন্দোবস্ত বাতিল করে বার্ষিক, পাঁচশালা, দশশালা এমনি ধরণের বন্দোবস্ত দিতে আরম্ভ করল নগদ নিলামে, ফলে ফড়িয়া মুৎসুদ্দিরা জমির নতুন মালিকানা লাভ করল — কৃষক হল উৎখাত, কৃষি হল বিপর্যস্ত। অন্যদিকে যারা আবহমান কাল থেকে দেশের শিল্প, সূতীবস্ত্র শিল্প মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করত তাদের নিজেদের তাঁতবোনা বন্ধ হল। তাদের বণিক-কোম্পানির কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করা হল, তাদের কাছ থেকে জোর করে ল্যাংকশায়ারের কারখানার জন্য জলের দামে কাঁচামাল আদায় করা হত, অপর দিকে বিলাত থেকে আসত রাশি রাশি তৈরি কাপড়। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ১,২০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সূতীবস্ত্র ভারতে আসত — এর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েছে। এই রপ্তানী বাণিজ্যের শুল্ক ছিল শতকরা আড়াই টাকা পক্ষান্তরে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানির উপর শুল্ক ধার্য হয়েছিল ৪০০%।[৯] কোম্পানির কুশাসনের

ফলে সোনার দেশ অল্পকাল মধ্যেই নরকভূমি হয়ে উঠল উইলিয়ম ডুলারটন বলেছেন :

> But such has been the restless energy of our misgovernment that within the short space of twenty years many parts of these countries have been reduced to the appearance of a desert. The fields are no longer cultivated ; extensive tracts are already overgrown with thickets, the husband man is plundered, the manufacturer oppressed, famine has been repeatedly endured.[৮৮]

এই ভাবে কৃষি-শিল্প বিপর্যস্ত হল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক নতুন ভূস্বামী-শ্রেণীর উদ্ভব হল গ্রামীণ অর্থনীতি অনগ্রসর হতে থাকল, অন্যদিকে নগর-অর্থনীতি গড়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ইংরেজের বুর্জোয়া গণ্ডি এদেশে আসতে লাগল পুঁজির প্রকারে।[৮৯] কাপড়ের কল, রেলপথ স্থাপিত হল, টা শিল্প ও কয়লা শিল্পের প্রসার ঘটল। এই অর্থনৈতিক পুনর্গঠন স্বাভাবিকভাবে হয়নি।

> নূতন শিল্প ও কারখানার প্রসার স্বাভাবিকভাবে না হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে উৎখাত কৃষক ও কারিগরেরা দলে দলে শহরেও আসেনি, প্রলেটারিয়েট শ্রেণীভুক্তও হয়নি। গ্রামের বোঝা বেড়েছে, কৃষির শোচনীয় অবনতি ঘটেছে এবং নতুন এক নিঃস্ব ক্ষেত মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে।[৯০]

এই নিঃস্ব ক্ষেত মজুরদের খানিক পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে। এই নিঃস্ব শ্রেণীর একাংশ চুরি ডাকাতি করত। বড়লোক ভূস্বামীরা তাদের পালন করত লাঠিয়াল ডাকাতরূপে। এই লাঠিয়ালদের দ্বারা তারা পূজা উচ্ছেদ করত, অন্য জমিদারের সঙ্গে দাঙ্গা করত, খাজনা লুঠ করাত। 'দান-প্রতিদান' গল্পে এর ইঙ্গিত আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ঘটে ; কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর উচ্চ শিক্ষার প্রসার দ্রুততর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে : ১৮৫৭ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত ১৫৮৯ জন আর্টস ডিগ্রী নিয়ে সরকারী চাকুরী এবং স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন, ৫২৬ জন পেয়েছেন পাবলিক সার্ভিস, ৫৮১ জন গ্রহণ করেছেন আইন ব্যবসায়, ৪৭০ জন কলেজ এবং হাইস্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছেন, ১২ জন হয়েছেন ডাক্তার।[৭] এদের দ্বারা গড়ে উঠল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক রূপান্তরের ফলে সমাজে নতুন শ্রেণী বিন্যাস ঘটল। একদিকে জমির স্বত্বভোগী ভূস্বামী ও তাদের কর্মচারী নায়েব-গোমস্তা, চাষী, মজুর, লাঠিয়াল, মহাজন, সুদখোর — অন্য দিকে সহজ আনীর্বাদপুষ্ট চাকুরিজীবী, ডেপুটি, কেরানি ; পেশাজীবী-ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, মুহুরি ইত্যাদি [illegible] এদের সবাইকে দেখা যাচ্ছে।

জমির উপরে দেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল অথচ জমির উর্বরা শক্তি ক্রমাগত বিনষ্ট হয়েছে। কৃষি-জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির কোন উদ্যোগ ঔপনিবেশিক সরকার বা দেশীয় ভূস্বামীরা গ্রহণ করেনি কিন্তু খাজনা বৃদ্ধির দিকে স্বত্বভোগী জমিদার ছিল ভীষণ তৎপর। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৪ পর্যন্ত প্রতি গ্রামের উপর গড় খাজনা ছিল ১১৬১ টাকা, পরবর্তী তিরিশ বছরে (১৯০৪) তা হয়েছিল ১৪৬৭ টাকা।[৮] অন্যদিকে কৃষি-নির্ভরতা ক্রমাগত বেড়েছে। ১৮৯১ সালে কৃষি-নির্ভর জন সংখ্যা ছিল ৬১·১%, ১৯০১-এ তা হয়েছে ৬৬·৫% ভাগ।[৯] প্রজা উচ্ছেদ, খাজনা বৃদ্ধি এ ধরণের অর্থনৈতিক বিষয় চিন্তা করবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেকটা সহায়ক হয়েছে। 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় কবি নিঃস্ব প্রজার যে করুণ বেদনার চিত্র এঁকেছেন তাই এসেছে আরও বিস্তৃত পরিসরে সমস্যাপূরণ, উলুখড়ের বিপদ, মেঘ ও রৌদ্র প্রভৃতি গল্পে। কবি বাস্তবভাবেই বুঝেছিলেন 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের জমিদারদের সম্পর্কে বলেছিলেন : 'জীবের শত্রুজীব ; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুকে ভক্ষণ করে, রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে, জমিদার নামক বড় মানুষ ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।'[৩১] কৃষকদের কল্যাণের জন্য প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হলেও তাতে প্রজার মঙ্গল হয়নি, মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে বড় লোক জমিদার দরিদ্র প্রজাকে উচ্ছেদ করত এমন কি তাদের উপর চালাত দৈহিক অত্যাচার।[৩২] বিলাসিতা (ঠাকুরদা), প্রজাপীড়ন (উলুখড়ের বিপদ) নৈতিক অধঃপতন (সমস্যাপূরণ) অভিজাত্যগর্ব, মোসাহেব পালন, রক্ষিতা পোষণ, শখের থিয়েটার করা (সদর ও অন্দর) এ-সব ছিল অধিকাংশ জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩) ইত্যাদি গ্রন্থে জমিদারদের যে নির্মম ও অধঃপতিত চরিত্র চিত্রিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে সেই পঠ-শয়তান চরিত্র নেই। তাঁর উদার মানবতাই এর কারণ। কবির সহানুভূতি মানবীয় ত্রুটি দুর্বলতির প্রতি ক্ষমা সুন্দর। তাই কৃষ্ণ গোপাল (সমস্যাপূরণ) ভক্তপ্রবাদ না হয়ে অমর্ত্য মহিমা লাভ করেছে, অপদার্থ অভয়াচরণ (নাম মণির ছেলে) হয়েছে মহান পিতা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বার্ষিক খাজনা আদায়ের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য হয়েছিল ৪০ মিলিয়ন টাকা ; পরবর্তী একশ বছরে কর বৃদ্ধির ফলে তা বেড়ে হয়েছিল ১৬০ মিলিয়ন টাকা। জমিদারদের গড় বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ষোলশ কোটি টাকা, তাতেও শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ জমিদার হয়ে পড়েছিল ঋণগ্রস্ত। তাদের মাথা-পিছু গড় ঋণ ছিল ৬০০ টাকা।[৩৩] তারা এতই বনিয়া প্রিয় হয়েছিল যে একদা (১৮৮৯) ভারতবর্ষের দেওয়ানি মোকদ্দমার সংখ্যা দাঁড়ায় ১'৬ মিলিয়ন, আশ্চর্যের ব্যাপার এর অর্ধেকই ছিল বাংলাদেশের।[৩৪]

'গল্পগুচ্ছে' ১৮৯১ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত সময়ে অনেকগুলি গল্পে জমিদার চরিত্র এসেছে। তন্মধ্যে দেনা পাওনা, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, দান

প্রতিদান, সম্পাদক, সমস্যাপূরণ, মেঘ ও রৌদ্র, ঠাকুরদা, প্রতিহিংসা, অতিথি, রাজটিকা, সদর ও অন্দর, উলুখড়ের বিপদ, নষ্টনীড়, রাস মণির ছেলে গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় বিষয় হল এখানে অধিকাংশ জমিদারই অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্ন বহন করছে। অতিথি এবং সদর ও অন্দর গল্পের জমিদারদের অবস্থা সচ্ছল মনে হয়। ('সখুজপত্র' যুগের মনোহর লাল (হালদার গোষ্ঠী) এবং গীতাংশুমৌলী ও (পয়লানম্বর) সচ্ছল জমিদার)। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তা ছাড়া সুদি-কারবার আর কোম্পানির কাগজ এদেশে অর্থনৈতিক যুগান্তরের সম্ভাবনাকে পিছিয়ে দিয়েছিল বহুকালের জন্য।[৩৩] বাঙালির অর্থনৈতিক অন্বেষা সন্ন্যাসবৃত্তি, গুপ্তধন অনুসন্ধান আর উইলমালের তৎপরতায় অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, মুক্তির উপায়, স্বর্ণমৃগ, গুপ্তধন, রাসমণির ছেলে গল্পগুলিতে সেই দীনতা ও পলায়নপর মনোভাবের আভাস রয়েছে।

ইংরেজ রাজত্বে অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফলে [illegible] বাঙালি জীবনে পেশাগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু চাকুরীর ক্ষেত্র শ্রেণীবিশেষের জন্য ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। কুড়ি টাকার চাকুরীর জন্য শিক্ষিত বাঙালি যুবককে হন্যে হয়ে ফিরতে হত।[৩৪] জমিদারি কারবার কল্যাণে মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি এবং আইনগত প্রয়োজনে আইন ব্যবসায়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৩-এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৭৩৪ জন ব্যাচেলর অব ল ডিগ্রী পেয়েছিলেন। ১৮৭১-'৮০ এর মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন ৯৪ জন; ১৯০১ সালে বাংলাদেশে এ্যাডভোকেটের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৯ জন।[৩৫] ব্যারিস্টার হবার জন্য কেউ কেউ পালিয়ে সাগর পাড়ি দিতেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে অনাথ বন্ধু তাদেরই প্রতিভূ। আইন ব্যবসায়ীরা সেদিন সমাজে সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন; এক রাত্রি গল্পের রামলোচন গৃহিনী সুরবালাকে শাড়ি গহনায় রীতিমত সাজিয়েছিলেন। উঙ্কার-এর পরেশ, রাজটিকার নীলরতন ইত্যাদি আইন ব্যবসায়ীর আর্থিক জীবন সচ্ছল বলেই

মনে হয়। 'কর্মফলের নেলির বাবা ব্যারিস্টার ট্রেভর্যের সঙ্গে তিনি রুচিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

ইংরেজ সরকার ইচ্ছে করেই দায়িত্বশীল পদে দেশীয়দের নিয়োগ করত না।

> Indians were deliberately excluded from offices involving trust and responsibilities.[৩৮]

শিক্ষিত যুবকরা সরকারের এই মনোভাবে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কলকাতা টাউন হলে এক সভায় মিলিত হয়ে চাকুরি-সংক্রান্ত এই অসুবিধার বিষয় আলোচনা করেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সভায় সিভিল সার্ভিসে ইংরেজদের এক চেটিয়া অধিকারের বিষয় আলোচনা করেন। এবং তাঁরা সরকারের নিকট এ-ব্যাপারে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে সর্বাইকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এর আগে (১৮৩৫ থেকে) 'নন-রেগুলেশনে' দেশীয়দের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ দেওয়া হত। ১৮৬৭ সালে মনোনয়নে প্রথম বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত (রমেশ দত্তের জেঠা; আই. সি. এস. রমেশ দত্তের কাকা)। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম বাঙালি আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (আই. সি. এস. হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ১৮৬৪ খ্রী:) রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ পর্বের প্রথম ছোটগল্প দেনা পাওনা (১৮৯১)-য় দেখা যায় ডেপুটি নায়ক। স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ান দেখা যায় ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে, 'বিচারক' গল্পে।

বাংলাদেশে রোগ ব্যাধির প্রকোপ চিরদিনই আছে।[৩৯] রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাবনা সম্মেলনের (১৯০৮) সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: 'যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের প্লীহা যকৃতের উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে। তাহার উপর বিদেশীগুলো অতিথির মত আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়। ডিপথিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি একপথ্যটেশন নীতি অবলম্বন করিয়াছে।' এমন ব্যাধির

দেশে ডাক্তারের ক্ষমতা ছিল ভীষণ রকমের। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮২-এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ১২ জন ডাক্তার হয়েছেন আর আর্টস ডিগ্রি না নিয়ে ডাক্তার হয়েছেন ১৬৪ জন।[৬০] সাতকোটি বাঙালির চিকিৎসা চলত হাতুড়ে দিয়ে অথবা বিনা চিকিৎসায় মরতে হত। রবীন্দ্র নাথের ডাক্তারি বিদ্যা আর চিকিৎসা পেশার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। 'গল্পগুচ্ছে'র কঙ্কালের শশিশেখর, দৃষ্টিদানের অবিনাশ, অপরিচিতার শম্ভু সেন ডাক্তার। দুর্বুদ্ধির চিকিৎসক বোধহয় হাতুড়ে, মাল্যদানের যতীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র। উপন্যাসে, করুণা আর 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র। কবির 'নিশীথে' গল্পেও একজন ডাক্তারের ভূমিকা আছে। অর্থাগমের উপায় হিসাবে ডাক্তারি যেমন প্রশস্ত, তেমনি এঁরা সহজেই মানব-সেবার গৌরব লাভ করতে পারেন। কিন্তু শশিশেখর অবিনাশ আর নেটিভ ডাক্তার (দুর্বুদ্ধি) কে অর্ধ-পিশাচ বলে মনে হয়। কবি ডাক্তারদের এই আচরণ বোধহয় ব্যঙ্গচ্ছলে লক্ষ্য করেছিলেন। মানব সেবার প্রত্যক্ষ উদাহরণ রূপে তাঁর শিলাইদহ ও পতিসরের দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্মরণীয়। কলকাতায় থাকার সময় তিনি সিস্টার নিবেদিতার গড়ে সেচ্ছাসেবকতা করেছেন।

উচ্চ শিক্ষিত লোকদের জন্য সেকালে শিক্ষকতা ছিল অন্যতম প্রধান পেশা রবীন্দ্র ছোটগল্পে অনেকগুলি শিক্ষক ও অধ্যাপক চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর সৃষ্ট কোন কোন ডাক্তার চরিত্র অর্থ-লোভী সিভিলিয়ান অর্থ দুশ্চরিত্র (বিচারক); বাঙালি ডেপুটি মেরুদণ্ডহীন, পুলিশ ঘুষখোর (দুর্বুদ্ধি), ইংরেজ ডেপুটি হঠকারী (মেঘ ও রৌদ্র) কিন্তু শিক্ষক কর্তব্য-পরায়ণ, অধ্যাপক জ্ঞানী, (অধ্যাপক), জ্ঞানসাধক (চোরাইধন, ছোটগল্প ইত্যাদি), কখনো আত্মভোলা।

গল্পগুচ্ছে বেশ কিছু সংখ্যক আইন ব্যবসায়ী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষক-অধ্যাপক, একজন মুনসেফ, একজন জজ চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এইসব শিক্ষিত চাকুরীজীবী বা পেশাজীবীরা সমাজের একটি নগণ্য সংখ্যা।

দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য, রোগ ব্যাধিতে অর্ধাহারী ছিল। উইলিয়ম ডিগবি তাঁর 'প্রসপারাস ব্রিটিশ ইনডিয়া' গ্রন্থে (১৮৯৯) ভারতীয়দের মাথা পিছু বার্ষিক আয়ের পরিমাণ বলেছেন ১৮ টাকা মাত্র।[৩২] এই আয় ছিল ক্রমাগত হ্রাসমান। ফলে দুর্ভিক্ষ আর অনাহারে মৃত্যু ছিল ভারতবাসীর সাধারণ নিয়তি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয়েছে ১৯ বার[৩৩] — মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবে বেড় কোটি।[৩৪] পুত্রযজ্ঞ এবং নারিদাদা গ্রন্থে ঐ নির্মম দুর্ভিক্ষের আভাস আছে। সরকারের দুর্ভিক্ষ কমিশন এইসব দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দেশ করেছেন দারিদ্র্য, খরা, কৃষির পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি, কিন্তু দেশের খাদ্য শস্য আর অর্থ সম্পদ কি বিপুল পরিমাণে সাগরপারে চলে যেত তার উল্লেখ থাকত না কমিশনের প্রতিবেদনে। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন এ-সম্পর্কে খানিকটা আভাস দিয়েছে :

> 'Even more significant was the rising export of food grains from starving India. The export of food grains principally rice and wheat rose from £ 858,000 in 1847 to £ 3·3 million by 1858, £ 7·9 million by 1877, £ 9·3 million by 1901 and £ 19·3 million in 1914, or an increase twenty two time over.'[৩৫]

ভারতের দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় কারণ বলে উল্লিখিত হয়েছে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক চাপ। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসংখ্যার হারের তুলনায় ভারতের সংখ্যার তুলনা করলে এই ধারণার নিরসন ঘটবে : ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লোকসংখ্যা বেড়েছে — ইংলণ্ড এবং ওয়েলস ৫৮%, জার্মানি ৫৯%, হলাণ্ড ৬২%, রাশিয়া ৭৩·৯%, সমগ্র ইয়োরোপে গড় ৪৫·৯% এবং ভারত মাত্র ১৮·৯%,[৩৬] তথ্য এর অতিজনতার চাপের কথা শোনা যায়। আসলে সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের অভাবেই দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ ক্রমাগত বেড়েছে।

জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের নিরসন-কল্পে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রতি তীব্র আরোপ করেছিলেন। এ বিষয়ে কবির তীব্র বক্তব্য মার্গারেট সাংগারকে জানিয়েছিলেন :

> ... In a hunger-stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family.

'শ্রীবিলাস' ৩০ জন বন্ধুর মধ্যে ৫ জনের বেশী পুত্রের অধিক সন্তানের জননী নয়। মনে হয় প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ অতি-জনতা দারিদ্র্যের কারণ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মেয়েদের বেশীর ভাগই পারিবারিক কাহিনী নির্ভর তাঁর সৃষ্ট এই সব পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোটামুটি এবং অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট। শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের প্রতি তাঁর অনীহাই প্রকাশ পেয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে ভারতীয় জনজীবনে আর্থিক-দুর্গতিকে একরূপ স্থায়ী করে তুলেছিল। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন রাজনৈতিক চেতনা প্রবল হচ্ছিল তখন দেশের মাটিতে কিছু কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। ১৮৮০-তে বৃহৎ পাট ও সূতীবস্ত্র কারখানা ছিল ১৯টি, ১৯০৩-এ তার সংখ্যা দাঁড়াল ৩৬-এ। ভারতে যা কয়লা খরচ হত তার ৮৩% উৎপন্ন হত বাংলাদেশে।[১১] ১৯০৩ এর মধ্যে বাংলায় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় ১০টি — এবং ভাগীরথীর উভয় কূলে বিরাট শিল্প এলাকা গড়ে উঠে ;[১২] এইসব কারখানা ও শিল্পে বাঙালির কোন স্থান ছিল না, ভূমিকা ছিল না। এগুলির মালিক ছিল ইয়োরোপীয় বা মাড়োয়ারি। বাঙালি তখন ছোট ছোট জুট প্রেসিং, আধনাড়াই কল,

সাবানের কারখানা গড়ে তুলছিল।[১৮] ১৯০৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম কাপড়ের কল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ স্থাপিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনায় বাঙালির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার প্রেরণা জাগল। দেশের তাঁত ও তাঁতশিল্প বাঁচাবার আশায় অনুপ্রাণিত হল। বিলেতি দ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং করতে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকগণ পুলিশের নির্যাতনের শিকার হল, তবু প্রচার চলল অব্যাহত গতিতে। স্বদেশী গোলা প্রতিষ্ঠিত হল — স্বেচ্ছা-সেবকগণ দেশের কাপড়, শাঁখা চুড়ি, নিব-কলম, দেশলাই ফেরি করতে লাগলেন।[১৯] জাতীয় ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, চামড়ার কারখানা গড়ে উঠতে লাগল — বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় গড়ে তুললেন তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল স্বদেশী-ভাণ্ডার। এইভাবে চলল দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি। শিলাইদহ ও পতিসরে রবীন্দ্রনাথের তাঁত শিল্প-প্রয়াসও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ব্যবসায় ও শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালির অনগ্রসরতা এবং অনুপস্থিতি সম্পর্কে কবির সচেতনতা লক্ষণীয়। বাস্তবে আমরা যেমন ১৯০৬ এর আগে কোন বাঙালি শিল্পপতি পাইনা তেমনি পাইনা রবীন্দ্র সাহিত্যেও। 'যোগা-যোগে'র (১৩৩৪–৩৫) মধুসূদন রবীন্দ্র সাহিত্যে একমাত্র ধনী ব্যবসায়ী। অবশ্য সে শিল্পপতি নয়। ১৯১১ পর্যন্ত ছোটগল্পেও উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি চরিত্র নেই। ১৯১৭ সালে রচিত পাত্র ও পাত্রীগল্পের সৎ কুমারকে ধনী ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। প্রতিহিংসা ও মণিহারা (১৮৯৮) (এবং ভাই ফোঁটা) গল্পে বাঙালি ব্যবসায়ীর নিদারুণ অসফলতারই পরিচয় আছে।

স্বদেশী আন্দোলনের কাল থেকে যেমন দেশে শিল্প কারখানা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি কৃষি নির্ভরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কৃষি-নির্ভর জনতার সংখ্যা ছিল ৬৫·৫%, ১৯১১-তে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭২·২%। বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প দাঁড়াতে পারছে না। অন্যদিকে কৃষি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকেই পিতৃপুরুষের

শিল্পকর্ম ত্যাগ করে কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করল।[১০] উনিশ শতকের শিক্ষিত লোকেরা অধিকাংশই ছিল বড়লোকের—রাজা জমিদার এবং উচ্চ-বর্ণের পোষ্য। শতাব্দীর শেষ দিক থেকে সাধারণ ঘরের ছেলেরাও যথেষ্ট সংখ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠল এবং বাড়তে লাগল বেকারের সংখ্যা। চাকুরির স্বাদটুকু আগে থেকেই 'ভদ্রলোক'দের দখলে ছিল—'অভদ্র'-দের তা পাওয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার।[১১] বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় অনেকেই যোগ দিয়েছিল বিপ্লবী দলে। ইংরেজ রাজত্বের 'যে টুকু আশীর্বাদ তা পড়েছিল সহরের ভাগে,' গ্রাম ছিল অবহেলিত। গ্রামের সাধারণ মানুষ কিভাবে শোষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোকহিত' প্রবন্ধে বলেছেন :

> 'জমিদার তাহাদিগকে মারিতেছে, মহাজন তাহাদিগকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে গালি দিতেছে, পুলিশ তাহা-দিগকে তাড়িতেছে, গুরু ঠাকুর তাহাদের মাথায় হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাঁট কাটিতেছে আর তাহারা কেবল সেই অদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে সমন-জারি করিবার জো নাই।'[১২]

আধি-ব্যাধি, দৈন্য-দারিদ্র্য জীর্ণ বাংলার যে রূপ কবির প্রবন্ধে পাই ছোটগল্পে তা পাই না। জমিদার, মধ্যবিত্ত, কিছু চাকুরিজীবী ও পেশাজীবীর সংখ্যাই 'গল্পগুচ্ছে' বেশী। দারিকনু, অছিমদ্দি, চুনি, ছিদাম, মধুকৈবর্ত সেখানে সংখ্যায় খুবই কম।

॥ ছয় ॥

বহু শতাব্দীর ব্রাহ্মণ আনুগত্যকে অস্বীকার করে রাজা রামমোহন রায় যে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মবাদ প্রচার করেন তা সমকালীন বাংলা তথা ভারতে সৃষ্টি করেছিল এক বিরাট ভাব-বিপ্লব। সুদীর্ঘকালের সামাজিক কুসংস্কার থেকে মানুষের মুক্তি, অপৌত্তলিক ঈশ্বর উপাসনা, নারীর মুক্তি ও অধিকার

প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য। রামমোহনের মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি নব্যবঙ্গীয়দের সম্পর্কে পাশ কাটিয়ে চলতেন।[৭৩] তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অনুরাগী। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর সঙ্গে মি-মত পোষণ করে যে মত প্রচার করলেন তাতে ছিল পৃথক জাতিসত্তার স্বীকৃতি এবং ঐতিহ্য নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেনের প্রয়াসে সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ হয় এবং তিনি প্রগতিশীল নেতৃত্বের গৌরবে সমাসীন হয়েছিলেন। ব্যক্তি প্রয়োজনে সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করায় তাঁর নেতৃত্বের প্রতি সমাজের আস্থা বিচলিত হল এবং তাঁর সমর্থকগণ হলেন দ্বিধা বিভক্ত। কেশব-বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন আনন্দমোহন বসু। স্মরণীয় যে কেশব সেন ও আনন্দমোহন উভয়েই আদর্শগতভাবে ছিলেন প্রগতিশীল, পাশ্চাত্যানুরাগী, সংস্কারবাদী। মাধব গোবিন্দ রানাডে এই সময় পুনায় প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। এঁদের সঙ্গে সংঘাত হল হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের—বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর অনুসারীরা যে নব্যহিন্দুত্ব প্রচার করলেন তা প্রত্যক্ষবাদী দর্শন ও জঙ্গীজাতীয়তাবাদ পুষ্ট ছিল। সমসাময়িককালে দয়ানন্দের আর্যসমাজ (১৮৭৫) এবং মাদাম ব্লাভাৎস্কির থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি (১৮৭৬) হিন্দুপুনর্জাগরণের পক্ষে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করে; ফলে ঐতিহ্য নিরপেক্ষ প্রগতিবাদীদের সঙ্গে পুনর্জাগরণবাদীদের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে :

> Naturally, then there was found to be a reaction, at any rate correction to the denationalizing tendencies engendered by the reformist movements. The Arya Samaj in the North west, founded by the venerable Swami Dayananda Sarwaswati, and Theosophical movement from the South furnished

a necessary correction to the spirit of heterodoxy and even heresay which the western brought with it.[১৪]

বঙ্কিমচন্দ্র যখন প্রচার ও নবজীবন পত্রিকায় পুনর্জাগরণবাদী মত প্রচার করছিলেন তখন শশধর তর্কচূড়ামণি একই ধরণের প্রচারে নামলেন (১৮৮৫)। তিনি বললেন : 'আমাদের হিন্দুধর্মের মধ্যে এত যে ইংরেজী বিদ্যা লুক্কায়িত ছিল তাহা আমরা বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না।'[১৫] তর্কচূড়ামণি এবং নব্যহিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।[১৬] তর্ক চূড়ামণির প্রচারে সহায়ক হয়েছিলেন চন্দ্রনাথ বসু এবং 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু। যোগেন্দ্রনাথ তাঁর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮) উপন্যাসে ব্রাহ্ম মহিলাদের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন। সেকালে ব্রাহ্ম সমাজ সামাজিক প্রগতি ও যুক্তি চর্চায় অনেক অগ্রগামী ছিলেন, সুতরাং মডেল ভগিনীর কুৎসা উদ্দেশ্যমূলক ব্রাহ্ম বিরোধিতা। নব্য হিন্দুদের ব্রাহ্ম-উপাখ্যান ১৮৯৯ সালে 'অধ্যাপক' গল্পে। চন্দ্রনাথ বসুর রচনায় কুরুচি ছিল না। তাঁর 'হিন্দু পত্নী', 'হিন্দু বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' এসব রচনার মধ্যে গোঁড়ামি ছিল, তবে তা কাউকে আহত করে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু বিবাহ'[১৭] নামক সুদীর্ঘ রচনায় চন্দ্রনাথ বসুর ঐ দুই প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রসঙ্গসমূহের আলোচনা করেন। কবির এ কালের মানসিক প্রতিক্রিয়া শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে খাতা, দৃষ্টিদান, সমাপ্তি, পুত্রযজ্ঞ ইত্যাদি গল্পে। আর্যামির অহংকারের প্রতি কবি কঠিন বিদ্রূপ করেছিলেন 'দানু চাসু', কবি অবতার' ইত্যাদি কবিতায়। 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পটিতে কবির সেই তপ্ত মনের স্পর্শ লেগেছে বলে মনে হয়।

হিন্দু ধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য, আচার-সংস্কার, দেবদেবী এবং তার সাম্প্রতিকতম সংযোজনের মধ্যে থিয়োসোফিস্টরা গুরুতর বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য অনুভব করেছিল। পৃথিবীর চরম প্রগতিশীল দেশ থেকেই এসেছিলেন কর্নেল অলকট আর মাদাম ব্লাভাৎস্কি। কলকাতায়ও সোসাইটির শাখা

9712

খোলা হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী[১৮] লেডীস থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী ছিলেন (১৮৮২-১৮৮৬) কিন্তু মাদাম ব্লাভাৎস্কির আমেরিকা কার্যকলাপের জন্য তিনি সে-পদ ত্যাগ করেন। বিপিন চন্দ্র পাল থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটি সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> This society told our people that instead of having any reason to be ashamed of their past or of the legacies left to them by it all, because their ancient seers and saints had been spokesmen of the highest truths, and their old books, so awfully misunderstood today, had been the repositories of the highest human-wisdom. Our people had hitherto felt perpetually humiliated at the sense of their representatives of the most advanced people of the modern world, ... at once raised us in our own estimation and created a self-confidence in us that ... instead of appologising for our medieval ideas and institutions and seeking to reform and reconstruct these after modern European ideals, boldly stood up in defence of them.[১৯]

মধ্যযুগীয়তা আর অতিলৌকিকতার প্রতি থিয়োসোফিস্টদের বিশ্বাসের খানিক পরিচয় আছে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে। ধর্মের নামে আমাদের সমাজে অনেক সংকীর্ণতা, হৃদয়হীনতা, অমানবিকতা প্রচলিত আছে, পুত্রমন্ত্র, অনধিকার প্রবেশ, নুরাণা ইত্যাদি গল্পে তার প্রতিবাদ আছে।

॥ সাত ॥

ধর্ম বাঙালি জীবনে হয়ে উঠেছিল প্রথারই নামান্তর—ধর্মের নামে সমাজে কৌলীন্য, অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ, পুরুষের একাধিপত্য, নারীর বাল্য বিবাহ, পুরুষের অবাধ বহু বিবাহ, অবরোধ প্রথা, নারীর চিরপরাধীনতা[১০] চলে আসছিল দূর অতীত থেকে। এই প্রথা-পীড়িত সমাজে নারীর দুর্ভোগের অন্ত ছিল না।

Religion had become but another name for convention and Bengal in the depths of her degradation presented a mournful spectacle of caste-ridden, priest-ridden country. The worst sufferers in all these were women.[১১]

উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয়, সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের একটি স্থূল বৈশিষ্ট্য এই যে বড় বড় আন্দোলন নারী জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয়েছিল। বাংলার রেনেসাঁর অগ্রদূত রামমোহন রায় ধর্মীয় সংস্কার ও নারীর মুক্তি-আন্দোলনকে সংলগ্ন কার্যসূচীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সতীদাহ নিবোধ আইন পাশ হয় (১৮২৯)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রাণপণ চেষ্টা করে বিধবার পুনর্বিবাহ আইন পাশ করিয়েছিলেন (১৮৫৬); এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজ ঘোরতর আপত্তি তুললেও তা গ্রাহ্য হয়নি। বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন, ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে যে বিবাহ-আইন পাশ হয় রক্ষণশীল সমাজের চাপে তাতে কনের বয়স নির্ধারিত হয় দশ বছর। ব্রাহ্ম সমাজ নারী মুক্তির অনুকূলে যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তারই ফলরূপে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট পাশ হয়।

বিধবা বিবাহ আইনত চালু হলেও সমাজের রক্ষণশীল অনড় মনোভাবের ফলে সে ক্ষেত্রে গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে কোন লক্ষ্যযোগ্য সুফল

দেখা যায়নি। বিদ্যাসাগর এবং তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় যে সীমিত সংখ্যক বিধবার বিবাহ হয়েছিল তার অধিকাংশ স্বাভাবিক সম্মতি জনিত নয়; কখনো আদর্শের প্রতি প্রবল আবেগ, কখনো বরপক্ষের সুযোগ সুবিধা লাভের আশা সেগুলির পশ্চাতে সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রতিবেশিনী' গল্পে এসম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর এবং ১৮৯১ সালের সহবাস সম্মতি আইন পাশের পরও বাংলায় বিধবার সংখ্যা (১৯০১) বিরাট রকমেরই ছিল[৮২]

বয়স	বিধবার সংখ্যা
০—১	৮৫৯
১—২	১০৩৯
২—৩	১৮৮৬
৩—৪	৩২৩২
৪—৫	৫১৩৩
৫—১০	৭৮৪০৭
১০—১৫	২২৭৩৬৭

কৌলীন্য প্রথা বাঙালি সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। এরই প্রভাবের ফলে পুরুষের বহুবিবাহ উনবিংশ শতাব্দীর সাতের দশকেও ছিল অপ্রতিহত। বিবাহকে বহু কুলীন জীবিকার উপায় হিসাবে গণ্য করত। বিদ্যাসাগর তাঁর বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (১৮৭১, দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৭৩) নামক দুখানি পুস্তকে এর ভয়াবহ পরিসংখ্যান ও কুফল সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পেশ করেছেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে হুগলির ৩৩ জন কুলীন ২১৫১ জন স্ত্রীলোকের পাণিপীড়ন করেছিলেন।[৮৩] এই হতভাগিনী নারীদের অধিকাংশের জীবনে স্বামী সংসর্গ, ভালবাসা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ছিল না। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় যে দশ হাজার পতিতা ছিল তাদের মধ্যে অনেক ছিল কুলীন খ্রাহ্মণ বিধবা।[৮৪] বহু বিবাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ প্রচলিত না-থাকা এবং

বালা বিবাহ প্রথা পরিত্যাগ যুক্তির কারণ। কবির 'বিচারক' গল্পে তার আভাস আছে। ১৮৬৭ সালে বাংলার গবর্ণর সিসিল বিডন বহুবিবাহ বিষয়ে যে তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করেছিলেন তার অন্যতম সদস্য ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।[৮০] কমিটির প্রতিবেদনে বহু বর্ণাস্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলেও এবং বহুবিবাহ চরম সামাজিক-অকল্যাণ বলে আখ্যায়িত হলেও এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগর আইন প্রণয়নের পক্ষে থাকলেও তিনি সমর্থন পাননি। রক্ষণশীলতা তখনো দূর হয়নি এবং সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে কেউ কেউ সম্মত ছিলেন না। তারপর হিন্দুপুনর্জাগরণবাদীরা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে বহুপত্নীক সংসারের নির্মম চিত্রাঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কুপ্রথার অন্ত-কামনা লক্ষ্য করা যায়।

•

বাংলাদেশের নারী জীবনে নিগ্রহের আর একটি কারণ পণপ্রথা। প্রাক-ব্রিটিশ কৃষিভিত্তিক সমাজে এই দুষ্ট প্রথার প্রভাব ছিল না।[৮১] উনবিংশ শতাব্দীর বিত্তবান বর্ণ হিন্দু সমাজে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজী শিক্ষা যেমন চাকুরির বাজারে ডিভিডেন্ড্ আনল তেমনি বিয়ের বাজারেও। ডিগ্রি পেলেই বিয়ের বাজারে পাত্রের দর চড়ে যেত।[৮২] ছেলে উচ্চ শিক্ষিত, ভাল চাকুরে অথচ বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবক, প্রায়শই নিষ্ঠুর দরকষাকষি করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই প্রথা প্রবল আকার ধারণ করেছিল।[৮৩] পনের টাকার লোভে পাত্রপক্ষ এত দূর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন যে বধূদের উপর তার প্রতিক্রিয়া পড়ত এবং অকালে নিভে যেত অনেক জীবনের আলো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেনাপাওনা, হৈমন্তী ইত্যাদি গল্পে এই অনপনেয় কলঙ্কের চিত্র এঁকেছেন মর্মস্পর্শীভাবে।

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বাঙালি সমাজ শুধু উদাসীনই ছিল না, কুসংস্কার গ্রস্তও ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যখন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তখন কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার সঙ্গে সামাজিক

কুসংস্কারও বাধা হয়েছিল সে প্রমাণ দিয়েছেন অ্যাডামস্ তাঁর শিক্ষা প্রতিবেদনে (১৮৬৮)।[১৯] মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানে অভিভাবকের সামাজিক নিপীড়নের ভয় ছিল। তবু শতাব্দীর শেষদিকে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায়, ব্রাহ্ম সমাজের প্রয়াসে এবং মিশনারিদের উৎসাহ-উদ্যোগে মেয়েদের স্কুল সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্রীসংখ্যা। ১৮৫৪ সালে বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৮৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬৮৬৯ জন। ১৮৮১ সালে স্কুল ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫,৭৬০ জনে।[২০] শিক্ষিত বাঙালিরা বিয়ের জন্য তখন শিক্ষিতা মেয়ের খোঁজ করতেন। বিয়ের বাজারে ক্রমাগতই শিক্ষিতা মেয়ের চাহিদা বেড়েছিল।[২১] ভারতীয়রা ইতিমধ্যে উচ্চ সরকারী চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন—বাঙালি শিক্ষিত যুবকরা ডেপুটি, মুনসেফ, স্ট্যাটিউটরি সিভিলিয়ান ইত্যাদি হয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলায় নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ আন্দোলনে অভূতপূর্ব গতিসঞ্চার লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৯ সালে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু এনট্রেন্স পাশ করে নারীমনে নিশ্চিত আশার সঞ্চার করেছিলেন। এই কাদম্বিনী (গাঙ্গুলি) বসুই ১৮৯০-তে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন[২২] স্বর্ণকুমারী দেবী কংগ্রেসের এই অধিবেশন একমাত্র মহিলা "প্রতিনিধি" রূপে যোগদান করেন।[২৩] ১৮৮৩ সালের দিকে নানা কারণে জনচিত্তে বিক্ষোভ দেখা যায়—'এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দান করেন বেথুন স্কুলের ও কলেজ বিভাগের ছাত্রীরা'।[২৪] লর্ড রিপনের ভারতপ্রীতি স্মরণ করে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য স্কুল কলেজের যে চল্লিশ জন ছাত্রীর একটি দল রেলস্টেশনে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে, পরবর্তীকালের মহীয়সী বাঙালি কামিনী রায়, সরলাদেবী এঁরাও ছিলেন।[২৫] সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের আগমনও ছিল আশাব্যঞ্জক। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ছাড়াও কয়েকজন শক্তিধর লেখিকার নাম পাওয়া যাচ্ছে; শ্রীমতি সরোজ কুমারী দেবী, শ্রীমতি সরলা দেবী, শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতি বিনয় কুমারী বসু,

শ্রীমতি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীমতি প্রতিভা দেবী এবং শ্রীমতি কৃষ্ণভাবিনী দাস।

বাঙালি নারী মুক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর নাম উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে এসে নারীরা অধিকারের দাবি উত্থাপন করতে এগিয়ে আসেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিতা রমা বাঈ কলকাতায় বক্তৃতা করেন। তাঁর ওজস্বিনী বক্তব্য পুরুষ-সমাজের গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছিল। তিনি তীব্র ভাষায় বলেছিলেন 'মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়'।[১৬] কৃষ্ণভাবিনী দাস বলেন: 'স্ত্রী জাতি কেবল পুরুষের জন্য-সৃজিত' হয়েছে এই ধারণা 'ঘৃণিত ও অসভ্য'।[১৭] রবীন্দ্রনাথের দিদি গল্পের শশিকলা, মানভঞ্জনের গিরিবালা অনেকটা সমকালীন নারী জাগরণের প্রতিভূ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সমসাময়িক কালে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখিসমিতি' (১২৯৩) এবং তাঁর উদ্ভাবিত 'মহিলা শিল্প মেলা' (১২৯৫) সম্ভ্রান্ত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও নারী কল্যাণে তাঁদের প্রয়াস স্মরণীয়।[১৮]

পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর নানা প্রকার নিগ্রহের মধ্যে বালিকা বধূদের করুণ বিড়ম্বনা বাঙালি সমাজে অনেক অপনেয় লজ্জার কারণ ঘটিয়েছিল। ১৮৬০ সালে হিন্দু মেয়ের বিয়ের বয়স ১০ বছর নির্ধারিত হয়েছিল, এর আর কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ২২-২৩ বছর বয়সে ১০ বছর বয়স্কা ভবতারিণী দেবীকে বিয়ে করেন। ইচ্ছা করলেই সেকালে এর চেয়ে বেশি বয়সের পাত্রী পাওয়া সম্ভব ছিল না। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে ঘটে বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের করুণতম দুর্ঘটনা হরিমাইতির স্ত্রী ফুলমতির মৃত্যু। বাল্যবিবাহের বিড়ম্বনার কথা রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যের 'নারীর উক্তি', 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। 'বধূ' কবিতায় বালিকাবধূ বলেছে তার 'আঁখিজল কেহ বোঝে না'। কবির খাতা, সমাপ্তি ইত্যাদি গল্পে বালিকা বধূর বিড়ম্বনার

পরিচয় আছে। ১৮৯১ সালে সহবাস সম্মতি আইন পাশ হয় এতে কনের বয়স নির্ধারিত হয় ন্যূনতম বার বছর। নারী সুখে-দুঃখে পুরুষের সহচরী হতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে জীবনযাত্রা প্রণালীতে এমন পরিবর্তন এসেছে যে 'স্ত্রীলোককে ভূলুণ্ঠিত হৃদয় রাশি হয়ে থাকলে চলবে না। মেরুদণ্ডের উপর ভর করে ঋজু উৎসাহীভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে'।[৯৯] এমন নারীর পরিচয় রবীন্দ্র ছোটগল্পে ১৮৯১-থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে সংখ্যায় অল্প হলেও অনেক-গুলি নজরে পড়বে—ভারাপ্রসন্নের কীর্তি-র দাক্ষায়ণী, দৃষ্টিদানের কুসু, মাল্যদানের পটল ইত্যাদি। বিশ শতকের সৃষ্টি 'মাষ্টার মশায়'-এর মা কর্মী ও ত্যাগী, 'রাসমণির ছেলে'-র রাসমণি সুখে-দুঃখে-কর্মে শুধু স্বামীর পার্শ্ব চারিণীই নয়, সংসারের পরিচালিকা। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমাজের আগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল—কিন্তু ১৯৭০ পর্যন্ত বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার হার ছিল ৩২%।[১০০] ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ জন মহিলা স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন—এঁদের মধ্যে ছিলেন ৩ জন খ্রাহ্ম, ২ জন দেশী খ্রীস্টান এবং ১ জন ইহুদি।[১০১] ১৮৯১-১৯১১ এই বিশ বছরের রবীন্দ্র ছোটগল্পে অনেক শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত পুরুষ চরিত্র মিলছে। নায়িকাদের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পোষ্ট-মাষ্টার গল্পের নায়িকা ঝি বালিকা রতনও শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহী, মেঘ ও রৌদ্রে গিরিবালা শশিভূষণের কাছে বর্ণপরিচয় শিখছে। খাতার উষা-র লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সত্ত্বেও গোঁড়া সমাজ তার পথে বাধা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে একমাত্র উচ্চ শিক্ষিত নায়িকা অধ্যাপক-এর কিরণ। সে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে মনিহারার নায়িকা ও কলেজ-শিক্ষিতা। একই বছরে লেখা বিশ শতকের প্রথম দশকে দর্পহরণ (১৯০২)-এর নির্ঝরিণী সাহিত্য চর্চা করে, নষ্ট-নীড়ের চারু গৃহেই লেখাপড়া করে। কর্মফলের নেলি অনেকটা উগ্র আধুনিকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নায়ক নায়িকারা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং আত্মপ্রত্যয়শীল। এইভাবে সমাজ ও কালের বিবর্তনের রূপ রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

॥ আট ॥

বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে প্রাক-ব্রিটিশ যুগে কোন 'মবিলিটি' বা গতিশীলতা ছিল না—বর্ণাশ্রম দ্বারা গোটা সমাজ ছিল শৃঙ্খলিত। ইয়োরোপের জড়ম শক্তিস্পর্শে সেখানে গতিশীলতা জাগল। সমাজতাত্ত্বিক সোরোকিন বলেছেন :

> 'By Social mobility is understood any transition of an individual or social object or value—anything that has been created or modified by human activity from one social position to another.'[১০২]

বাঙালি সমাজের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সমাজতত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যের চমৎকার মিলন আছে এবং 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলির মধ্য দিয়ে তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির সমাজ জীবন ছিল 'সংকীর্ণ এবং অতি পরিচিত', 'গ্রাম সীমার মধ্যে বদ্ধ' চিত্তানুশীলনের বিষয় ছিল পুরা কাহিনী।[১০৩] মানুষের মূল্য আর শ্রদ্ধাবোধও সেখানে হয়ে পড়েছিল সংকুচিত। জন্মগত আভিজাত্য আর বর্ণগত-শ্রম বিন্যাস দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হত। পশ্চাত্যশিক্ষা, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জন্মগত আভিজাত্যের স্থানে প্রাধান্য লাভ করল নবার্জিত আভিজাত্য; বর্ণাশ্রমের স্থানে মানুষের সামনে এসে দাঁড়াল যুক্তিনির্ভর মানবতা। জন্মগত ভাবে অনভিজাত শ্রেণীর হয়েও কর্মশক্তি এবং অর্থ কৌলীন্যের বলে রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সমাজে নেতা হয়েছিলেন। পিরালী ব্রাহ্মণ ও অকুলীন ঐতিহ্যের ধারক হয়েও দ্বারকানাথ ধন ও সংস্কৃতি গৌরবে প্রিন্স্ এবং দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি হয়েছিলেন। যাঁরা এতকাল বেদ-বেদান্ত ধর্মকর্ম নিয়ে ছিলেন তাঁদের সন্তান সাগরপাড়ি দিয়ে আই. সি. এস. হলেন (যেমন বরদা নাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি),

ডেপুটি হলেন এবং রাজকীয় পরিষদের সদস্য হয়ে রাজ্য পরিচালনার নির্দেশ দিতে লাগলেন। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যা ও বিত্তের গৌরবে গোত্রোন্নতি ঘটল।[১০৪] কেউ পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিবর্তন করে খ্রীস্টান হলেন, কোন বাঙালি অবাঙালি এমন কি শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করলেন। এইভাবে সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটল—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চক্রবালীয় (Horizontal) গতিশীলতা ঘটল। অন্যদিকে শীর্ষ (vertical) প্রক্রিয়ায় ঘটেছে আরোহ এবং অবরোহ মূলক গতিশীলতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একদা যারা ছিল অতি সাধারণ তারা ফড়িয়া মুৎসুদ্দিগিরি করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে, ভূস্বামী হয়েছে; পক্ষান্তরে পুরাণ জমিদার নিঃস্ব হয়েছে, সচ্ছল কৃষক-কারিগর হয়েছে ক্ষেত মজুর।

সোরোকিন কথিত ('transition of an individual or social object or value') মূল্যবোধের পরিবর্তন রবীন্দ্র ছোটগল্পের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞাত কালবাহিত আচার-প্রথা ভেঙে 'ত্যাগ' গল্পের নায়ক ব্রাহ্মণ হেমন্ত মুখার্জি বিয়ে করেছে কায়স্থ বিধবা কুসুমকে। প্রায়শ্চিত্তের অনাপরুদ্ধ সন্তুষ্ট পাড়ি দিয়ে শাস্ত্রের নির্দেশ ভেঙেছে, দ্বিতীয়ত সে শ্বেতাঙ্গিনীকে বিয়ে করে সমাজ-বিগর্হিত (?) কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই দুই নায়ক মূল্যবোধের পরিবর্তনে স্মরণযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। অনাথ বন্ধু শাস্ত্র নির্দেশ অমান্য করে ব্যারিস্টার হয়ে বেকারত্বের অভিশাপ মুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক জীবনে নিরাপত্তার অন্বেষণ করেছে; সমাজতত্ত্বের দিক থেকে এটা অর্থনৈতিক গতিশীলতার নিয়ামক। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা গল্পের গুরুচরণ খ্রীস্টান নয়, লোকে তাকে ডফ সাহেবের শিষ্য বলে, এ দুটোর একটাও না হলে কিছু আসে যায় না। সে মৃত্যুর প্রাক্কালে, বরদা সুন্দরীর নামে উইল করে ভাইপো নবদ্বীপের পিণ্ড-র প্রতি উপেক্ষা করে হয়ত শাস্ত্র-বিরোধী কাজ করেছে কিন্তু অসহায়া বিধবার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ মানবীয় মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছে।

প্রচলিত ধর্মাচরণের মধ্যে আচার-সর্বস্বতা বাঙালির হৃদয়বৃত্তিকে অনেক ক্ষেত্রে করে তুলেছিল কৃত্রিম এবং সত্যবোধহীন। সেই আচার-পরায়ণতার চেয়ে মানব-সত্য এবং হৃদয় সত্য অনেক বড়, এই নতুন চেতনা 'দুয়ানা' আর 'মুসলমানীর গল্প' নামক খসড়ায় প্রকাশিত হয়েছে। মুসলমান নবাব-কুমারী ব্রাহ্মণ কেশব লালকে ভালবেসে সামাজিক আচারের দ্বারা আঘাত পেয়েছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ দুহিতা কমলা সুখী হয়েছে পাঠান-পুত্র করিমকে বরণ করে। ল্যাবরেটরির নায়িকা সোহিনী পাঞ্জাবী, তার স্বামী নন্দকুমার বাঙালি। ১৯০৭ সালে বাঙালি বালা হবিপ্রভা তাগেদা জাপানী স্বামীকে নিয়ে জাপান গিয়ে বাঙালির সংকীর্ণ জীবনবৃত্তে আলোড়ন জাগিয়েছিল।[১০] রবিবার গল্পের অতীক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে হয়েও নাস্তিক হয়েছিল। সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে এমন গতিশীলতা একদিন বাঙালি সমাজে ছিল অকল্পনীয়।

'একরাত্রি'র নায়ক নায়েব পুত্র দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে। লেখক নিজে বিদ্রূপ করেছেন তার গ্যারিবলডি, ম্যাটসিনি হবার বাসনাকে। কিন্তু এই বাসনাই তো কালের ধারা। ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্পেষণে মানব-আত্মার যে অবমাননা ঘটছে তার বিরুদ্ধে, সেই শাসন আর শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছে এক জমিদার পুত্র (বেষ ও রৌদ্র) আর এক নেটিভ ডাক্তার (দুর্বুদ্ধি)।

মাস্টার মশায় গল্পের অধর বসুমদারের পিতা পৈতৃক সম্পত্তি দ্বারা বড় লোক, এমন কথা ভাবা যাচ্ছে না — তার ঐশ্বর্য এসেছে মুৎসুদ্দিগিরি করে। এ তার অনির্ধারিত পেশার উন্নতি মার্গে আরোহণ। বাংলার উর্বর মাঠের শস্য-ফলে মানুষ পল্লীবাসী ইংরেজ আমলের শোষণ-নির্যাতনে হয়ে পড়েছিল ভূমিহীন ক্ষেত মজুর। শান্তি-র দুখি-ছিদাম তলিয়ে গেছে নিঃসীম দারিদ্র্যের অতলে।

এমনিভাবেই পাশ্চাত্যশিক্ষা, ইংরেজ-সৃষ্ট অর্থনীতি, ইয়োরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি, বাঙালির জগৎ-জীবনে এনেছিল ভাঙা-গড়া এবং গতিশীলতা।

তথ্য-সংকেত :

১। সিংহ, শ্রীবিমলচন্দ্র : সমাজ ও সাহিত্য আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, প্র-প্র কলকাতা, ১৩৫০, পৃঃ ১৬।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রবন্ধ), সাহিত্য, বি-ভা গ্রন্থালয়, পু-মু ১৯৫৮, পৃঃ ১৩৭।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর অসিত কুমার : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, বি-স, কলকাতা ১৯৬৫, পৃঃ ১৭।

৪। ঐদেব, পৃঃ ১৭।

৫। Sarkar, Sir Jadu-Nath The History of Bengal vol. II, The University of Dacca, Second impression 1972, Page 497, 499.

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কালান্তর, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৫৫, বি-ভা গ্রন্থালয়, পৃঃ ৩-৪।

৭। আবদুল ওদুদ, কাজী বাংলার জাগরণ, বি-ভা, প্র-প্র ১৩৬৩, পৃঃ ৮।

৮। মজুমদার, গোপাল : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৬১, পৃঃ পূর্বাভাস, এক।

৯। Tagore, Rabindranath : Letters To A Friend, edited by Andrews, C· F ; 1928, Page 80.

১০। Cattin, George E. G. Robindra nath Tagore, Allied Publishers Private Limited, Bombay 1964. Page 13.

১১। Desai, A. R. : Social Background of Indian Nationalism, Bombay 1954, Page 1.

১২। Dutt, Romesh : The Economic History of India under Early British Rule, London 1901, Preface Page 1-2.

১৩। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : রবীন্দ্রজীবনী, প্র-খ বি-ভা গ্রন্থালয়, সংশোধিত সংস্করণ ১৩৬৭, পৃঃ ১৬।

১৪। শাস্ত্রী, শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, কলকাতা দ্বি-স ১৯৫৭, পৃঃ ২২৫।

১৫। Marx, Karl : New York Daily Tribune
1. The British Rule in India, June 1853 ;
2. The East India Company, its History and outcome July 11, 1853 ;
3. The Future Results of British Rule in India August 8, 1853.

১৬। বাগল, যোগেশচন্দ্র : বাংলার নবজাগরণের কথা, বসুধারা প্রকাশনী, কলকাতা প্র-প্র ১৩৭০, পৃঃ ৫১। ঐ, মুক্তির সন্ধানে ভারত, দি মডার্ন পাবলিশার্স ১৩৭১, পৃঃ ৬১।

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : ইংরাজের আতঙ্ক, সাধনা, পৌষ ১৩০০ ; র, র-র ১০। ৫৩৭-৪১।

১৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ, (৪ খণ্ড একত্রে), বি-ভা পু-মু ১৩৬৭, পৃঃ ৩৫১।

১৯। Ghose, Sisir Kumar The Amrita Bazar Patrika 2nd May, 1874.

২০। চতুরঙ্গ, র-র বি-ভা চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮।

২১। বাগল, যোগেশচন্দ্র : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত, নূতন সংস্করণ মৈত্রী, কল-কাতা ১৩৭৫, পৃঃ ১১।

২২। "শুনিতেছি নাকি শতকোটি দাস
মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায়
হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা
যে গায় গাক আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান
এস গো আমরা যে কজন আছি
আমরা ধরিব আরেক তান।"

তদেব, পরিশিষ্ট।

২৩। Banerjea, Surendranath : A Nation In Making, Oxford University Press, 1963, Page 40.

২৪। Pal, Bipin Chandra : Memories of My Life and Times, Modern Book Agency, Calcutta 1932, Page 248.

২৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : জীবনস্মৃতি, সুলভ সংস্করণ, পৃ. মু আষাঢ় ১৩৭০, পৃঃ ৭৮-৭৯।

২৬। ভারতী চৈত্র ১২৮৯. পৃঃ ৫১১-১৬।

২৭। ভারতী শ্রাবণ ১২৮৯, পৃঃ ৭৯-৮৪।

২৮। ভারতী কার্তিক ১২৯০ পৃঃ ২৮৯-৯৫।

২৯। Congress Presidential Addresses : Vol I, 1935 Page 159.

৩০। Ibid Page 239.

৩১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : গল্পগুচ্ছ, পূর্বোক্ত, মেঘ ও রৌদ্র, পৃঃ ২২৭।

৩২। তদেব : চৈতালি (অভিমান), র-র বি-ভা ১৩৭০, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৩।

৩৩। তদেব : য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, র-র ১ম খণ্ড, বি-ভা পৃঃ ৫৫৬।

৩৪। তদেব : রাজনীতির দ্বিধা, র-র ১০ম খণ্ড, বি ভা, পৃঃ ৪০৮।

৩৫। তদেব : মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুজ্জে, র-র ১০ম খণ্ড বি ভা ১৩৬৫, পৃঃ ৫৭৬।

৩৬। Government of India, Home Education, February 1904, A-31-42.

৩৭। Ahmad, Kamar Uddin A Social History of Bengal, 3rd ed. Dacca, 1970, Ch. 1, Page 3.

৩৮। Pal, Bipin Chandra Indian Nationalism, Page 18.

৩৯। পথ ও পাথেয় : র-র বি-ভ ১৩৬৫, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭।

৪০। Morley, John Recollections, Vol II, London, 1921, Page 282.

৪১। Government of India, Home Political, 1913, A-72-75.

৪২। Fourth Parliamentary Report 1773, Page 535.

৪৩। Dutt, Romesh The Economic History of India under the early British Rule, ibid, Page 29.

৪৪। Fullerton, Willium A view of English insert in Iodia, quoted in India To-day by Rajani Palme Dutt, Peoples Publishing House, Bombay, 1947, Page 92-93.

৪৫। Sinha, N. K The Economic History of Bengal, Vol. III, Calcutta 1970 Page 136.

৪৬। ঘোষ, বিনয় : বাংলার নব জাগৃতি, কলকাতা ১৩৫৫, পৃঃ ৫১।

৪৭। Report of the Calcutta University Commission 1917-'19, Vol I, Page 49.

৪৮। আনিসুজ্জামান, ডক্টর : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা ১৯৭১, পৃঃ ৬৫।

৪৯। India Today, ibid, Page 187.

৫০। Indian Central Banking Enquiry Report, 1931. Page 39.

৫১। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, অখিলবন্ধু মিত্রকর্তৃক পুনর্বিন্যাস ও পুনর্লিখন সমিতি, কলকাতা ১৩৮০, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২।

৫২। Sinha, Pradip Nineteenth Century Bengal, Aspects of Social History, Firma K. L. Calcutta 1965, Page 30.

৫৩। Sen, Sachin : Studies in the Land Economics of Bengal, 1935, Page 295.

৫৪। Statistical Abstract 1870-'80—1888-'89, Page 48.

৫৫। গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র মোহন : বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৩৬৮, পৃঃ ১৮।

৫৬। অমৃতবাজার পত্রিকা ১১ই অক্টোবর ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৫৭। Majumdar, Bimanbehari ; Heroines of Tagore, Page 35.

৫৮। Roy Choudhury, Majumdee & Dutt : An Advanced History of India, 1935 Page, 788.

৫৯। গল্পগুচ্ছের বিভিন্ন গল্পে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির উল্লেখ দেখা যায়, যেমন :

ম্যালেরিয়া	ইচ্ছাপূরণ, ভাইফোঁটা, রবিবার
টাইফয়েড	চোরাইধন, রবিবার,

প্লেগ	মাসাদান
যক্ষ্মা	শেষের রাত্রি, প্রগতিসংহার
সন্নিপাতিক	স্ত্রীরপত্র
নিউমোনিয়া	শেষকথা, প্রগতিসংহার

৬০। Report of the Calcutta University Commission, 1917-1919, Vol. 1, Page 49,

৬১। India To-day, Ibid, Page 28.

৬২। সেনগুপ্ত, সুখরঞ্জন : দুর্ভিক্ষ (প্রবন্ধ), ভারতী, আশ্বিন, ১৩১৫, পৃঃ ২৮৩-৮৪।

৬৩। India To-day, Ibid, Page 106.

৬৪। Ibid, Page 106.

৬৫। Ibid, Page 28.

৬৬। মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, উক্তি, রবীন্দ্র জীবনী, ৪-খ, ১৩৭১, পৃঃ ৪৬।

৬৭। Imperial Gazetteer of India Vol. VII, Bengal Vol X, Oxford 1909.

৬৮। Mukherjee, K Foundation of Indian Economics, 1919, Page 365.

৬৯। মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার : ভারতের জাতীয় আন্দোলন, প্রথম, কলকাতা বু-স, ১৯৬৫, পৃঃ ১৮।

৭০। Census of India, Report, 1911, Vol. 1, Page 408.

৭১। Broomfield, J. H. : Elite conflict in a plural society Twentieth Century Bengal, Oxford University Press, Bombay, 1968, Page 12-13.

৭২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কালান্তর, (লোকহিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫।

৭৩। Sen, Amit : Notes on the Bengal Renaissance, 2nd ed. 1957, Page 29-30.

৭৪। Sitaramyya, B. Pattabhi The History of the Indian National Congress, Vol 1, Padma Publications Limited, Bombay, reprint, 1946, Page 13-24.

৭৫। বেদান্তবাগীশ, কালীবর : শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা সমালোচনা, পৃঃ ৩২ ; উদ্ধৃতি, পূর্বোক্ত বাংলা কবিতার নবজন্ম, পৃঃ ৩৩০।

৭৬। রবীন্দ্র জীবনী, প্র-খ, পৃঃ ২১০।

৭৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : হিন্দু বিবাহ, ভারতী আশ্বিন, ১২৯৪, পৃঃ ৩১৪-৪৮।

৭৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ : সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ৫ম সং ১৩৬২, স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ ২২।

৭৯। Pal, Bipin Chandra : Memories of My Life and Times, Ibid, Page 424.

৮০। পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ;
মহাভারত ১। ১৭৩। ১০

৮১। Natarajan, S. : A Century of Social Reform in India, Bombay 1959, Page 24.

৮২। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : (প্রবাসী বৈশাখ ১৩১১, পৃঃ ৫৩) 'বালবিধবা' প্রবন্ধ থেকে (১৯০১ এর লোক গণনা প্রতিবেদনমূলে) গৃহীত।

৮৩। Sen Gupta, Sanker : A study of women in Bengal, India Publications, Calcutta 1970, Page 175.

৮৪। Ibid, Page 182.

৮৫। কমিটির সদস্য : ইংরেজ—সি. পি. হব হাউস, এইচ. টি প্রিনসেপ ; বাঙালি—সত্যনারায়ণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, দিগম্বর মিত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
দ্র. ইণ্ডিয়া গেজেট সাপ্লিমেণ্ট মার্চ ৩০, ১৮৬৭।

৮৬। A study of women in Bengal, Ibid, Page 130.

৮৭। Report of the Calcutta University Commission, Ibid, Page 49.

৮৮। A study of women in Bengal, Ibid, Page 130.

৮৯। Adams Report on vernacular Education in Bengal and Bihar 1868, Page 131-32.

৯০। Mathur, Y. B. Womens Education in Indie, Delbi University Press, 1973, Page 24.

৯১। Ibid, Page 55-56.

৯২। গৌরী আইয়ুব : গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা, আনন্দবাজার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৭৮, পৃঃ ৬৫।

৯৩। পূর্বোক্ত, সাহিত্য সাধক চরিত মালা, পৃঃ ২৩।

৯৪। পূর্বোক্ত, বাংলার নব জাগরণের কথা, পৃঃ ১৫৭।

৯৫। দেবী চৌধুরাণী, সরলা : জীবনের ঝরাপাতা, সাহিত্য সংসদ ১৯৫৮, পৃঃ ২৮-২৯।

৯৬। রমাবাইয়ের বক্তৃতা : ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬, পৃঃ ১৬৪।

৯৭। তদেব, পৃঃ ৬১৫।

৯৮। পূর্বোক্ত সাহিত্যসাধক চরিতমালা, স্বর্ণ কুমারী, পৃঃ ১৮।

৯৯। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৫-৪৬।

১০০। স্ত্রী শিক্ষার হার :
বাংলা ৩·২%, বোম্বে ৫·৯%, মাদ্রাজ ৫·৭% যুক্তপ্রদেশ ১·২%।
দ্র. 'Some Problems of Women's Life in India, by Margaret E. Macdonald, Modern Review, July 1910, Page 124.

১০১। Modern Review. July 1910, Notes Girls Graduate, Page 108.

১০২। Sorokin, Pitirim A Social and Cultural Mobility, The Free Press of Geneoe, Illinois, 1957, Ch. VII, Page 133.

১০৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : কালান্তর, পৃঃ ৩।

১০৪। Sinha, Prodip Nineteenth Century Bengal, Ibid, Page 7.

১০৫। গৌরী আইয়ুব : গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়ে, আনন্দবাজার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৭৮, পৃঃ ৬৫।

ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউঁ-এর বাংলা ব্যাকরণ

আবদুর রহীম খোন্দকার

ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউঁ এর বাংলা ব্যাকরণের পর্তুগীজ নাম **Breve Compendio da Grammatica Bengala**; বাংলা অনুবাদে দাঁড়ায় 'বাংলা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার'। এটি তাঁর নামে প্রকাশিত **Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez** বা 'বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ ও বাগধারা' নামক অভিধান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়ে লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়।

ব্যাকরণটিকে আধুনিক পণ্ডিত সমাজে প্রথম পরিচিত করেন স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের প্রকাশিত **Linguistic Survey of India** গ্রন্থে তিনি এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, গ্রন্থের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা পর্তুগীজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ, পরবর্তী ২৫৯ পৃষ্ঠা বাংলা-পর্তুগীজ এবং অবশিষ্ট ২৭০ পৃষ্ঠা পর্তুগীজ-বাংলা শব্দ কোষ।[১]

এ বিষয়ে দ্বিতীয় এবং অধিক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত হচ্ছেন ক্যাপ্টেন হেনরি হোস্টেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে **Bengal Past and Present**

---

১. G. A. Grierson—Linguistic Survey of India Vol V, Part I Calcutta, 1903, Page 23.

পত্রিকায় লিখিত এক প্রবন্ধে[২] বাংলাদেশে পর্তুগীজ ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি বাংলা বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ম্যানো এল-এর ব্যাকরণ এবং অভিধানের উপর আলোকপাত করেন।[৩] তাঁর আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে স্পেনের Voladalld শহর থেকে ফাদার পারসো লোপেজ প্রেরিত ল্যাটিন ও পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত একটি ক্ষুদ্র বিবরণী। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ম্যাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত A. C. Burnell কৃত A Tentative list of Books and Mss. relating the History of the Portuguese in India Proper নামক তালিকা গ্রন্থেও তিনি ম্যানোএল-এর ব্যাকরণ অভিধান এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের উল্লেখ পেয়েছেন।

ফাদার হোস্টেনের ধারণা হয়েছিল যে, তিনটি বইই মুদ্রিত। যাই হোক বইগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহের তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কলকাতায় অবস্থিত বেলজিয়ামের কনসালের সহায়তায় তিনি এভোরার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, এভোরা গ্রন্থাগারে এই নামের কোন মুদ্রিত গ্রন্থ নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে এইচ, বিভারিজ তাঁকে জানান যে, সেখানেও এই জাতীয় কোন বই নাই। পরে ফ্রিয়ারসন সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি ব্রিটিশ

---

২. Father H. Hosten—The Three First Type-printed Bengali Books—Bengal Past and Present, Vol. IX, Calcutta, 1914, pp. 40-63.

৩. অন্য দুটি বই হচ্ছে দোম এ্যান্তোনিও-র 'Diologo' এবং ম্যানোএল দা আসুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। পর্তুগালের এভোরা নগরের গ্রন্থাগারে দোম এ্যান্তোনিও-র 'Diologo'-র হস্তলিখিত পুঁথি সংরক্ষিত আছে। রোমান হরফে লিখিত এই গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৮৫ পৃষ্ঠা ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন নকল করে আনেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে কলকাতা

মিউজিয়ামে Vocabu'ario Em Idioma Bengalla E Portuguez গ্রন্থের দুইটি প্রতিলিপির অস্তিত্বের কথা তাঁকে জানান। তাঁরই মারফত ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচ্য গ্রন্থাগারের রক্ষক প্রফেসর এল্, বারনেট ফাদার হোস্টেনকে এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নাম পৃষ্ঠা এবং ৫৩২-৫৩৩ সংখ্যক পৃষ্ঠার আলোক চিত্র পাঠান।[৪]

এ-সম্পর্কে পরবর্তী গবেষক প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভাষাতত্ত্বে গবেষণার জন্য তিনি ইংলণ্ডে যান। লণ্ডনে পৌঁছুবার অনতিবিলম্বে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থাগারে বইটির খোঁজ করেন। ধন্যবাদের সেখানে তিনি বইটির দুইখানা প্রতিলিপি দেখতে পান। একখানি খণ্ডিত, অন্যখানি পূর্ণাঙ্গ।[৫] দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বইটির ব্যাকরণ অংশ সম্পূর্ণ নকল করেন। শব্দকোষের বাংলা পর্তুগীজ অংশেরও কয়েক পৃষ্ঠার নকল নেন। তাঁর মতে এই অনুলিখন ছিল সঠিক এবং নির্ভুল। কোনো মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠার ক্রম এবং অক্ষরের ছাঁদ পর্যন্ত তিনি অবিকৃত রাখার চেষ্টা করেছেন এবং অনুলিখনের পর মূলের সঙ্গে ভাল করে মিলিয়ে নিয়েছেন

কিন্তু পর্তুগীজ জানতেন না বলে ডঃ চট্টোপাধ্যায় দেশে ফিরে অনুলিপিটি যত্নের সঙ্গে রেখে দেন। কিছুকাল পরে শ্রীযোগেশচন্দ্র কুমার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সজনীকান্ত দাস এবং ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. Father H. Hosten—The Three First Type-Printed Bengali Books, Second article, Bengal Past and Present, Vol. XIII, Calcutta, 1916.

৫. S. K. Chatterji and P. Sen—Manoel Da Assumpcam's Bengali Grammar, Calcutta, 1931, পৃঃ ১।

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

নামক একজন গোয়ানীস চিকিৎসক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্তুগীজ ভাষায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক প্রিয় রঞ্জন সেন তাঁর নিকট পর্তুগীজ ভাষা অধ্যয়ন করেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে প্রিয় রঞ্জন সেন বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তিনি নিজে এর ভূমিকা লিখেন। এইভাবে উভয়ের যুগ্ম সম্পাদনায় গ্রন্থটি Manoel Da Assumpcam's Bengali Grammar নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৬] গ্রন্থটিতে মূল পর্তুগীজ বাম পৃষ্ঠায় এবং অনুবাদ অংশ ডান পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে, যাতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ অনায়াসে মিলিয়ে পড়া যায়। যেহেতু মূলের সঙ্গে অনুবাদেরও মুদ্রণ-ক্রম রক্ষিত হয়েছে, সেহেতু এই সম্পাদিত গ্রন্থটির ব্যাকরণ অংশেরও সমাপ্তি ঘটেছে চল্লিশ পৃষ্ঠায়। ১৩৭ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থের বাকি অংশ বাংলা-পর্তুগীজ শব্দ সংগ্রহ।

মূল গ্রন্থকার নির্ণয়

গ্রিয়ার্সন, ফাদার হোসেটন এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—এই তিনজন গবেষকের মধ্যে একমাত্র ফাদার হোসেটনই ম্যানোএল দা আসুম্পসাঁউ এই ব্যাকরণের প্রকৃত রচয়িতা কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে অগাষ্টিনিয়ান ধর্মপ্রচারকদের বাংলাদেশে আগমনের অনেক আগে জেসুইট ধর্মপ্রচারকগণ বাংলা ভাষায় শব্দ কোষ, ব্যাকরণ এবং প্রার্থনামূলক বই লেখা শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুআরিতে লেখা ফাদার মার্কোস এ্যাণ্টোনিও মানতুচ্চির চিঠির উল্লেখ করেছেন। চিঠিখানা ফরিদপুর থেকে গোয়ার ধর্মীয় প্রধানের নিকট লিখিত হয়েছিল। পত্রখানা নিম্নরূপ :

---

৬. S. K. Chatterji and P. Sen—পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৶।

> "The Fathers have not failed in their duty ; they have learned the language well, have composed vocabularies, a grammar, a confessionary and prayers ; they have translated the Christian doctrine etc. nothing of which existed until now."[৭]

এই পত্রের ভিত্তিতে ফাদার হোস্টেন মনে করেন প্রথম ব্যাকরণ-এর রচিত নয়। উপসংহারে তিনি বলেছেন,

> "Father Santucci's reference to vocabulary and a grammar, gives us, perhaps, a clue to the authorship of our No. 3 above."[৮]

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মানোএল-কে এই ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রণেতারূপে স্বীকার করেন। তিনি বলেছেন,—

> বাংলাদেশে পর্তুগীজ খ্রীস্টানদের এক বড় কেন্দ্র নাগরী বা ভাওয়ালে বসিয়া ১৭৩৪ সালে পাদ্রি Manoel da Assumpcam বা Assumpcao নামু এন-দা-আসুম্পসাউ এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধানখানি লেখেন "[৯]

কেবল তাই নয়, এই বই-এর ভূমিকায় গ্রন্থকার হিসেবে তিনি মানোএলের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। যেমন,—

---

৭. Father H. Hosten—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬। এই চিঠিটি সান্তুচ্চির লেখা অন্য তিন খানা চিঠির সঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে

৮. Father H Hosten—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬।

৯. S, K. Chatterji and P. Sen—প্রাগুক্ত পৃঃ ৮০।

"পাদ্রি মানুএল, পরবর্তী যুগের কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতিগণের পক্ষে এক প্রধান পথিকৃৎ। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের পত্তন যাঁহাদের দ্বারা হইয়াছিল, তাঁহাদের একজন হিসাবে, এবং প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণের রচয়িতা হিসাবে, পাদ্রি মানুএল প্রত্যেক বঙ্গভাষী এবং বাঙ্গালী সাহিত্যানুরাগীর সম্মানের পাত্র এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনী আমাদের কৌতূহলের বিষয় হওয়া উচিত।"[১০]

এই উক্তির পর আর কোন সন্দেহ থাকে না যে, সুনীতি বাবু ম্যানোএল দা আসসুম্পসাঁও কে এই গ্রন্থের মূল রচয়িতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন

কিন্তু ব্যাকরণটিকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করার পর আমাদের ধারণা হয়েছে যে, ম্যানোএল এই গ্রন্থের প্রকৃত লেখক নন, তিনি এর সম্পাদক।

যে সব কারণে এই ব্যাকরণের প্রকৃত রচয়িতা সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ফেলা যায়

(ক) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ

(খ) ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ

(ক) আভ্যন্তরীণ প্রমাণ

উইলিয়ম মার্শডেন কর্তৃক সংগৃহীত একটি পর্তুগীজ-বাংলা অভিধানের পাণ্ডুলিপি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ওরিয়েণ্টাল বিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।[১১] ম্যানোএল-এর মুদ্রিত অভিধানের শব্দগুলি এই

১০. S. K. Chatterji and P. Sen—পূর্বোক্ত পৃঃ ৮০।

১১. A Vocabulary Portuguez Bengali Ms. No. 11963.

অভিধানের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, মুদ্রিত অভিধানের শব্দগুলি এই পাণ্ডুলিপি থেকে বাছাই করা হয়েছে। এতে মুদ্রিত অভিধানের রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। আবার ব্যাকরণটির মধ্যে নানা প্রকার অসংগতি দেখে এই সংশয় আরো ঘনীভূত হয়।

ব্যাকরণটি মোটামুটি ৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত : রূপতত্ত্ব অধ্যায় এবং পদক্রম অধ্যায়। মনে হয়, রূপতাত্ত্বিক অংশ মূলে যে ভাবে রচিত হয়েছিল সে ভাবেই মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু পদক্রম অংশ সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। কেননা এই অংশে উদাহরণের জন্য ব্যবহৃত কতকগুলি বাক্যের ক্রিয়ারূপ রূপতত্ত্ব অধ্যায়ে পাওয়া যায় না।[১২] দ্বিতীয়তঃ একই সূত্র এই অংশে দু বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।[১৩]

মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এই ব্যাকরণে তিন ধরণের শব্দ দেখা যায় :

(১) আঞ্চলিক বাক্য সমূহ এগুলিতে পদক্রম স্বাভাবিক, কিন্তু শব্দ নির্বাচন পূর্ববঙ্গীয়।

(২) এই বাক্যগুলি রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এইগুলিতে পদক্রম অস্বাভাবিক এবং অনেকটা ইউরোপীয় ভাষা থেকে অনুবাদের মত।

---

১২. রূপতত্ত্ব অধ্যায়ে 'করিয়াছি না' ক্রিয়ারূপের উদাহরণ নাই, কিন্তু পদক্রম অধ্যায়ে এটি দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য—ম্যানোএল দা আসসুম্পসাঁও—Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez, Lisboa 1743, p. 37.

১৩. ২৬ অনুচ্ছেদ ৪৮ এবং ৪৯ অনুচ্ছেদে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। দ্রষ্টব্য পূর্বোক্ত পৃঃ ৩০ ও ৩৮।

(৩) এই বাক্যগুলিতে ব্যাকরণগত সামান্য ত্রুটি থাকলেও পদক্রম মোটামুটি স্বাভাবিক, কিন্তু শব্দ নির্বাচন সংস্কৃত ঘেঁষা।

এই তিন রকমের বাক্য দেখে মনে হয় সম্ভবতঃ এগুলি তিন পৃথক ব্যক্তির রচিত। এক, একজন অজ্ঞাতনামা পূর্ববঙ্গীয় লোক, সম্ভবতঃ ম্যানোএলের সহকারী। দুই, একজন ইউরোপীয়, সম্ভবতঃ ম্যানোএল নিজে এবং তিন. একজন অজ্ঞাতনামা তৃতীয় ব্যক্তি, সম্ভবতঃ মাস্তাচ্চি কিংবা তাঁর সহকর্মীদের কেউ।

(২) ম্যানোএলের পূর্ববঙ্গীয় সহকারী রচিত প্রথম প্রকারের বাক্যগুলি খুব সহজেই চেনা যায়। এগুলিতে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার ছাপ আছে এবং এইগুলি মূলতঃ সাংসারিক এবং ঘরোয়া বিষয় সংক্রান্ত। নিম্নে এই ধরণের বাক্যের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

১। যাও গিয়া, আমার ছোকরা ডাকিয়া আন। (পৃ ৩৭)
২। ইছা ত নাই খাইবার। (পৃ ৩৭)
৩। এই কামো আমি ত করিয়াছি না, তুমিও করিলা না। (পৃ. ৩৭)
৪। আমার গাঁও ঢাকার নরিক। (পৃ. ৩৫)
৫। আমি বড় গরীব। (পৃ. ৩৮)
৬। পেক্র আমার সঙ্গে ঢাকাতে গিয়াছে। (পৃ. ৩৫)
৭। ঢাকাতে আমার বাপ মরিয়াছে। (পৃ. ৩১)
৮। কোন জন আইয়াছে? আমার বাপ (পৃ. ২৭)
৯। ঠাকুর গোলামরে কহিলেন; তুনি খানা তৈয়ার করিলি? গোলাম কহিল; না ঠাকুর, পারিলাও না, তুমি মাফ করিবা। (পৃ. ২৩)
১০। আমার কাছে আইস। (পৃ. ৩৫)
১১। খানা আন গিয়া। (পৃ. ৩৭)

১২। উগুলিতে থাকিয়া মুরশিদাবাদ দিয়া গিয়াছিলাম চাকাতে।
(পৃ. ৩১)

১৩। কোন থাকিয়া আইস ?

(২) অবশিষ্ট বাক্যগুলির লেখক নির্ণয় করা কঠিন। তবে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ এগুলি সাস্তচ্চি কিংবা তাঁর সহকর্মীদের রচিত। ভবিষ্যৎবাচক ক্রিয়াপদে 'ইঃমু' বিভক্তি যোগ, যেমন 'করিমু' 'খুঝিমু' ইত্যাদি, খ্রীস্টান অর্থে 'খ্রস্তাউ' শব্দের প্রয়োগ, (ম্যানোএল সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে 'খ্রীস্তাউ'-এর পরিবর্তে 'রোমানাপন্থী' শব্দ প্রয়োগ করেন।) এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট শৈলীগত বিশিষ্টতা, প্রথমতঃ বহুবচন বাচক 'সকল' শব্দের ব্যবহার, যেমন, 'লোকসকল' 'গুণসকল', ভেদসকল দ্বিতীয়তঃ, তৎসম শব্দের প্রাচুর্য। তৎসম শব্দবহুল বাক্যগুলি রচনায় হয়ত তিনি পোর্তু এ্যাস্তোনিও-র সহায়তা পেয়ে থাকতে পারেন। এইসব বিষয় বিবেচনা করে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সাস্তচ্চি কর্তৃক রচিত বলে মনে করা যায়।

ভাল কাজিঅ করে তাহারে পুরভু ভোগাভোগ দে এন।
(পৃ. ২১)

২। যে জনে পরুর মাংস খায়, সে হিন্দু নহে। (পৃ. ২২)

৩। যে জন ভাল হএ, ভাল কাজিঅ করিয়া তে জন স্বর্গে যায়।
(পৃ. ২২)

৪। যদি তোমরা সৎ কাজিঅ করিতে চাও না, আমিও করিমু, বা করিব। (পৃ. ২২)

৫। সেতো পরমেশ্বর করিলেন তাহা নর লোক করিতে না পারে। (পৃ. ২৪)

৬। আশা, আশা, করুণা পরিণামের পথ সকল। (পৃ. ২৪)

৭। বিনে আশা, আশা, করুণায় মুক্তি নাহি। (পৃ. ২৪)

৮। শুনিলাম, যে ইন্দুস্তানী কালা লোক সকল। (পৃ. ২৫)

৯। যে জনে ভাল কাজিত্ব করে, সে পরমেশ্বরের কৃপাতে সাধু হইতে পারে। (পৃ. ২৫)

১০। প্রভু অবিনাশী, স্বয়ং, নির্বিকার, করুণাসিন্ধু, তিনি আমারদিগের সৃষ্টিকর্তা হয়েন, বৈভোগের নাথ, পতিত পাবন, সর্বজ্ঞান তিনি। (পৃ. ২৫)

('বৈভোগের নাথ' এবং 'সর্বজ্ঞান তিনি' এই দুই বাক্যাংশের অনুবাদ ম্যানোএল করেন নি। এতে বোঝা যায় যে, বাক্যটি ম্যানোএলের রচিত নয়।)

১১। প্রভু করুণার সিন্ধুর কারণ ভিখ মাগিতে উচিত। পৃ. ২৬)

১২। পরমেশ্বরের কৃপাতে খ্রীস্টর শাস্ত্র পাইয়াছি। (পৃ. ২৭)

১৩। করুণাগুণ আশার বড়। (পৃ. ২৮)

১৪। আশা ছাড়াইয়া করুণা বড়। (পৃ. ২৮)

১৫। পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে পালে, সে তাহান কৃপা পাইবে। (পৃ. ২৯)

১৬। পরমেশ্বরের দয়ার কারণ ভিখ মাগিতে উচিত খ্রীস্তা ও সকলের কাছে। (পৃ. ৩০)

১৭। এক ছুরি দিয়া এক মূর্তি কাটের করিয়াছি। (পৃ. ৩১)

১৮। খ্রীস্তা উরা সৎকার্য করিয়া সাধু হইতে পারে। (পৃ. ৩২)

১৯। যীশুখ্রীস্ট ক্রুশের উপরে মরিয়াছেন নর উদ্ধার করিতে। (পৃ. ৩২)

২০। আত্মার ভেদ সকল বড় গহীন ; তথাচ আমারে বুঝাও তুমি, তবে বুঝিনু, বা বুঝিব। (পৃ. ৩৩)

২১। প্রথম মারিয়া কৃপা এ পুথিৎ। (পৃ. ৩৬)

(ম্যানোএল-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এ উদ্ধৃত 'আভে মারিয়া' এবং অন্যান্য প্রার্থনা খুব সম্ভবতঃ দোম এ্যান্তোনিওর রচিত এ-ব্যাপারে হয়ত তিনি সাস্তচি এবং তাঁর সহকর্মীদের

সাহায্য পেয়েছিলেন। এই বাক্যটি 'যাতে মারিয়া' প্রার্থনার একটি চরণ।[১৪])

(৩) নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে ম্যানো এল-এর রচিত বলে করা হয়েছে তিনটি কারণে। প্রথমতঃ পদক্রমের অস্বাভাবিকতা, দ্বিতীয়তঃ 'পরমেশ্বরের' পরিবর্তে 'খোদা' শব্দের ব্যবহার। এটি ঘটেছে সম্ভবতঃ তাঁর পূর্ববঙ্গীয় সহকারীর প্রভাবে, কিংবা তাঁর গীর্জার উপাসক মণ্ডলীতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জন্য, কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফারসী ভাষার ব্যাপক প্রভাব বশতঃ। তৃতীয়তঃ 'খ্রীষ্টান'-এর স্থলে 'রোমান পন্থী' শব্দের প্রয়োগ। ম্যানো এল-এর সময়ে প্রটেস্টাণ্ট পর্তুগীজ, ইংরেজ বণিক এবং ধর্মযাজকগণের আগমন ঘটে। তাঁদের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিকদের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য সম্ভবতঃ ম্যানোএল 'রোমান পন্থী' শব্দটি ব্যবহার করেন।

১। খোদার কাজিয় করিতে ভাল। (পৃ. ২৯)
২। রোমান পন্থীয়ে উচিত নহে অপবাদ করিতে তবে উচিত সুকাজিয় করিতে। (পৃ. ২৭)
৩। উচিত নহে যে রোমান পন্থী অপবাদ করে। (পৃ. ২৭)

দুই স্থানে ম্যানো এল ব্যাকরণে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বাক্যালংকারের প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে 'চল যাই কে' 'চলি, যাই' রূপে সংশোধন করেছেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

---

১৪. ফাদার এাগ্রোসিও-র বিবরণে আছে "They begin to sing some canticles which they have, of the Mysteries of the Rosary. Dom Antonio composed them." দ্রষ্টব্য—J J. A Campos—History of the Portuguese in Bengal, Calcutta, 1919, pp. 267-268.

> "বাংলা ভাষায় কতকগুলি শব্দ আছে যেগুলি কেবলমাত্র সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেগুলি স্বয়ং কোন অর্থ সূচিত করে না। যেমন 'গিয়া' শব্দটি সব সময় গতিবাচক ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যেমন এই বাক্যে, 'এস, চল যাই,' তারা বলে 'চল যাই গিয়া'। অর্থ পরিবর্তন না করে বলা যায় 'চলি, যাই'।"[১৫]

মানোএল এল এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে, 'গিয়া' শব্দটি বাক্যালংকার রূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই শব্দটিকে বাক্য থেকে বাদ দিলেও বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। বলা বাহুল্য সূত্রটি ঠিক, কিন্তু 'চলি, যাই' বাক্যটি শুদ্ধ নয়। তাই উদাহরণ থেকে বাংলা ভাষায় মানোএল এল-এর পারদর্শিতা সম্পর্কে সংশয় হয়।

অন্য জায়গায় তিনি 'আভে মারিয়া' প্রার্থনার বাংলা অনুবাদে এক কারকের পরিবর্তে অন্য কারক ব্যবহারের কথা বলেছেন। সূত্রটি নিম্নরূপ :

> "উপস্থিতি বাচক বিশেষ্য 'সাক্ষাৎ', 'উজুর' এবং পূর্ববস্তু বাচক 'পুথিৎ' এবং এই জাতীয় অন্যান্য শব্দ সম্বন্ধ পদের অপেক্ষা রাখে। ক্রিয়া বিশেষণ 'ঠায়' বা এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তাতেও সম্বন্ধ পদ লাগে ; যেমন আমার সম্মুখে, তারা বলে 'আমার সাক্ষাতে বা উজুরে' 'কোথায়' এই প্রশ্নের উত্তরে তারা অধিকরণে ব্যবহার করে 'সাক্ষাতে' ও 'উজুরে' এবং 'আমার' পদকে ব্যবহার করে 'সাক্ষাতে'র সম্বন্ধ রূপে। আমারি সম্মুখে, 'আমার ঠায়' এরকমও বলা যায় এটিই সবচেয়ে রীতিসিদ্ধ। 'আভে মারিয়া'

---

১৫. মানোএল দা আস্‌সুম্পসাওঁ—Vocabolario Em Idioma Bengalla E Portuguez, Lisboa, 1743. pp. 36-37.

প্রার্থনার বাংলায় 'পূর্ণিৎ'-এর উদাহরণ আছে : যেমন, 'প্রণাম মাত্রিয়া কৃপায় পূর্ণিৎ'। উদাহরণ হল 'পূর্ণিৎ'-এর অধিকরণ 'কৃপায়'। আমরা উপরে বলেছি 'পূর্ণিৎ'-এর সম্বন্ধ পদ দরকার হয় ; কিন্তু তা ভুল, কারণ এর অধিকরণ লাগে, যেমন আমরা উদাহরণটিতে দেখি যদিও অনেক লোক এ-কে সম্বন্ধ পদের সঙ্গে ব্যবহার করে।"[১৬]

এখানে ম্যানোএল-এর যে বক্তব্য তাতে মনে হয় এটি সূত্রকারের উক্তি নয়, সম্পাদকের মন্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৬ নং সূত্র ৪৮ এবং ৪৯ অনুচ্ছেদে পুনর্বিন্যস্ত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য অনুচ্ছেদগুলি উদ্ধৃত করছি।

> ২৬। কর্ম কর্তৃবাচ্যীয় ক্রিয়াপদ সমূহ ও বিশেষ এবং অনুক্ত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য যোগ করে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়। তার ফলে তারা অত্যন্ত বিনম্র ভাবে কথা বলে, কারণ অন্য উপায়ে তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন 'গলানো' তারা বলে গলে যাওয়া, 'ঘিলা হইতে', নষ্ট হওয়া, তারা বলে 'নষ্ট হইতে'।[১৭]

> ৪৮। যেহেতু বাংলা ভাষা মূল ভাষা নয়, বরং হিন্দুস্তানী ও সংস্কৃতের মিশ্রণ, তাই এটি নিয়মিত নয় এবং সর্বতোভাবে ল্যাটিনের অনুরূপ নয়। * এই কারণে এর অনেক যথাযথ ক্রিয়াপদের অভাব আছে ; যেগুলোর পরিবর্তে দেশীয়

---

১৬. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাওঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

১৭. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাওঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।

লোকেরা শব্দ যোগ করে মনের ভাব প্রকাশ করে। যেমন সন্দেহ করা স্থানে তারা বলে সন্দেহ করিতে, 'সন্দে করিতে', ধ্বংস করা স্থানে তারা বলে 'নষ্ট করিতে'।[১৮]

৪৯। কর্ম কর্তৃবাচ্যীয় প্রায় সকল ক্রিয়াপদেরও অভাব আছে; এবং বস্তুবাচক শব্দের সঙ্গে অসংগত ক্রিয়াপদ যোগ করে তারা এই অভাব পূরণ করে। এর ফলে তারা অত্যন্ত বিসদৃশ ভাবে কথা বলে। কারণ তারা অন্য কোন উপায়ে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। যেমন গলানো, তারা বলে গলা হওয়া, 'ঘিলা হইতে', নষ্ট হওয়া স্থানে তারা বলে 'নষ্ট হইতে' ইত্যাদি।[১৯]

এই সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের ক্ষুদ্র পরিসরে একই সূত্রের এ রকম পুনরাবৃত্তি বিস্ময়কর। এমন হতে পারে যে, ২৬ নং সূত্রে বাংলা ক্রিয়ারূপের অসম্পূর্ণতা সান্তুচির নিকট প্রথম ধরা পড়ে ম্যানো এল এটিকে বাংলা ভাষার দুর্বলতা এবং বৈশিষ্ট্যগত ত্রুটি হিসেবে পরবর্তী দুই অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান।

(খ) ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ

বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভুষণার রাজপুত্র দোম এ্যান্তোনিও ১৬৬৩-৬৪ খ্রীস্টাব্দে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত হয়ে আরাকানে নীত হন। সেখানে ম্যানো এল দা রোজারিও নামক এক পর্তুগীজ পাদ্রি দোম এ্যান্তোনিওকে তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তিনি মুক্তিলাভ করে

---

১৮. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাওঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

১৯. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাওঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮।

দেশে ফিরে আসেন। এর পর ভূষণায় ধর্মকেন্দ্র স্থাপন করে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।[২০] ধর্মপ্রচারে সহায়তার জন্য দোম এ্যান্তোনিও গোয়ার পর্তুগীজ ধর্মকেন্দ্র থেকে জেসুইট পাদ্রিদের ডেকে পাঠান। তাঁর অনুরোধে মার্কোস এ্যান্তোনিও সান্তুচ্চি ম্যানো এল সারাইভা এবং ইগনেসিও গোনেজ ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে ভূষণায় আসেন। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছর তাঁরা এখানে অবস্থান করেন।[২১] এ দেশে অবস্থানকালে তাঁরা বাংলা শেখেন এবং বাংলায় প্রার্থনা পুস্তক, অভিধান এবং ব্যাকরণ রচনা করেন। এ সম্পর্কে সান্তুচ্চি প্রেরিত চিঠির প্রয়োজনীয় অংশ আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। গোয়ায় প্রত্যাবর্তনকালে এই গ্রন্থগুলির পাণ্ডুলিপি তাঁরা ভূষণায় রেখে যান। দোম এ্যান্তোনিওর মৃত্যুর পর সেখানকার খ্রীস্টানগণ স্থানীয় জমিদারদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ফলে ১৬৯৩ খ্রীস্টাব্দে দোম এ্যান্তোনিও প্রতিষ্ঠিত টলেন্টিনোর সেন্ট নিকোলাস মিসন ভূষণা থেকে ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরীতে স্থানান্তরিত হয়।[২২] অনুমান করা অসংগত নয় যে, সান্তুচ্চির ব্যাকরণ এবং

---

২০. ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে প্রেরিত ফাদার এ্যান্থোসিওর বিবরণ, দ্রষ্টব্য— H. Hosten-Bengal Past and Present, Vol IX, 1914 p. 44. সমসাময়িক মুসলিম ঐতিহাসিকগণও এই সময়ে ভূষণায় পর্তুগীজ আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য : Jadu Nath Sarkar— Shaista Khan in Bengal—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II Calcutta, 1906, p. 258 and The Feringi Pirates of Chittagong-Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. III, Calcutta, 1907, P. 424.

২১. L. Besse and H. Hosten—List of Portuguese Jesuit Missionaries in Bengal and Burma (1576-1742); Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, Calcutta, 1911, p. 35.

২২. L. Besse and H. Hosten, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

অভিধানের পাণ্ডুলিপিও সেই সঙ্গে ভাওয়ালের নাগরী মিশনে আসে। ম্যানো এল 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সহ এই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে মুদ্রণের জন্য ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে লিসবনে পাঠান।

ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণে এই ধারণা আরো দৃঢ়বদ্ধ হয়। ব্যাকরণে আঞ্চলিক ক্রিয়ারূপের উদাহরণ হিসেবে যে ক্রিয়াপদ উল্লিখিত হয়েছে তা একমাত্র ফরিদপুর জেলাতেই প্রচলিত আছে। গ্রিয়ারসন তাঁর Linguistic Survey of India গ্রন্থে ফরিদপুরের উপভাষা সম্পর্কে বলেছেন :

"Dialects.....of Faridpur.....form a connecting link between the standard language of Central Bengal and the extreme type which we find in Dacca and Bakergange."[২৩]

ভাষার নমুনা হিসেবে তিনি যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাতে ক্রিয়ারূপে 'যাইমু' আছে।[২৪] এটি রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে ম্যানো এল-এর ব্যাকরণের 'করিমু' ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্কিত।[২৫] উভয় স্থানে ক্রিয়াপদ দুইটি উত্তম পুরুষে সামান্য ভবিষ্যৎরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ সব কারণে মনে হয় ভুষণা থেকে প্রাপ্ত সাতটি রচিত ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপিটি ম্যানো এল সংশোধন এবং পরিবর্ধন করে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তাঁকে ব্যাকরণের রচয়িতা না বলে সম্পাদকরূপে অভিহিত করা অধিকতর সংগত হবে।

---

২৩. G. A Grierson—Lioguistic Survey of India, Vol. V, Part I Calcutta, 1903, pp. 278-279.

২৪. G. A. Grierson—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৯।

২৫. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাও—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮ এবং ২২; অন্য উদাহরণ 'হইমু' পৃঃ ১৯ এবং 'বুঝিমু' পৃঃ ৩৩।

ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

পর্তুগীজ ধর্ম প্রচারকগণকে বাংলা শেখানোর জন্যই ব্যাকরণ খানা রচিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এই ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁদের সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।[২৫] কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের উপর বেশী জোর দেওয়া হলেও[২৬] সাহিত্যিক ভাষাকেও অবহেলা করা হয়নি।[২৮]

এই গ্রন্থের লেখকের সামনে বাংলা ব্যাকরণের কোন পূর্ব নমুনা ছিল না। সুতরাং তাঁকে পরিচিত পথ ধরেই অগ্রসর হতে হয়েছে। এজন্য ল্যাটিন ব্যাকরণের কাঠামোকে তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। এটা স্পষ্ট বোঝা যায় ল্যাটিন থেকে সরাসরি নজির নির্দেশে এবং ল্যাটিন ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারে।[২৯] ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত মিল তিনি দেখেছেন এবং এগুলির খুঁটিনাটি সাদৃশ্য নির্দেশও তিনি করেছেন। যেমন,

---

২৬. নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে এটা বোঝা যায়—"আমরা কতকগুলি স্থূল নিয়ম দিচ্ছি যাতে এই ভাষার মূল সূত্র শিখতে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা সহজেই কিয়ৎ পরিমাণে আলোকপ্রাপ্ত হবেন।" পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

২৭. নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে এটা বোঝা যায়, —"চলিত বাংলায় বহু বচনের প্রয়োগ নাই।" পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

২৮. নিম্নের উদ্ধৃতি থেকে এটা বোঝা যায়,—"মার্জিত বাংলায় যা ব্রাহ্মণরা বলেন" পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

২৯. যেমন, "মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে লাটিনদের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত।" পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১। "লাটিনেরা বলে Charitus Virtus Spe major est." পৃঃ ২৮। "লাটিনেরা বলে Audivi, Indiarum gentem esse nigram", পৃঃ ২৫।

"প্রাচীন ল্যাটিনদের মত বাঙালীরাও পুরুষ বাচক সর্বনামের সম্বন্ধ পদ ব্যবহার করেন।"[৩০]

"যখন দুইটি ক্রিয়াপদ একত্রে আসে তখন দ্বিতীয়টি তার পূর্বে যে এই ক্রিয়া বিশেষণ গ্রহণ করে, এটা ল্যাটিনের Quod-এর অনুরূপ।"[৩১]

"সংযোজক সর্বনাম 'যে' ল্যাটিনের Qui, Que এবং Quod-এর অনুরূপ।"[৩২]

"অস্তিত্ব বাচক ক্রিয়াপদ 'হই' বা 'নহি' 'উচিত' শব্দের সঙ্গে একত্রে যুক্ত হলে ল্যাটিন licet শব্দের মত বুঝায়।"[৩৩]

ব্যাকরণ থেকে এরকম অজস্র উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে বাংলা ভাষার সঙ্গে ল্যাটিনের মিল দেখতে পাননি, সেখানে তিনি বাংলা ভাষাকে নিয়ম বহির্ভূত এবং বিশ্র ভাষা বলে নিন্দা করেছেন।[৩৪]

ব্যাকরণটি রূপতত্ত্ব ও পদক্রম দুই অংশে বিভক্ত। এতে ধ্বনিতত্ত্বের কোন স্বতন্ত্র অংশ নাই। তবে পদক্রম অধ্যায়ের শেষ তিন অনুচ্ছেদে এবং 'রূপায়ন শাস্ত্রের অর্থভেদে'র প্রস্তাবনায় বাংলা ভাষার উচ্চারণ, বর্ণমালা এবং ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে ম্যানো এল-এর মন্তব্য আছে। এই মন্তব্যকে আমরা ম্যানো এল-এর তথা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বগত বক্তব্যরূপে গণ্য করতে পারি।

---

৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।
৩১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪-২৫।
৩২. পূর্বোক্ত পৃঃ ২৫।
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।
৩৪. "যেহেতু বাংলা ভাষা মূল নয়, বরং হিন্দুস্তানী ও সংস্কৃতের মিশ্রণ, তাই ইহা নিয়মিত নয় এবং সম্পূর্ণরূপে ল্যাটিনের অনুগত নয়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

রোমান বর্ণান্তর (transcription) এবং বাংলা উচ্চারণ সম্বন্ধে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' ম্যানো এল-এর মন্তব্য নিম্নরূপ :

"পাঠকের প্রতি উপদেশ

প্রিয় বন্ধু আমি বিশ্বাস করি এই বইটি পড়ার সময় অনেকগুলি দ্বিত্ব বর্ণ দেখে আপনি বিভ্রান্ত হবেন। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিব যে এই দ্বিত্ব বর্ণগুলি বাংলা ভাষার একক বর্ণ। এবং যাতে আপনি এইগুলি বুঝতে পারেন সে জন্য আমি বাংলা বর্ণমালাগুলি দিব, যেন আপনি দেখেন এবং উচ্চারণের শক্তি বুঝতে পারেন। Anzi co, qho, go, gho, hua, so, sho, zo, zho, nio, tto, ttho, ddo, ddho, no, to, tho, do, dho, no, po, pho, bo, bho, mo, zo, ro, l , to, xo, xo, xo, ho, quio.

স্বরবর্ণ

a, a, i, i, u, u, ri, ri, li, li, e, oi, o, on, ong, o.

আরো লক্ষ্য করবেন যে, যেখানে আমি দ্বিত্ব বর্ণ লিখেছি সেখানে জিহ্বা প্রতিবেষ্টিত হয়ে উচ্চারিত হয়; যেখানে আমি একক বর্ণের পরে H লিখেছি, সেখানে ঐগুলি বুক থেকে শ্বাস প্রবাহের দ্বারা উচ্চারিত হয়; যেখানে আমি দ্বিত্ব বর্ণের পরে H লিখেছি, সেখানে ঐগুলি জিহ্বা মুচড়িয়ে উচ্চারিত হয়। অন্যগুলি ব্যবহারের সাহায্যে শিখবেন।"[৩৫] ব্যাকরণের শেষ তিন অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন :

---

৩৫. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাও—কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, লিসবন, ১৭৪৩, পৃঃ III-IV, (অনুবাদ)।

৫১। "বাংলা ভাষার বাগধ্বনি সমূহ যতভাবে উচ্চারিত হয় ততগুলি বর্ণ নিয়ে এই ভাষার বর্ণমালা গঠিত। পর্তুগীজ বর্ণমালা দিয়ে এগুলি নিখুঁত ভাবে লেখা যাবে না। সুতরাং এই বর্ণমালাগুলি লিখতে শেখা খুবই সংগত হবে, কেননা তাতে এই ভাষা সঠিকভাবে বোঝা যাবে।"[৩৬]

৫২। এ দেশের অধিবাসীদের লিখন রীতিতে অনেক পার্থক্য আছে। কারণ কেউ কতকগুলি বর্ণ ব্যবহার করে, অন্যেরা অন্য রকম ব্যবহার করে এবং যে বর্ণগুলি অন্য বর্ণের সঙ্গে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এমন কতিপয় বর্ণের উপযুক্ততা নির্ণয় অসম্ভব হয়েছে। কতকগুলি বাগধ্বনির উচ্চারণের প্রায় দুর্নির্ণেয় তারতম্য দ্বারা এইগুলির পার্থক্য দেখা যায়।

৫৩। সর্বশেষে ব্রাহ্মণরা যাঁরা এই বর্ণমালার উদ্ভাবক বলে দাবি করেন, তাঁরা মূল নীতিতে ভুল করেছিলেন, এবং অক্ষর (syllable) গঠন না করে একটি মাত্র বর্ণ ব্যবহার করে তাঁরা বর্ণমালাকে বিকৃত করতে সমর্থ হন। যখন তাঁরা Quanto লিখতে চান তখন তাঁরা ল্যাটিনদের মত সবগুলি হরফ লিখেন না, Quanto, Coio, কিন্তু মাত্র দুইটি বর্ণে তাঁরা দুইটি অক্ষর গঠন করলেন 'ক'-'ত'। Nove-র জন্য তাঁরা লিখলেন 'নৌ' ইত্যাদি। এই অভ্যাস

---

৩৬. রোমান হরফে বাংলা লেখা যে সম্ভব নয়, তা পর্তুগীজ পাদ্রিগণ কয়েক শতাব্দী আগে বুঝতে পেরেছিলেন। উইলিয়ম মার্সডেন সংগৃহীত অভিধানে পর্তুগীজের বাংলা প্রতিশব্দগুলি সাঙ্কি ও তাঁর সহকর্মিগণ বাংলা হরফেই লিখেছেন। সম্ভবতঃ মুদ্রণ জনিত অসুবিধার জন্য মানোএল কে এই ধারণা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

> থেকে অন্য সবাই লেখায় অনেক বড় ভুল বের হ'ল যাঁরা এর প্রতিকার করতে গিয়ে বাগধ্বনি ও উচ্চারণের বিভিন্নতা সৃষ্টির জন্য আর্কফলা যোগ করে বর্ণগুলির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেললেন। কিন্তু এতেও তাঁরা অসংখ্য ভুলের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। এই ভাষায় বর্ণ সংখ্যা এত বেশী যে এগুলি ব্যাখ্যা করা যায় না, এবং এজন্য তাঁরা বর্ণগুলিকে কখনো এক বর্ণরূপে, কখনো অক্ষররূপে উচ্চারণ করেন; যেমন 'কথা' শব্দে, এই শব্দের 'ক'-এ 'co' অক্ষরের জোর আছে, এবং 'কাছে' শব্দে কেবল মাত্র 'c' বর্ণের জোর আছে, ইত্যাদি। অবশিষ্ট বিষয় প্রয়োগ থেকে জানা যাবে।"[৩৭]

মার্সডেন-অভিধানের বর্ণান্তর পদ্ধতির সঙ্গে প্রথম অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত বর্ণান্তরের হুবহু মিল আছে। কাজেই সাঙ্কেতি এবং তাঁর সহকর্মীদের পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে ম্যানো এল সে এ বিষয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন তা বোঝা যায়।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি থেকে এই ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়:

(১) বাংলা বানান পদ্ধতিতে ধ্বনিমূলের (Phoneme) প্রচলিত অস্তিত্বকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

(২) তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, বাংলা ভাষা লেখার জন্য বাংলা বর্ণমালা রোমান বর্ণমালা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী।

(৩) বাংলা ভাষায় দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি এবং স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনির অবস্থিতির জন্যই সম্ভবতঃ তাঁরা এ ধারণা করেছিলেন। ম্যানো এল

---

৩৭. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাঁউ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮-৩৯।

এবং তাঁর পূর্বসূরিগণ ধ্বনি দুইটিকে সার্থকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার ফলে য়োনান হরফে বর্ণান্তরের জন্য বিশেষ রীতিরও প্রয়োজন হয়েছিল, যেমন প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির জন্য যুগ্ম ব্যঞ্জন (tt) এবং মহাপ্রাণ ধ্বনির জন্য H।

বাংলা বর্ণমালার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করলেও ম্যানো এল এ-কে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেন নি। তিনি প্রায় ধরে ফেলেছেন যে, বাংলায় বর্ণমালা নাই, অক্ষর মালা (syllabry) আছে। আসলে বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্নিহিত স্বরবর্ণ সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাছাড়া বাংলা বর্ণমালায় রেফ, ফলা এবং যুক্ত বর্ণের আধিক্যে (তাঁর মতে আর্ক ফলা) তিনি বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও এ ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্যকে তিনি প্রায় হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নাই।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং সর্বনাম পদের শব্দরূপ এবং ধাতুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার চার প্রকার শব্দ রূপ, দুইটি কারক এবং দুইটি বচন—একবচন ও বহুবচন নির্ণয় করেছেন।

শব্দরূপ চারটি হচ্ছে :

(১) যে সব বিশেষ্য শব্দের হ্রস্ব 'ও' বা দীর্ঘ 'ও' ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ অন্তে যুক্ত থাকে সে গুলির সম্বন্ধ পদ '-র' যোগে গঠিত হয়। যেমন, কর্তা লোহা, সম্বন্ধ লোহার।

(২) যে সব বিশেষ্যের অন্তে হ্রস্ব 'ও' থাকে, সেগুলির সম্বন্ধ পদ '-এর' যোগে গঠিত হয়। যেমন, কর্তা ব্রহ্ম, সম্বন্ধ ব্রহ্মের।

(৩) যে সব বিশেষ্যের অন্তে দীর্ঘ 'ও' থাকে সেগুলির সম্বন্ধ পদ '-র' যোগে গঠিত হয়। যেমন কর্তা অসুখ, সম্বন্ধ অসুখের।

(৪) যে সব বিশেষ্যের অন্তে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে সেগুলির সম্বন্ধ পদ এর যোগে গঠিত হয়। যেমন, কর্তা নয়ন, সম্বন্ধ নয়নের।

কারক ছয়টি হচ্ছে : কর্তৃ কারক, সম্বন্ধ কারক (পদ), সম্প্রদান কারক, কর্ম কারক, সম্বোধন কারক, অপাদান কারক।

বিশেষ্য রূপের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক প্রকার শব্দের দুই ভাবে শব্দরূপ সাধিত হতে পারে। প্রথম শব্দরূপে কতকগুলি শব্দমূল একভাবে এবং কতকগুলি অন্যভাবে সাধিত হয়েছে। প্রধান পার্থক্য দেখা যাচ্ছে কর্ম কারকে এবং অপাদান কারকে। সুতরাং প্রথম শব্দরূপের বিকল্পরূপ দুটি হচ্ছে নিম্ন প্রকার :

(ক) কর্তা শব্দ মূল + 'ঃ' = লোহা
সম্বন্ধ শব্দ মূল + 'র' = লোহার
সম্প্রদান শব্দ মূল + 'রে' = লোহারে
কর্ম শব্দ মূল + 'রে'
অথবা 'কে' = লোহারে বা লোহাকে
অপাদান শব্দ মূল + 'তে' = লোহাতে

(খ) কর্ম এবং অপাদান ছাড়া বাকি রূপগুলি (ক)-এর মতই :

কর্ম : ছেঃ + রে অথবা ছেল + কে
অপাদান : ছেল + এতে

নমুনা হিসেবে প্রথম শব্দরূপটিই উদ্ধৃত ক'ল। আশা করি এতেই পর্তুগীজ বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে বাংলা শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হবে। এই

শব্দরূপে বহু বচনের রূপ নাই। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন যে, বাংলা ভাষায় বহুবচনের ব্যবহার খুব কম হয়।[৩৮]

বিশেষণ শব্দের রূপ

সাম্যুচির বিশেষণ বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

"বিশেষণের শব্দরূপ অবিকল বিশেষ্যের মত এবং প্রায় সবই একরকম। তথাপি কতকগুলি শব্দের অন্তে '-ই' যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ রূপ গঠিত হয়েছে। এগুলি প্রয়োগ থেকে বোঝা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ :

একবচন

কর্তৃ একটা ধর্ম পুরুষ = একজন ধার্মিক পুরুষ
কর্তৃ একটি স্ত্রী ধর্মী = একজন ধার্মিক নারী
কর্তৃ করুণাময় প্রভু = করুণাময় প্রভু
কর্তৃ করুণাময়ী মাগিয়া = করুণাময়ী মেয়ে
কর্তৃ বুড়া পুরুষ = বৃদ্ধ পুরুষ
কর্তৃ বুড়ী মাইয়া = বৃদ্ধা স্ত্রীলোক
কর্তৃ বাগ্যিয় মন্ত পুরুষ = ভাগ্যবান পুরুষ
কর্তৃ বাগ্যিয় মন্তী মাইয়া = ভাগ্যবতী মেয়ে

কতকগুলি বিশেষণ পদে আ স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হয় :

কর্তৃ হিংসক পুরুষ = হিংসুক পুরুষ।
কর্তৃ হিংসকা মাইয়া = হিংসুক মেয়ে।"[৩৯]

---

৩৮. আনো এল দা আস্‌সুম্প সাওঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২।
৩৯. আনো এল দা আস্‌সুম্প সাওঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৫।

শুরুতে বাংলা ভাষার সাধারণ সূত্র নির্দেশ করে তিনি অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন। তবে দুইটি বিশেষত্ব তাঁর নিজের উদ্ভাবিত : বিশেষ্যের পরে 'খানি' শব্দের অবস্থান এবং পুংলিঙ্গের জন্য 'একটা' এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য 'একটি' শব্দের প্রয়োগ। অমনোযোগিতা কিংবা পর্তুগীজ পদ বিন্যাস রীতির জন্য 'খানি' শব্দের স্থানচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু সান্তক্রির লিঙ্গ সম্পর্কিত সূত্রটি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন এই নিয়মটি সে সময়ে প্রচলিত ছিল।[৪০]

সর্বনাম শব্দের রূপ

সর্বনাম শব্দের রূপ নির্ণয়ে সান্তক্রির অমনোযোগিতা বোঝা যায়। তাঁর বক্তব্যের স্বচ্ছতা এবং আলোচনার সংক্ষেপীকরণ এখানে লক্ষণীয়।[৪১] এই অংশে পুরুষ বাচক (personal), অভিনির্দেশক (demonstrative) সম্বন্ধ বাচক (relative), প্রশ্নবাচক (interrogative) এবং অংশবাচক (partitive) সর্বনামের রূপ সাধিত হয়েছে। ল্যাটিন পুস্তিকার অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সর্বনামগুলির তাৎপর্য বোঝাতে সমর্থ হয়নি। কারণ, কখনো

---

৪০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয় রঞ্জন সেন—পাদ্রি এ্যান্দ্রো এল দা আস্‌ সুম্পসাম্‌ রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৩১, পৃঃ ১।/০।

৪১. সংক্ষেপীকরণের উদাহরণ : 'তোর বা তোমাদিগের' (পৃঃ ৬), পাঠককে এখানে বুঝতে হবে 'তোরদিগের বা তোমারদিগের'। অনুরূপভাবে 'এ বা ও বা উই বা উনি ; 'বা সে, বা ইনি বা তিনি'। কর্তৃকারকে এই সর্বনামগুলির সাতটি বিকল্প দেয়া হয়েছে ; সম্বন্ধ কারকে (পদে) দেয়া হয়েছে ছয়টি বিকল্প ; আর সম্প্রদানে আছে পাঁচটি। এই সংক্ষেপীকরণ বিদেশী শিক্ষার্থীর পক্ষে নিশ্চয়ই সহজ-বোধ্য হবে না।

কখনো অনেকগুলি বাংলারূপের একটি মাত্র ল্যাটিন প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে।[৪২]

সর্বনামের শব্দরূপ মোটামুটিভাবে বিশেষ্যের শব্দরূপের মতই। এখানেও একবচনে শব্দমূলে তাৎপর্য নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে শব্দরূপ অবশ্যই নিয়মিত। এক্ষেত্রে সম্বন্ধের একবচন বহুবচনের শব্দমূলের কাজ করেছে। যেমন, কর্তৃকারকে 'তা'—তোমা, সম্বন্ধে 'দিগের'—তোমা দিগের, সম্প্রদানে এবং কর্মে 'দিগেরে'—তোমা দিগেরে, এবং অপাদানে 'দিগেতে'—তোমা দিগেতে। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য 'দিগের' এবং 'দিগেরে'র বিকল্প 'গো' দেয়া হয়েছে। যেমন, 'আমার গো'।[৪৩]

সান্তুচি 'উনি' কে স্ত্রীবাচক সর্বনাম রূপে বর্ণনা করেছেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' 'উনি' স্ত্রীবাচক সর্বনাম রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, "উনি ও আন আর বিবি।" এবং "উনি বড় প্রীত হইল।"[৪৪] হয়ত ফরিদপুর কিংবা ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় এই রূপ প্রচলিত ছিল।

ক্রিয়াপদের রূপ

এই অংশে ল্যাটিন প্রতি শব্দের বদলে পর্তুগীজ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা সর্বনামগুলি এখানে কিছুটা ভিন্নভাবে উচ্চারিত হলেও এগুলির বানানে অধিকতর সঙ্গতি আছে। যেমন সর্বনাম শব্দের রূপ

---

৪২. যেমন ল্যাটিন Ego-এর বাংলা প্রতিশব্দ তিনি দিয়েছেন 'আমি এক মই'। আর ল্যাটিন Ille-এর বাংলা প্রতিশব্দ তিনি দিয়েছেন এ, ও, উই, উনি, সে, ইনি এবং তিনি। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

৪৩. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাউঁ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬।

৪৪. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাউঁ—কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, লিসবন ১৭৪৮, পৃঃ ৫৪ এবং ২৪৩।

অধ্যায়ে 'ও' এবং 'ওয়া' আছে কিন্তু এখানে তার বদলে 'উ' এবং 'উয়া' স্থান পেয়েছে। হয়ত এ অংশটি সাহিত্যের জন্য সহকর্মীর লেখা।

বাক্যরূপে ছয়টি কাল, যেমন বর্তমান কাল, অসম্পন্ন অতীত (preterite imperfect), সম্পন্ন অতীত (the preterite perfect), অন্য সম্পন্ন অতীত (the other preterite perfect), সুসম্পন্ন অতীত (the plue perfect) এবং ভবিষ্যৎ কাল ক্রিয়ার দুইটি ভাব (Mood), যেমন, নির্দেশক এবং অনুজ্ঞা মর্যাদার তুলনামূলক দুইটি মান : সাধারণ এবং সম্মান সূচক এই অংশে নির্ণীত হয়েছে।

বাংলা ক্রিয়াপদগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে, অস্ত্যর্থক (substantive) এবং বিশেষণীয় (Adjectival) ক্রিয়াপদ। অস্ত্যর্থক ক্রিয়াপদগুলি হচ্ছে 'হই' এবং নাস্তিবাচক 'ন হই' এবং 'নাই'। অকর্মক ক্রিয়াসহ অবশিষ্ট ক্রিয়াপদগুলি হচ্ছে বিশেষণীয় ক্রিয়াপদ।

অস্ত্যর্থক ক্রিয়া 'হই' এর রূপ ছয় কাল এবং অনুজ্ঞায় সাধিত হয়েছে। এর নাস্তিবাচক 'ন হই' এর রূপ কেবলমাত্র বর্তমান কালেই সাধিত হয়েছে। লেখক মন্তব্য করেছেন যে, অবশিষ্ট কালগুলিতে এই ক্রিয়াপদ 'হই' ধাতুর মতই সাধিত হয়।

বর্তমান, অসম্পন্ন অতীত এবং সম্পন্ন অতীতকালে যেহেতু 'আছি' ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়, সে জন্য এই কালগুলিতে ক্রিয়াপদটি সাধিত হয়েছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "আছিতাম, আছিত' ইত্যাদি পুরা নিত্যবৃত্ত রূপ 'আছ্' ধাতুতে এখন আর দেখা যায় না।"[৭৫] আমাদের

---

৭৫. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেন—পাদ্রি মানোএল দা আস্‌সুম্পসাম রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ. কলিকাতা, ১৯৩৯, পৃঃ ১৸৩।

বারণা এই ধাতুরূপ ফরিদপুরের উপভাষায় প্রচলিত ছিল। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' এর উদাহরণ আছে। যেমন, তাহাতে অর্থ ভেদের স্থান শূন্য (খোদিত) আছিত।[৪৬]

বিশেষণীয় ক্রিয়াপদগুলির আদর্শ হিসেবে 'করি' পদটির সম্পূর্ণরূপ দেওয়া হয়েছে। ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাবের রূপ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে সাধিত হয়েছে। একবচনে কেবল মধ্যম ও প্রথম পুরুষ দেখা যায়; কিন্তু বহুবচনে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ দেখি।

ক্রিয়াবাচক অব্যয় (করিতে), ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য (করিবার), অতীত ক্রিয়াবিশেষণ (করিয়া) এবং সক্রিয় অতীত ক্রিয়া বিশেষণের (করিলে) উদাহরণ আছে।

শেষে কাল-গঠনের নিম্নোদ্ধৃত নিয়ম সংযোজিত হয়েছে :

"বিশেষণীয় ক্রিয়াপদগুলির কেবল এই রূপ সাধন প্রচলিত আছে: উত্তম পুরুষের একবচনে তাদের অন্তে 'ই' এবং মধ্যম পুরুষে 'ইস্' অথবা 'অস্' যুক্ত হয়। নির্দেশ বাচক বর্তমান ব্যতীত তাদের অন্য কোন ধাতুরূপ নাই। এই বর্তমানের সঙ্গে 'তাম' অক্ষর যোগ করে অসম্পন্ন অতীত গঠিত হয়, যেমন 'করি' 'করিতাম' এবং 'আছি' যোগ করে সম্পন্ন অতীত হয়, যেমন, 'করি', করিয়াছি'; 'লাম' যোগ করে অন্য সম্পন্ন অতীত হয়, যেমন, 'করি', 'করিলাম'। প্রথম সম্পন্ন অতীতে 'লাম' অক্ষর যোগ করে সুসম্পন্ন অতীত গঠিত হয়; যেমন 'করিয়াছি', 'করিয়াছিলাম'। একই বর্তমানের সঙ্গে 'ব' বা 'ম' অক্ষর যোগ করে ভবিষ্যৎকাল নির্দেশিত হয়; 'করি' 'করিব' 'করিম'।[৪৭] একই বর্তমান থেকে 'ই' বর্জন করে অনুজ্ঞা

---

৪৬. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাও—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬।

৪৭. 'করিম' ফরিদপুরের আঞ্চলিক ক্রিয়ারূপ। ব্যাকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ক্রিয়ারূপটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি অন্যতম সন্ধান সূত্র যার

তৈরী হয় যেমন 'করি', 'কর'। ঐ একই বর্তমানের সঙ্গে 'তে' অক্ষর যোগ করে ক্রিয়াবাচক অব্যয় নিষ্পন্ন হয় যেমন 'করি', 'করিতে'। একই বর্তমানের সঙ্গে 'বার' অক্ষর যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সিদ্ধ হয়; যেমন 'করি' 'করিবার'। 'আ' যোগ করে অতীত ক্রিয়া বিশেষণ হয়; যেমন, 'করি' 'করিয়া'।[৪৮]

ব্যাকরণের ক্রিয়াক্রপ সাধনে অবশ্য ঘটমান বর্তমান এবং ঘটমান অতীত এই দুইটি কাল বাদ পড়েছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' এবং দোত্র এ্যান্তোনিওর Dialogo-তে দুই কালেরই উদাহরণ আছে। সংক্ষেপী-করণের জন্য কিংবা ম্যানো এল-এর পূর্ববঙ্গীয় সহকারীর হস্তক্ষেপের ফলে সম্ভবতঃ ব্যাপারটি ঘটেছে। এই সহকারীই সম্ভবতঃ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' উত্তম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালে 'বান' বিভক্তি যোগ করেছেন। ঢাকা-ময়মনসিংহের এই আঞ্চলিক ক্রিয়াক্রপটির কোন নিদর্শন ব্যাকরণে নাই।

পদক্রম

ব্যাকরণের পদক্রম অংশই সব থেকে দীর্ঘ। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা উনিশ। এর মধ্যে সূত্র সংখ্যা ২৬, ৪৩, ৪৪, ৪৮ এবং ৪৯ ব্যাকরণের লেখক নির্ণয় প্রসঙ্গে এবং ৫১, ৫২, ৫৩ ধ্বনিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সূত্রের উদাহরণে ব্যবহৃত অধিকাংশ বাক্যও উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং প্রসঙ্গ দীর্ঘ হলেও আমাদের বর্ণনা হবে সংক্ষিপ্ত।

•

সাহায্যে মনে করা যায় যে গ্রন্থটি সাস্তুচি এবং তাঁর সহকর্মীদের রচিত।

৪৮. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাওঁ—Vocabulario Em Idioma Bengala E Portuguez, Lisboa, 1743, pp. 20-21.

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ অংশ সম্পর্কে বলেছেন, "কতকগুলি সূত্র কিন্তু বাক্যযোজনার সূত্র নহে, বাস্তবিক পক্ষে সেগুলি পদ সাধনেরই সূত্র। অপর Advertencias অংশে পদ সাধন ও বাক্য সাধন উভয় বিষয়ের সূত্র বিমিশ্র-ভাবে গ্রথিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কারক দ্যোতক Post positions বা বিভক্তি স্থানীয় শব্দাবলী প্রায় সমস্ত এই অংশে উল্লিখিত হইয়াছে।"[৪৯]

পদক্রম অংশ তিন ভাগে বিভক্ত : এক থেকে উনিশ পর্যন্ত সূত্র উপ-শিরোনাম বিহীন, বিশ থেকে তেত্রিশ পর্যন্ত সূত্র 'ক্রিয়াপদ সংগঠন' এবং তেত্রিশ থেকে তিপ্পান্ন পর্যন্ত সূত্রের শিরোনাম 'পর্যবেক্ষণ'।

প্রথম সূত্রে ক্রিয়াপদের কর্তারূপে অন্যান্য কর্তার মত সংযোজক সর্বনাম 'যে'-র ব্যবহার প্রদর্শিত হয়েছে। দ্বিতীয় সূত্রে কর্তায় এ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন যে জনে গরুর মাংস খায়. সে হিন্দু নহে।" কিন্তু ক্রিয়াপদ অস্তিবাচক কিংবা অকর্মক হলে কর্তায় 'এ' বিভক্তি হয় না। যেমন, "যে জন ভাল হয়, ভাল কার্য করিয়া সে জন স্বর্গে যায়।"[৫০]

চতুর্থ এবং পঞ্চম সূত্র বাক্যে উত্তম এবং মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ সম্পর্কিত। বাক্যে কখনো কখনো উত্তম এবং মধ্যম পুরুষ উহ্য থাকে। কিন্তু ক্রিয়াপদ যদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম এবং ইচ্ছার বৈপরীত্য বুঝায় তা হ'লে উত্তম এবং মধ্যম পুরুষের উল্লেখ অপরিহার্য।

---

৪৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন—পাদ্রি ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাম রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৩১, পৃঃ ১।৵০—১।৶০।

৫০. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাঁত—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।

ছয় এবং সাত নম্বর সূত্রে সম্মানার্থে এবং তুচ্ছার্থে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের প্রয়োগ বিধি আলোচিত হয়েছে। সম্মানার্থে মধ্যম পুরুষে 'তুমি' এবং তুচ্ছার্থে 'তুই' ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়াপদে যথাক্রমে 'আ' এবং 'ই' যুক্ত হয়। প্রথম পুরুষে সম্মানার্থে 'এন' যুক্ত হয়। উদাহরণ "ঠাকুর গোলামরে কহিলেন, তুনি খানা তৈয়ার করিলি? গোলাম কহিল, না ঠাকুর পারিলাম না, তুমি নাক করিবা।"[৫১]

পরস্পর যুক্ত শব্দ ক্রিয়ার কর্তারূপে প্রযুক্ত হলে সকলের একই কারক হয়। কিন্তু সংযুক্ত শব্দগুলি গৌণ কারকে প্রযুক্ত হলে বাক্যের পরবর্তী অংশের প্রয়োজনে কেবলমাত্র শেষ শব্দটিতে কারকচিহ্ন বসে। "বিনে আন্ধা, আশা, করুণায় মুক্তি নহি।"[৫২] উদাহরণটিতে 'বিনে' অনুসর্গের পর 'আন্ধা', 'আশা', 'করুণা' শব্দগুলি অধিকরণে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু 'এ'-বিভক্তি শুধু 'করুণা' শব্দে বসেছে।

দশ এবং এগারো নম্বর সূত্রে সংযোজক সর্বনাম 'যে'-র প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে। সংযোজক সর্বনাম 'যে' সর্বদাই পরবর্তী শব্দের বচন ও বিভক্তি গ্রহণ করে। কিন্তু দুইটি ক্রিয়াপদ এক সঙ্গে এলে দ্বিতীয়টির পূর্বে বসে।

ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত কতকগুলি বিশেষ্যপদের কারক একই। কিন্তু এই বিশেষ্য পদগুলি গৌণ কারকে ব্যবহৃত হলে সেই কারকের বৈশিষ্ট্য কেবল শেষ শব্দটিতে দেখা যায়। যেমন, "পুরভু করুণা সিন্ধুর কারণ ভিখ মাঙ্গিতে উচিত।"[৫৩] এখানে 'সিন্ধু'তে সম্বন্ধের 'র' যুক্ত হয়েছে, 'পুরভু'তে নয়। ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদগুলির সন্নিতির

---

৫১. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্পসাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।
৫২. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প,সাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪।
৫৩. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬।

মত বিশেষ্য পদযুক্ত বিশেষণ শব্দেও কারক বিভক্তির একই রকম সঙ্গতি ঘটে।

অস্ত্যর্থক ক্রিয়া 'হই' বা 'নহি' উচিত শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত হলে যার সঙ্গে এটি খাপ খায় সেই পুরুষের সম্প্রদান কারক গ্রহণ করে। যেমন, "রোমানা পত্রীরে উচিত নহে অপরাধ করিতে; তবে উচিত সুকার্য্য করিতে।"[৫৪]

প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় যে কারক ব্যবহৃত হয়, উত্তরেও সেই কারক বসে। যেমন 'কার কিতাব?' উত্তর 'আমার।' যেহেতু সম্বন্ধ বাচক কারকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেহেতু উত্তরে সম্বন্ধ বাচক বিভক্তি বসেছে। "কে করিয়াছে এস কামো? আমি।"[৫৫] এখানে প্রশ্ন কর্তৃ কারকে করা হয়েছে। উত্তরেও তাই কর্তৃ কারক বসেছে।

বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কিত দুইটি বিশেষ্য পদ কোন বাক্যে থাকলে বস্তুর অধিকারী শব্দটি সম্বন্ধ পদের বিভক্তি গ্রহণ করে। যেমন, পরমেশ্বরের কৃপাতে খ্রীস্টের শাস্ত্র পাইয়াছি।"[৫৬] 'কৃপা' শব্দের সম্বন্ধ কারক 'পরমেশ্বরের' এবং 'শাস্ত্র' শব্দের সম্বন্ধ পদ 'খ্রীস্টের'।

আঠারো এবং উনিশ সংখ্যক সূত্রে তৌলনিক মানের প্রয়োগ আলোচিত হয়েছে। বাংলায় তৌলনিক এবং সর্বোত্তম মাত্রা নাই। বহুত্তর বা ক্ষুদ্রতর বস্তুর সম্বন্ধ পদের সঙ্গে বিশেষণ ব্যবহার করে এই অভাব দূর করা হয়। যেমন "আমার ভাই আমার বড় ভাই।" এখানে 'আমার' সম্বন্ধ পদের সঙ্গে বিশেষণ 'বড়' ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে তারতম্য

---

৫৪. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।
৫৫. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।
৫৬. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭।

এভাবেও বোঝানো যায়—"আশা ছাড়াইয়া করুণা বড়।"[৫৭] ক্রিয়া বিশেষণ 'বেশ' শব্দ ব্যবহার করে সর্বোত্তম মাত্রার অভাব পূরণ করা হয়। যেমন, "গুণ সকলের বেশ বড় করুণা" অথবা "সকল গুণ ছাড়াইয়া করুণা বেশ বড়।"[৫৮]

ক্রিয়াপদ গঠন

ক্রিয়াপদ গঠন উপ অধ্যায়ে গ্রন্থকার ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত হচ্ছে বাঙালীরা এত বিভিন্ন ভাবে কথা বলে যে, কোন্ ক্রিয়াপদের কোন্ কারক দরকার সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন খুব কঠিন। তথাপি তিনি কতকগুলি নিয়ম দিয়েছেন।

কর্তৃবাচ্যের সব ক্রিয়াপদে কর্মকারকের বদলে বস্তুবাচক কর্তা অথবা কর্তার মত অব্যয় কর্মের দরকার হয়। উদাহরণ, পরমেশ্বরের আজ্ঞা যে পালে সে তাহান কৃপা পাইবে। এখানে 'আজ্ঞা', 'পালে' ক্রিয়াপদের অব্যয় কর্ম এবং 'কৃপা', 'পাইবে' ক্রিয়াপদের অব্যয় কর্ম।[৫৯]

কতকগুলি ক্রিয়াপদ, যা করা হয়, দেয়া হয়, নির্ধারণ করা হয় ইত্যাদির কর্ম ছাড়াও যাকে করা হয়, দেয়া হয়, নির্ধারণ করা হয় ইত্যাদির সম্প্রদান কারক গ্রহণ করে। উদাহরণ "যে আমারে দুঃখ দেয় তাহারে দয়া করি।" এখানে 'আমারে' 'দেয়' ক্রিয়ার সম্প্রদান এবং 'দুঃখ' কর্ম; 'তাহারে' 'করি' ক্রিয়াপদের সম্প্রদান এবং 'দয়া' কর্ম।[৬০]

---

৫৭. মানো এল দা আস্‌সুম্প সাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।
৫৮. মানো এল দা আস্‌সুম্প সাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮।
৫৯. মানো এল দা আস্‌সুম্প সাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।
৬০. মানো এল দা আস্‌সুম্প সাও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯।

যাচ্ঞা বাচক ক্রিয়া, যে জিনিস চাওয়া হয় তার কর্ম এবং যার নিকট চাওয়া হয় তার সম্বন্ধ পদের সঙ্গে ক্রিয়া বিশেষণ 'কাছে' গ্রহণ করে। উদাহরণ "পরমেশ্বরের দয়ার কারণ ভিখ মাগিতে উচিত খ্রীষ্টাণ্ড সকলের কাছে।"[৬১]

প্রার্থনা বাচক ক্রিয়াপদে যার জন্য চাওয়া হয় তার সম্বন্ধ পদের সঙ্গে 'কারণ' শব্দ যুক্ত হয় এবং যার নিকট চাওয়া হয় তার সম্বন্ধ পদের সঙ্গে 'সাক্ষাতে' অথবা 'উদ্দেশে' অথবা 'ঠাঁয়' শব্দ বসে। যেমন, "বিবি মারিয়া আমার দিগের কারণ সাধেন পরমেশ্বরের সাক্ষাতে বা ঠাঁয় বা উদ্দেশে।"[৬২]

বাংলা ভাষায় কর্ম বাচ্যের কোন ক্রিয়াপদ নাই। সেই জন্য বাঙালীরা সর্বদাই বাক্যকে কর্তৃবাচ্যে পরিবর্তিত করে।

'কোথায়' এই প্রশ্নের উত্তর অধিকরণ কারকে হয়। 'কোথা থেকে' এই প্রশ্নের উত্তর 'থাকিয়া, হোতে বা থেকে' অনুসর্গের সাহায্যে অপাদান কারকে হয়। 'কোন দিক দিয়া'? এই প্রশ্নের উত্তর কর্তৃকারকে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ 'দিয়া'র সাহায্যে হয়। যেমন, "উত্তরিতে থাকিয়া মুর্শিদাবাদ দিয়া গিয়াছিলাম ঢাকাতে।"[৬৩] 'কোথা থেকে' প্রশ্নের উত্তরে 'উত্তরিতে থাকিয়া', 'কোন দিক দিয়া' প্রশ্নের উত্তরে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ 'দিয়া'র সাহায্যে 'মুর্শিদাবাদ' কর্তৃ কারক; এবং 'কোথায়?' এই প্রশ্নের উত্তরে 'ঢাকাতে' অধিকরণ কারক।

---

৬১. মানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।
৬২. মানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০।
৬৩. এটি ব্যাকরণের অসঙ্গতি, কেননা তাঁর গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠায় কর্ম বাচ্যে ক্রিয়াপদের উদাহরণ আছে।
৬৪. মানো এলদা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

যে অস্ত্রের সাহায্যে কিছু করা হয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ 'দিয়া' সহ তা নিরপেক্ষ কর্তা গ্রহণ করে এবং যে বস্তু থেকে কিছু করা হয় তা সম্বন্ধ পদ গ্রহণ করে। উদাহরণ "এক ছুরি দিয়া এক বুড়ি কাটের করিয়াছি।"[৬৫]

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Gerund) দিয়ে বাক্য গঠিত হলে ক্রিয়াপদ ক্রিয়াবাচক অব্যয়ে (infinitive) উন্নীত হয় কারণ এই ভাষায় কোন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য নাই। উদাহরণ, "যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর মরিয়াছেন নর উদ্ধার করিতে।"[৬৬] এখানে 'করিতে' ক্রিয়াবাচক অব্যয়। "যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর মরিয়াছেন নর উদ্ধার করিবার কারণ" এ ভাবে বললে 'করিবার' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

পর্যবেক্ষণ

এই উপবিভাগেও বৈয়াকরণ বাংলা ভাষার পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অন্তর্বর্তক ক্রিয়াপদগুলিকে তিনি সরল ও মিশ্র দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। মিশ্র ক্রিয়াগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রযোজক ক্রিয়া। সরল ক্রিয়াপদের অন্ত্য 'ই'-কে 'আই'-এ পরিবর্তিত করে মিশ্র (প্রযোজক) ক্রিয়া গঠিত হয়েছে। যেমন, 'করি' থেকে 'করাই', 'দেখি' থেকে 'দেখাই', 'ডুবি' থেকে 'ডুবাই'।

---

৬৫. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

৬৬. ম্যানো এল দা আস্‌সুম্প সাউ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২। এখানেও ব্যাকরণের অসঙ্গতি ধরা পড়ে। রূপতত্ত্ব অধ্যায়ের ১৫ এবং ১৯ পৃষ্ঠায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ হিসেবে 'হইবার' এবং 'করিবার' আছে।

এই ক্রিয়াগুলি থেকে কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। সরল ক্রিয়া থেকে যেগুলি গঠিত হয়, তাদের অন্তে 'অন্' যুক্ত হয়। যেমন 'করি' থেকে 'করণ', দেখি থেকে দেখন, 'ডুবি' থেকে 'ডুবন'। মিশ্র (প্রযোজক) ক্রিয়া থেকে যেগুলি গঠিত হয়, তাদের অন্তে 'আন' যুক্ত হয়; যেমন 'করাই' থেকে 'করান', 'দেখাই' থেকে 'দেখান', 'ডুবাই' থেকে 'ডুবান'।

ক্রিয়াপদগুলিকে অস্তিবাচক সরল এবং নঞর্থক মিশ্ররূপে ভাগ করা যায়। প্রথম ক্রিয়াগুলির পূর্বে 'অ' বর্ণ যুক্ত করে দ্বিতীয় ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন হয়। যেমন 'চিনিতে' অর্থ জানা, 'অচিনিতে' অর্থ অজানা, 'দেখিতে' অর্থ দেখা, এর নঞর্থক মিশ্র 'অদেখিতে' অর্থ অদেখা।[৬৭]

বিশেষ্য পদগুলিকেও অস্তি বাচক সরল নাস্তি বাচক মিশ্র এই দুই ভাগে ফেলা যায়। অস্তি বাচক পদের আদিতে ব্যঞ্জন থাকলে তার পূর্বে 'অ' যুক্ত করে এই নাস্তি বাচক মিশ্র পদ তৈরী হয়। যেমন, 'চিনত' বা 'চিত্ত' এর মিশ্ররূপ 'অচিনত' বা 'অচিত্ত', 'জীর্ণ' অর্থাৎ যা হজম হয়েছে, এর মিশ্ররূপ 'অজীর্ণ' যা হজম হয়নি। 'ভাগ্যিয়া' অর্থ ভাগ্যবান, এর মিশ্ররূপ 'অভাগ্যিয়া' অর্থ ভাগ্যহীন।

কিন্তু সরল বিশেষ্য পদের আদিতে স্বরবর্ণ থাকলে তার পূর্বে 'অন্' বসিয়ে শব্দটিকে নঞর্থক পদে পরিণত করা যায়। যেমন, 'অন্ত' শব্দটির অর্থ শেষ, কিন্তু 'অনন্ত' শব্দের অর্থ যার শেষ নাই। 'আস্তিক' শব্দের অর্থ যার বিশ্বাস আছে, কিন্তু 'অনাস্তিক' শব্দের অর্থ যার বিশ্বাস নাই।

---

৬৭. 'অচিনিতে' বা 'অদেখিতে' জাতীয় ক্রিয়াপদ দোম এান্তোনিও-র Dialogo কিংবা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' ব্যবহৃত হয়নি। হয়ত 'অবিচলিত' বা 'অপরিচিত' ইত্যাদি নঞর্থক অতীত ক্রিয়া বিশেষণের সাদৃশ্যে গ্রন্থকার এই সূত্র নির্মাণ করেছিলেন।

অনুসর্গ 'বিনে' এবং 'বেগর' অধিকরণের বিভক্তি গ্রহণ করে যেমন 'বিনে আমায় কক্ষণা নাহি।'[৬৮]

'কাছে, পাশ, নগিক, নগুদিক, নিকট' এই ক্রিয়া বিশেষণগুলির স্থিতি বাচক সম্বন্ধ পদের দরকার হয়। যেমন, 'আমার গাঁও ঢাকার নগিক।'[৬৯]

'সাতে, লগে, সঙ্গে, সংসর্গে'-এই ক্রিয়া বিশেষণগুলির গতিবাচক বা দলবাচক সম্বন্ধ পদ লাগে। যেমন 'পেত্র আমার সঙ্গে নাকাতে গিয়াছে।'[৭০]

'পিছে' এবং 'পাছে' যার অর্থ পিছনে বা পরে এবং 'আগে' যার অর্থ পূর্বে—এই ক্রিয়া বিশেষণগুলিও সম্বন্ধ বাচক পদের সঙ্গে বসে। যেমন, 'আমার আগে' এবং 'আমার পিছে'।[৭১]

সৌন্দর্যের জন্য বাক্যে ব্যবহৃত 'বলিয়া' শব্দটি স্থিতিবাচক ক্রিয়া-পদের সঙ্গে যুক্ত হয়। এটি 'বলি' ক্রিয়াপদের অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন, "আমি বড় দুঃখ পাই বলিয়া।" বাক্যটির অর্থ পরিবর্তন না করে বলা যায় "আমি বড় দুঃখ পাই।"[৭২]

অনায় 'ত' এবং 'ও' বিনা প্রয়োজনে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন "ইচ্ছাত নাই খাইবার।" এ কে "ইচ্ছা নাই খাইবার" বলা যায়। অনুরূপ ভাবে, "এই কামো আমিও করিয়াছি না, তুমিও করিলা না" বাক্যটিকে "এই কামো আমি করিয়াছি না, তুমি করিলা না" বলা যেতে পারে।[৭৩]

---

৬৮. মানো এল দা আস্‌সুন্দ সাঙৈ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।
৬৯. মানো এল দা আস্‌সুন্দ সাঙৈ— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।
৭০. মানো এল দা আস্‌সুন্দ সাঙৈ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।
৭১. মানো এল দা আস্‌সুন্দ সাঙৈ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।
৭২. মানো এল দা আস্‌সুন্দ সাঙৈ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭।
৭৩. মানো এল দা আস্‌সুন্দ সাঙৈ—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭।

আহ্বান সূচক বাক্যে 'ডাকি' ক্রিয়ার অসমাপিকা 'ডাকিয়া'র সঙ্গে 'আনি' ক্রিয়াপদ যুক্ত করা হয়। যেমন, "যাও গিয়া, আমার ছোকরা ডাকিয়া আন।" এটি একটি অপপ্রয়োগ।[৭৪]

অস্ত্যর্থক 'হয়' ক্রিয়া প্রায় সর্বদাই বাক্যে উহ্য থাকে। যেমন, "আমি বড় গরীব।" এই বাক্যে 'আমি' কর্তৃপদের ক্রিয়া 'হয়' উহ্য আছে।[৭৫]

ব্যাকরণে যে সব অসঙ্গতি আমরা লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয় মূল গ্রন্থটি প্রথমে ফরিদপুরে সান্তুচি, গোমেজ ও সায়াইভা কর্তৃক রচিত হয়। এ ক্ষেত্রে দোম এ্যান্তোনিও-র সাহায্যও হয়ত তাঁরা পেয়েছিলেন। তাঁদের পরিত্যক্ত পাণ্ডুলিপিটি পরবর্তীকালে ম্যানো এল দা আসুম্পসাঁও কর্তৃক ঢাকায় সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাংলা ভাষার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁরা যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। মনে রাখা দরকার যে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনার এটা প্রথম প্রয়াস। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চল্লিশ পৃষ্ঠায় সীমিত এই ব্যাকরণ যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

৭৪. ম্যানো এল দা আসুম্পসাঁও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৭, 'ডাকিয়া আন' প্রকৃত পক্ষে অযথার্থ প্রয়োগ নয়। ব্যাকরণ কার এ ধরণের যৌগিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণে সমর্থ হননি। হয়ত এত ক্ষুদ্র পরিসরে এ জাতীয় বিশ্লেষণ সম্ভবও নয়।

৭৫. ম্যানো এল দা আসুম্পসাঁও—পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮। বাংলা ভাষার পদক্রমের এই অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যকে গ্রন্থকার ঠিকই চিহ্নিত করেছেন। তবে উদ্ধৃত বাক্যে 'আমি' কর্তৃকারকের উহ্য ক্রিয়াপদ হবে 'হই', 'হয়' নয়।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

মূলগ্রন্থ সমূহ

পাণ্ডুলিপি

১. Antonio Da Rozario, Dom—Dialogo Biblioteca Publica, Evora Ms. No. Cod $\frac{C \times VI}{1-1}$

২. নাম বিহীন—A Vocabulary, Portuguese-Bengali (The Marsden Lexicon) Library of the school of Oriental and African Studies. University of London Ms. No. 11963 (Marsden)

মুদ্রিত

৩. Assumpcam, Manoel Da—Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez, Lisbon, 1743

৪ Do —CREPER N a NTRERORTHBHED Lisbon, 1743

গৌণ গ্রন্থ :

৫. Campos, J. J. A—History of the Portuguese in Bengal Calcutta, 1919

৬. Chatterji, S. K. and Sen Priyaranjan—Manoel Da Assumpcams Bengali Grammar, Calcutta, 1931

৭. Grierson, Sir G. A—Linguistic Survey of India Vol. V, Part I, Calcutta, 1903

৮. Khondkar, A. R.—The Portuguese contribution to Bengali Prose, Grammar and Lexicography, Dacca, 1976

৯. দাস, সজনী কান্ত ও চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার—কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ (ম্যানো এল দা আসুম্পসাঁও) কলিকাতা, ১৯৩৯

১৩. সেন, সুরেন্দ্রনাথ—ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ কলিকাতা, ১৯০৭

প্রবন্ধ

১. Beveridge, Lord Hosten, H—List of Portuguese Jesuit Missionaries in Bengal and Burma (1576—1742), Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. VII, Calcutta, 1911.

২. Hosten, H—The Three First Type Printed Bengali Books, Bengal Past and Present, Vol. IX, Calcutta, 1914.

The Three First Type Printed Bengali Books (Second article), Bengal Past and Present, Vol. XIII, Calcutta, 1916.

The Bandel and Chinsurah Church Registers, 1757-1913, Bengal Past and Present, Vol. XI Calcutta, 1915.

The Marsden Mss. in the British Museum, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI, Calcutta, 1910.

৩. Sarkar, Jadunath—Shaista Khan in Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II, Calcutta, 1906.

The Feringi Pirates of Chittagong, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, Calcutta, 1907.

ধর্মের ষাঁড়

মুখলেসুর রহমান

ধর্মের ষাঁড় নামক জীবটির সংগে সকলেই অল্প বিস্তর পরিচিত। শব্দ দুটি শ্রবণ মাত্রেই উক্ত জন্তুর যে আকৃতি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হল বিশাল পশু, অপরিমিত স্বাস্থ্য, চালচলনে বেপরোয়া, দায়িত্বহীন, রক্তচক্ষু শ্বেতবর্ণ একটি বলীবর্দের। তার সাত খুন মাপ, কারণ সে পবিত্র, যথারীতি আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথা ইচ্ছা বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। অতএব সে খেতখামার তছনছ করে ফসল নষ্ট করতে পারে, ফলমূল উৎপাদন করতে পারে, কারণে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে পারে লোকজনকে খুন জখমও করতে। তাকে পীড়ন করা নিষিদ্ধ, সে অবধ্য। তার রক্তপাত করা মহাপাপ, কারণ সে ধর্মের ষাঁড়, অর্থাৎ পবিত্র জন্তু, দেবাদিদেব মহাদেব বা শিবের বাহন।

পবিত্র পশু হিসেবে ষণ্ডের প্রাচীনত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। অনেক হিটাইট দেবতার অবতার বলে গণ্য করা হত বৃষকে। হিটাইটদের ধর্মকর্মে ষণ্ড বলি দেওয়া হত মহাসমারোহে; তাদের ধর্মীয় কেন্দ্রগুলিতে বৃষ ছিল পবিত্র জন্তু।[১] দেবতাজ্ঞানে মেষশিশু সহ ষণ্ডকে পূজা করার নিয়ম ছিল হিটাইট ধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[২] প্রাচীন সুমেরিয়ার দেবতাযুগ্ম বৃষভ, সেখানকার মুখ্য দেবতার একাধিক রূপের অন্যতম ছিল ষণ্ড।[৩] ব্যাবিলনের দেবাদিদেবকে বলা হত স্বর্গীয় বৃষ। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় বৃষ ছিল পবিত্র জন্তু। নিনিপ, এরেক ও অসুর দেবতার প্রতীক ও বাহন ছিল বৃষ।[৪] মাতৃতান্ত্রিক যুগে 'মাদার গডেস' ছিলেন পশুদের সম্রাজ্ঞী

এবং এই ভূমিকাতেই তিনি পূজিত হতেন ভারত থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায়। পুরুষের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল বিরোধিতামূলক; কারণ প্রথমোক্তরা বিশ্বাস করত মানুষকে তাদের এক অংশকে বন্যপশুতে রূপান্তরিত করে নিজের স্বাবকবৃন্দে পরিণত করেছিলেন 'মাদার গডেস'।[৩] পশুদের সংগে তাঁর এ সম্পর্ক পুরুষশক্তির প্রতীক বীর বা পুরুষ দেবতার আবির্ভাবের তুলনায় অনেক বেশী প্রাচীন। আর, 'মাদার গডেস' এর সংগে সম্পৃক্ত পশুকে পরাভূত ও নিহত করার জন্য পুরুষ দেবতার অবশেষে আবির্ভাব। তাই, পশু-জগতের উপর পুরুষ দেবতার প্রাধান্য বিস্তারের ফলে সূচিত হয়েছিল সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার পরিবর্তে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। প্রাচীন যুগের পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির উপকথা আর লোক ঐতিহ্যে উল্লিখিত পুরুষ দেবতা বা বন্যবীর কর্তৃক স্ত্রীলোকের পশু প্রেমিক হত্যার কাহিনী থেকে অনুমিত হয় পতি বা প্রেমিক হিসাবে কোন একটি পশু আদিতে সম্পৃক্ত ছিল 'মাদার গডেস' এর সংগে। উক্ত পশুর অতিমানবিক ব্যক্তি অতিক্রান্ত ক্ষমতায় 'মাদার গডেস' অন্তর্বর্তী হতেন বলে যে বিশ্বাস তখন প্রচলিত ছিল তা থেকে উদ্ভব হয় প্রাণীবাদমূলক ধর্মের।[৪] কিন্তু এই ক্ষমতা ক্রমশ আত্মীকরণ হয় পুরুষের সত্তায় এবং সেখান থেকে সঞ্চারিত হয় প্রাচীন পুরুষ দেবতায়।[৫] সংক্রমণগত একটি পর্যায়ের একটি চিত্র আমরা দেখি সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতিতে, তাম্রযুগের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। মোএন-জো-দারোতে আবিষ্কৃত একটি 'সিল' এ যোগাসনে উপবিষ্ট শৃংগযুক্ত শিরস্ত্রাণ পরিহিত পশু পরিবৃত ঊর্ধ্বলিংগ ত্রিমুখ দেবতা এবং আরও কয়েকটি 'সিল' এ উৎকীর্ণ বিপ্লাবিতকেশ সর্পসহ দুজন নতজানু অনুচরের মধ্যবর্তী উক্ত দেবতা খুব সম্ভব ইংগিত করে আদিম উপমহাদেশবাসীদের বিদ্যমান আত্মিক ধারণাসৃষ্ট সর্বপ্রথম কুলপতির। মার্শাল 'পশুপতি' আখ্যায় চিহ্নিত করেছেন উক্ত দেবতাকে।[৬] প্রাচীন মিশরীয়, এশীয় এবং দক্ষিণপূর্ব য়ুরোপীয় উপকথায় দেখা যায় পুরুষের মানবিক ক্ষমতার একদা প্রতিদ্বন্দ্বী পশুশক্তির প্রতীক ছিল প্রধানত ষণ্ড আর সিংহ।[৭] কিন্তু এই বিরোধিতা সব সময় স্পষ্ট নয়, কারণ সংক্রমণগত পর্যায়ে দেখা গেছে পুরুষের

মানবিক সত্তা অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে পশুর মধ্যে। যেমন, শঙ্করূপে মেম্ফিসে (Memphis) 'এপিস্' (Apis) এবং হেলিওপোলিসে (Heliopolis) 'মনেভিস্' (Mnevis) নামে উপাস্য মিশরীয় দেবতা অসিরিস (Osiris) ছিলেন সে দেশের 'মাদার গডেস' আইসিস্ (Isis) এর স্বামী।[১১] ক্রীটের বৃষমানব মিনোটর (Minotaur) এর অনুরূপ আদিম অসিরিসও ছিলেন খুব সম্ভব বৃষমস্তক মানুষ। মিনোটর ছিল রাজা মাইনসের রাণী পাসিফির গর্ভজাত এবং রাজা মাইনস ছিলেন আবার বৃষরূপী জিউস আর ফিনিসীয় রাজকুমারী য়ুরোপার মিলনের ফলশ্রুতি।[১২] এদিক থেকে য়ুরোপা আইসিসের এবং মিনোটর অসিরিসের সমগোত্র, কিন্তু মিনোটর ছিল মূলতঃ পুরুষের মানবিক সত্তাবিরোধী পশুশক্তির প্রতীক, যার জন্য তাকে নিহত হতে হয় মানুষ বীর থেসিউস্ (Theseus) এর হাতে।[১৩] অনুরূপভাবে, বাবিলনের গিলগামিশ্ মহাকাব্যে আমরা দেখতে পাই নায়কের হাতে দেবী ইশতার্ (Ishtar) এর ষণ্ডের নিধনের মাধ্যমে মাতৃতান্ত্রিকতার পরাভব ও অবসান এবং পিতৃতান্ত্রিক শক্তির প্রতিষ্ঠা। ইরানীয় উপকথায় মিথ্রাস যে চিত্র পাওয়া যায় তা একদল তরুণ অপরাজেয় বীরের, যিনি ভূমিকায়রা বিদ্ধ করছেন একটি নিখুঁতদেহী বৃষকে[১৪], কিংবা ভূপাতিত বৃষের উপর দণ্ডায়মান। এই আদিম ষণ্ডের মাধ্যমেই অন্তর্হিতা হতেন 'মাদার গডেস'। অরণ্যচারীয় উপকথায় বৃষদেবতার প্রজনন ক্ষমতা আর তার আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর মাধ্যমে উর্বরতা সঞ্চারিত হত শস্যক্ষেত্রে আর পশু জগতের মধ্যে এবং তাদের পুনরুজ্জীবন হত সুনিশ্চিত।[১৫] এ জাতীয় লোক ঐতিহ্যের অতএব দুটি তাৎপর্য রয়েছে : (১) এগুলির মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে নরবলিরোপমূলক পুরুষদেবতা কর্তৃক পশুশক্তির উচ্ছেদের মাধ্যমে সমাজে ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্যের বিস্তার এবং (২) 'মাদার গডেস' বা পৃথ্বী-মাতার নিকট উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বৃষোৎসর্গের মাধ্যমে উক্ত প্রাণী একদা তাঁর স্বামীর ভূমিকা পালন করত এই অতি প্রাচীন বিশ্বাসের সমর্থন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে প্রাচীন এথেন্সে ব্রাক্ষ-দেবতা ডায়োনিসস্ (Dionysos) এর সংগে রাণীর বার্ষিক বিবাহোৎসবের অনুষ্ঠানে।[১৬] ডায়োনিসস্‌কে অনেক সময়েই কল্পনা করা হত বৃষরূপে এবং উক্ত রূপেই তাঁকে উপস্থিত করা হত রাণীর সংগে তাঁর বিবাহ উৎসবে।[১৭] তাছাড়া, প্যাসিফি আর মিনোটরের কাহিনী থেকে অনুমান হয় বৃষদেবতার সংগে রাণীর বিবাহ একমাত্র এথেন্সেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মিশরে এপিস্-ষণ্ডের মৃত্যুর পর সন্ধানের নিদর্শন স্বরূপ তার জননেন্দ্রিয় সোনার খাপে ভরে প্রবিষ্ট করানো হত রাণীর জননেন্দ্রিয়ে।[১৮]

কৃষিভিত্তিক সমাজে পশুপালন নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আদিম গোপালকদের দৃষ্টিতে বৃষ ছিল প্রজনন শক্তির এক অতি স্বাভাবিক প্রতীক। কাজেই বিশালবপু অমিতশক্তি ষণ্ড-যৌবন সহজেই পবিত্র জন্তু বলে স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি উন্নীত হয়েছে দেবত্বে, তা নিজরূপেই হোক, বা কোন দেবতার প্রতীক বা বাহনরূপেই হোক। প্রাচীনকালে বহুদেশে শস্যদেবতার প্রতীক বলে বিবেচনা করা হত বৃষকে। পবিত্র বিবেচনায় বৃষকে হত্যা করে তার রক্ত মাংস ছড়িয়ে দেওয়া হত ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য।[১৯] প্রাচীন মিশরের কৃষি দেবতা অসিরিসকে সব সময় সমীকরণ করা হত প্রাণ্ডক্ত এপিস্ আর মনেভিস্ নামক ষণ্ডের সংগে। শক্তি ও বীর্যের প্রতীক হিসাবে ষণ্ড পূজার প্রচলন দেখা যায় মিশরে সুদূর অতীতকাল থেকে। পটাহ্ (Ptah) বা সূর্যদেবতার মন্দিরে এপিস্ বৃষ ছিল বিশেষ সম্মানের পাত্র। মিশরের ফারাওবৃন্দ, গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার, রোমান সম্রাট ক্যালিগুলা (৭৯-৮১ খৃঃ অঃ) তার দৈবশক্তির দরুণ প্রচুর নজরানা দিয়েছেন এই এপিস বৃষকে।[২০] সূর্যদেবতা এবং তাঁর জীবনদায়ক ক্ষমতার প্রতীক মনেভিস্ বৃষকে পূজা করা হত হেলিওপোলিস শহরে। বৃষ পূজার বিশেষ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় মিশরের বদ্বীপ অঞ্চলের প্রায় সব শহরে। এসব স্থানে বৃষকে সমীকরণ করা হত-অসিরিস্, সূর্যদেবতা পটাহ্ বা রা, মেষ-দেবতা আর হস্তীর আকার বিশিষ্ট দেবতা খনেমু (Khnemu) এর সংগে।[২১]

প্রাচীন গ্রীসে দৈবশক্তি বিশিষ্ট, পবিত্র জন্তুদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিল ষণ্ড। তার কারণ, ষণ্ডের বিপুল শক্তি, তার ক্রোধ এবং মৃতস্বনিদ্রা যাকে বলেন অপার্থিব ক্ষমতা-শক্তি, প্রাণপ্রাচুর্য, সন্তান পবিত্রতা আর দৈবায়ত্ত ক্ষমতা সব অন্তর্ভুক্ত।[২২] এই সব বৈশিষ্ট্যের স্মরণ বৃষ গ্রীক দেবরাজ জিউস (Zeus) এর অনুগামীদের অন্যতম এবং তিনি (জিউস) য়ুরোপার রূপমুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করবার জন্য একদা ধারণ করেন বৃষের রূপ।[২৩] প্রাগুক্ত গ্রীক দেবতা ডায়োনিসস্‌ও প্রায়ই পরিগ্রহণ করতেন বৃষের আকার এবং 'ষণ্ড', 'ষণ্ডাকৃতি', বৃষমুখ, 'বৃষশৃঙ্গযুক্ত' ইত্যাদি শব্দ ছিল তাঁর অভিধা। তাঁকে পূজাও করা হত তাঁর ষণ্ডাকৃতি মূর্তি নির্মাণ করে।[২৪] অনাবৃষ্টির অবসান কামনা করে জুন মাসের শেষে কিংবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে প্রাচীন এথেন্সে ষণ্ড বলি দেওয়া হত জিউসের সম্মুখে।[২৫] একই কারণে উক্ত দেবতার উদ্দেশ্যে ষণ্ড বলি দেবার রেওয়াজ ছিল ম্যাসেডোনিয়াতে।[২৬] বলা বাহুল্য, বলি প্রদত্ত বৃষ ছিল শস্যদেবতার প্রতীক। বৃষ সম্পর্কে এক প্রকার বিশ্বাসের নজীর আছে গিনি, কাশগড় এবং আনামেও।[২৭] পারস্য থেকে রোম পর্যন্ত একদা পূজিত ইন্দো-ইরানীয় দেবতা মিথ্রার (Mithra, বৈদিক মিত্র) অনুসারীদের ষণ্ড বলি ছিল বিশিষ্ট ধর্মীয় আচার এবং এই আচার উদ্ভবের পটভূমিকায় ছিল শস্যদেবতা আর বৃষের অভিন্নতায় প্রাচীন বিশ্বাস।[২৮] বৃষনিধন রত মিথ্রার মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে প্রাচীন ভাস্কর্যে।[২৯] পবিত্র বৃষের রক্ত মোক্ষণ, এ বিশ্বাস প্রবল ছিল মিথ্রার ধর্মে (Mithraism)। পবিত্র পশুর মাংস ভক্ষণ ও রক্তপান করলে তার বিশেষ ক্ষমতা লাভ করা যায় এই সংস্কার থেকে উদ্ভব হয়েছে দেবতার সম্মুখে উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস ভক্ষণ ও রক্তপানের প্রথা।[৩০] তাই প্রাক অলিম্পীয় গ্রীক ধর্মীয় আচারের অনেকাংশই বন্যবৃষের অপরিসীম অপার্থিব শক্তির সংগে সম্পৃক্ত।[৩১] ক্রীটের রাজা মাইনস (Minos) এর ষণ্ডের রক্ত ছিল পবিত্র।[৩২] সেখানকার প্রতিটি দেবগৃহের বেদীতে পাওয়া গেছে উক্ত প্রাণীর মস্তক আর শৃঙ্গ।[৩৩] ডেল্‌ফিতে (Delphi) উৎসর্গীকৃত ষণ্ডকে

বলা হত 'পবিত্রকারী', কারণ সে শুধু পবিত্রই ছিল না, পবিত্রতাদানের ক্ষমতা সম্পন্ন বলেও বিবেচনা করা হত তাকে।[২৯]

পুরাকালীন গ্রীসের আর একজন দেবতা পোসাইডন (Poseidon)। ইনি জলাধিপতি বা সমুদ্রদেবতা। পোসাইডন পূর্বে অশ্বরূপ ধারণ করতেন, কিন্তু তাঁর বৃষরূপও সমধিক বিদিত। 'বৃষ' (Taureus) তাঁর চিরায়ত অভিধা।[৩০] 'বৃষ দেবতা', 'পৃথিবী-কম্পনকারী' তাঁর অন্যান্য নাম। একটি মৃৎপাত্রে পোসাইডনকে চিত্রিত করা হয়েছে বৃষাকৃতি সমুদ্র দেবতার ভূমিকায়।[৩১] বৃষ পোসাইডনের প্রিয় জন্তু ও বাহন। তিনিই তাকে সমুদ্র থেকে উঠিয়ে প্রেরণ করেন ক্রীটরাজ মাইনসের নিকট।[৩২] গ্রীক উপকথায় মানবরূপে বৃষের আবির্ভাবের সংবাদ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। গ্রীসের ভীম, উপদেবতা হারকুলিস্ (Hercules) পোসাইডন কর্তৃক ক্রীটে প্রেরিত অত্যাচারী, ক্ষিপ্ত বৃষকে পর্যুদস্ত করে নিয়ে যান সমুদ্র পার হয়ে মাইসিনিতে (Mycene)।[৩৩] উক্ত বৃষ যখন এথেন্সের অনতিদূরে (Marathon) এর অধিবাসীদের জীবন বিপন্ন করছিল, তখন বিনা অস্ত্রে তাকে পরাভূত করে এবং এথেন্সে টেনে নিয়ে গিয়ে দেবতা এ্যাপোলো (Apollo) এর সম্মুখে বলি দেন প্রাগুক্ত গ্রীক বীর থেসিউস্।[৩৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে বৃষ মুখ্যত শিবের বাহন বলে পরিচিত, কিন্তু কখন থেকে উভয়ের মধ্যে এই সম্পর্ক স্থাপিত হয় তার সন তারিখ সঠিক বলা সম্ভব নয়। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সংস্কৃতির বৃষ প্রতীকের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করবার মত তথ্য আজও আমরা পাইনি। সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আবিষ্কৃত 'সিল' গুলিতে উৎকীর্ণ বৃষের প্রতিকৃতির নিরঙ্গণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, অঙ্কনের স্বাধীনতা, রেখায় এবং প্রতিকৃতি গঠনে যে অনুভূতি এখানে কার্যকর, ভারতীয় তক্ষণশিল্পে তা অতিক্রান্ত হয়েছে কদাচিৎ।[৪০] প্রাপ্ত নিদর্শন দৃষ্টে মনে হয়, একশৃঙ্গ বিশিষ্ট 'ইউনিকর্ণ' (Unicorn) এর অনুরূপ বৃষ হ্রস্বশৃংগ ও ব্রাহমিনী (Brahmini) ষণ্ডের তুলনায় অধিক জনপ্রিয় ছিল।[৪১] শেষোক্ত জাতীয়

বৃষের প্রতিকৃতি বেশ কিছু সংখ্যক 'সিল' এ উপস্থিত থাকলেও হরিণ ও বৃষের বৈশিষ্ট্যসূচক প্রথমোক্ত জীবের প্রকৃত পরিচয় আজও অনির্দিষ্ট। দীর্ঘগ্রীব, লম্বকর্ণ, একশৃঙ্গ এই জীবটিকে যদিও সরাসরি বৃষ বলে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবু এশিয়ার ঘণ্ডের অনুরূপ পিতৃগণ এবং শিবের প্রিয় নীলষণ্ডের[৪২] প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা যায় তার পবিত্রতা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবার জন্যই হয়ত শিল্পী প্রজনন ক্ষমতার জন্য সর্বাধিক খ্যাত হরিণ (ঋষ্য) এবং একই ক্ষমতা সম্পন্ন বৃষের সমন্বয়ে রূপ দিয়েছেন এই একশৃঙ্গ জন্তুটির।

বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন ছিল পিতৃতান্ত্রিক, কিন্তু প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে ভূরি ভূরি তথ্য রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় আদিম যুগের বিশ্বাস সঞ্জাত পশুদের, বিশেষ করে ষণ্ডের অতিপ্রাকৃত ব্যক্তি অতিক্রান্ত ক্ষমতা পরিগ্রহণের প্রবণতা অটলভাবে বিদ্যমান ছিল পুরুষ দেবতাদের মধ্যে।[৪৩] বেদে ইন্দ্রসহ একাধিক দেবতা বৃষ আখ্যায় সম্বোধিত বা উল্লিখিত। যথা, অগ্নি, দ্যৌ, সূর্য, রুদ্র, পর্জন্য প্রভৃতি।[৪৪] অথর্ববেদে ইন্দ্রকে বৃষ বলে সম্বোধন করা হয়েছে,[৪৫] এবং শতপথ ব্রাহ্মণে বৃষ ইন্দ্রের একটি রূপ।[৪৬] যজ্ঞে ইন্দ্রের উপস্থিতি ঘোষিত হত বৃষের গর্জনের মাধ্যমে।[৪৭] ঋগ্বেদে পর্জন্যকে বৃষ্টিবাহী মেঘের সংগে সমীকরণ করে তুলনা করা হয়েছে সব কিছুকে গর্ভবতী করতে পারংগম ষণ্ডের সংগে।[৪৮] রুদ্রও বর্ণিত হয়েছেন বৃষ পরিচয়ে।[৪৯] অপর দিকে আর্য স্ত্রীদেবতাদের অনেকে যথা, আদিতি, উষা, পৃথিবী প্রভৃতিকে 'গো' বা গাভী আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে বেদে,[৫০] যার দরুণ সময় সময় 'গোজাত' বলে বর্ণিত হয়েছেন দেবতারা।[৫১] অতএব বলা যায়, আদিম আর্যরা ছিল 'মাদার গডেস' এর উপাসক এবং আদি বৃষ ছিল তাঁর স্বামী স্থানীয়। পিতৃতান্ত্রিকতার আধিপত্যের দরুণ স্ত্রীদেবতাদের গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও 'মাদার গডেস' এর স্মৃতি নিহিত থেকে যায় বৈদিক ধর্মে এবং তাঁর প্রতিভূ গাভী দেবত্ব লাভ করে নিষেধিত হয় 'অঘ্ন্যা' অর্থাৎ অবধ্য জন্তু হিসাবে।[৫২] কিন্তু একই সময়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত পুরুষদেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষকে যজ্ঞে বলি দেবার জন্য

উপস্থিত করা হয়েছে পশুশক্তির উপর উক্ত দেবতার বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ। গৃহ্য সূত্রে উল্লিখিত এই যজ্ঞের নাম 'শূলগব'।[৩৪]

কৃষিভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্বে আর্যরা ছিল পশুচারণকারী এবং পশুমাংস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। পশু যাগ-এরই ফলশ্রুতি। বলি বা যজ্ঞ আর্য অনার্য উভয় ধারা সম্ভূত, ক্রমে একটি বিস্মৃতে হয় তাদের সমাহারে।[৩৫] অতিথিকে বৃষদানের কথা উল্লেখ রয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে।[৩৬] তার প্রীত্যর্থে গোবধ করে তার শূল্যপক্ক মাংস দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করা হত বলে অতিথির নামকরণ হয় 'গোঘ্ন'।[৩৭] যজ্ঞে ইন্দ্রকে দান করা হত আটটি ষণ্ড, যজমান তার প্রসাদ পেত।[৩৮] অগ্নিকে আবাহন করা হত যজ্ঞে বৃষ ও গো বাচক সম্বোধনে।[৩৯] শূলগত যজ্ঞ গ্রামের বাইরে অনুষ্ঠানের যে বিধান রয়েছে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে[৪০] আর পারস্কর গৃহ্যসূত্রে গোশালায়,[৪১] তা অনার্য আচার ও রীতির প্রভাবসঞ্জাত। এই যজ্ঞ থেকে শিব পেলেন বৃষ ও শূল, বৃষ হল শিবের নিত্যসংগী, বাহন।[৪২]

বৃষ কৃষির সহায়। 'বৃষ' শব্দের ধাতুগত অর্থ 'বর্ষণ', 'শুক্রও জীব'ও।[৪৩] অযোনিসম্ভূ রূপী বৃষ ছিল শস্যের আত্মার মূর্ত রূপ।[৪৪] প্রথমে বৃষবলি দেওয়া হত বর্ষণ কামনায়, তার মৃতদেহ দিয়ে অনুষ্ঠিত হত চাষের মহরত।[৪৫] 'বল' দেবতার নিকট বৃষবলি, চীনে কাপেরের বৃষ দাহ এবং পশ্চিম বাংলায় বৃষ উৎসর্গ প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য সুবৃষ্টি আর সুফলন।[৪৬] গৃহ্যসূত্রে গোদোহকের সময় শূলগত যজ্ঞের বিধান,[৪৭] এ অনুষ্ঠানের কৃষি ঘনিষ্ঠতার সুস্পষ্ট ইংগিত। শূলগত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হত শরৎ ও বসন্তে, অর্থাৎ পূর্ণ কৃষি কাজের সময়। অনুষ্ঠানটিতে পশু, ভূমি আর শস্যের ঘনিষ্ঠতা যেমন প্রকট, তেমনি কর্ষণ-প্রজননের অভিন্নতার ধারণা সৃষ্টি এক বিধি ও কৃত্যও। ভারতে একদা বিস্তৃত আদিম সমাজের টোটেম ছিল বৃষ। বৈদিক শূলগত যজ্ঞ সেই অতীতকালীন টোটেম উপাসনারই প্রতিচিত্র। শ্রাদ্ধের পিণ্ডে শস্য ও অন্নের সাথে গোমাংস প্রদান, মৃতদেহের চারপার্শ্বে

রাজগবীর মাংস ছড়ানো প্রভৃতি বৈদিক সংস্কারে রয়েছে অনার্যবহুতা সংস্কৃতির প্রভাব।[৬]

বৃষ যৌন প্রতীক। নিহত এপিস্ ষণ্ডের লিংগের মাহাত্ম্য ইতি-পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৃষ ও লিংগ একত্রে যুক্ত ছিল নিনিপের সংগে।[৭] পশুপালনের যুগে গোরক্ষার প্রয়োজনে বৃষের প্রজনন ক্ষমতা তার প্রাধান্যলাভের অন্যতম কারণ। শিব যেমন প্রজনন দেব, বৃষ তেমনই প্রজনক জীব।

ঋগ্বেদে একাধিক দেবতার বৃষ পরিচয় ভারতীয় ধর্মে পবিত্র জীব-হিসাবে স্বীকৃতি লাভে সহায়তা করেছে বৃষকে। প্রাণীপূজা যখন দেবপূজায় উন্নীত হয় তখন পশু কোথাও দেবতার বাহন, কোথাও অলংকার, কোথাও বা দেবতায় লীন কিংবা স্বয়ং দেবতায় উন্নীত।[৮] প্রাচীন মিশরীয় বিশ্বাসে বৃষ ছিল অসিরিসের আত্মা।[৯] ভারতীয় বৃষও আত্মাযুক্ত, বাহন-রূপে বৈদিক যজ্ঞে সম্বোধিত,[১০] পুরাণে সে শিবানুচর নন্দী হিসাবে স্বীকৃত (নন্দী নাম পশাধিপঃ)।

শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী রুদ্রশক্তি লাভের উপায় ষণ্ড বলি।[১১] বৃষোৎসর্গে রুদ্র্যাধ্যায় ও রুদ্র মন্ত্র অবশ্য পাঠ্য।[১২] বৃষ শিবের বাহন, কারণ সে যজ্ঞের অর্ঘ্য বহনকারী।[১৩] পশুপালক ও কৃষক আর্যদের প্রাচীনতম ধন ও দক্ষিণা বৃষ।[১৪] আর্য ও অনার্য, উভয় সমাজে জীবন-সংগ্রাম ও প্রয়োজনের খাতিরে বৃষ প্রথমে হয় পবিত্র জীব, শেষে সাধিত হয়েছে জীব ও দেবতায় অভিন্নতা।[১৫] হ্যাথর-নূর অনুরূপ শিব হন বৃষ, শিবানী গোমাতা। শিব পেলেন স্থায়ী বাহন, বৃষ পেল দেবত্ব।

বৃষের দেবত্বপ্রাপ্তি এবং শিবের বাহনরূপে তার স্বীকৃতিলাভ হয়েছে ক্রমে ক্রমে, একদিনে নয়। মহাভারতে দেখা যায় শিব ছিলেন ঐরাবত-বাহন, পরে হন বৃষবাহন।[১৭] জীবপূজা ও প্রাণীপূজার দেশ দেশান্তরে

ব্যাপ্তি আদি অস্ট্রেলীয় সভ্যতার দান এবং বৃষের দেবত্ব এই অনার্য সংস্কৃতিজাত।[১৮]

মহাভারত অনুযায়ী শিব রজত গিরিনিভ, অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ। তাঁর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে শ্বেত বস্ত্র, শ্বেতমাল্য, শ্বেত ষণ্ড এবং শ্বেত ধ্বজ।[১৯] কাল পরিচালিত শিবের বাহন শ্বেত ষণ্ড ঋক্ষ এবং পক্ষের ধ্বান।[২০] তুষারাচ্ছাদিত পর্বতসদৃশ ককুদযুক্ত, পৃথিবী বিদারণকারী প্রস্তর-কঠিন তীক্ষ্ণশৃংগ বিশালস্কন্ধ, মসৃণ দেহ স্বর্ণসূত্র দ্বারা বেষ্টিত কণ্ঠ শিবের বৃষের উল্লেখ করেছেন মহাকবি কালিদাস।[২১] মনু বলেন, বৃষ ধর্ম এবং যারা ধর্মস্বরূপ বৃষকে নিবারণ করে তারা 'বৃষল', অর্থাৎ বৃষ হত্যাকারী।[২২] বৃষ ন্যায় বিচারের আদর্শ নমুনা, তার শরীর পরমেশ্বর, তার প্রতিটি গ্রন্থিতে ধর্মের অধিষ্ঠান, তার তিন শৃংগে তিন বেদ এবং তার লাংগুল যেখানে শেষ সেখান থেকে অধর্মের আরম্ভ।[২৩]

আর্য ধর্মে অনার্য দেবতা শিব পশুপতির অন্তর্ভুক্তি শুধু পশুদের উপর তাঁর প্রভুত্ব সূচিত করে না, আদি স্ত্রী দেবতার উপরেও। অথর্ববেদে 'মহাবৃষভ' বা 'মহাবৃষ' জাতির[২৪] উল্লেখ থেকে মনে হয় এ নাম তারা গ্রহণ করেছিল রুদ্রের প্রতীক বৃষ থেকে, কারণ রুদ্র স্বয়ং বৃষভ, গোপতি এবং গোমৃগ শিকার তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।[২৫] অতএব দেখা যাচ্ছে, আদি স্ত্রী দেবতার উর্বরতার উৎস উপরোক্ত পশুদেবতাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করে রুদ্র তাকে পর্যবসিত করেছেন যজ্ঞে বলির পশুতে এবং একই সংগে তার সংগে স্থাপন করেছেন একরূপতাও, যার জন্য তিনি পরিচিত হয়েছেন বৃষ, মহাবৃষ, বৃষধ্বজ, বৃষবাহন প্রভৃতি নামে।

আস্তিকতাবাদী ধর্মে উপাস্য হিসাবে বৈদিক বিষ্ণু আবির্ভূত হন তাঁর মধ্যে সংরক্ষিত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম ও অগ্নির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।[২৬] আর তার সাথে আদি বৃষের সংগে এইসব দেবতার অভিন্নতা নিয়ে সূর্যরূপী বিষ্ণুর আকৃতি বৃষের, সুর্য ও বৃষ আখ্যায় অভিহিত।[২৭] অতএব বিষ্ণু হলেন

বৃষ, বৃষপ্রিয়, বৃষোদর, বৃষের অনুরূপ চক্ষু আকৃতি ও ধর্মবিশিষ্ট, কারণ তিনি 'গোহিত', 'বৃষপ্রিয়' 'গোপতি' এবং গো-পিতৃ।[১৮] আদি বৃষের সংগে অভিন্নতা সত্ত্বেও অতীতের পশুদেবতা আজ পুরুষ দেবতায় রূপের পরিসমাপ্তি ঘটেনি বর্তমান যুগেও। এই সময় বিষ্ণুর অবতার রূপী কৃষ্ণ পরাভূত ও বধ করেন অরিষ্ট নামক এক বৃষ দানবকে।[১৯] এইভাবে পৌরুষের আদর্শ আদি বৃষের সংগে অভিন্নতা স্থাপন আর তাকে পরাভূত করে বিষ্ণু হন 'মানব সভ্যতা' রূপী লক্ষ্মী, শ্রী, পৃথিবী প্রভৃতির অধিকর্তা বা পতি।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন,[২০] দেবতা, তাঁর বাহন ও আয়ুধ অভিন্ন। প্রাচীন ভারতে এই বিশ্বাস প্রবল থাকায় শিবের বাহন বৃষ শুধু পবিত্র জন্তু নয়, উন্নীত হয়েছে দেবত্বেও। শিবের প্রতীক হিসাবে তার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ হয়েছে ইন্দো-গ্রীক কুষাণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের মুদ্রায়।[২১] সে স্থান লাভ করেছে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশিচক্রে এবং একটি বার্হস্পত্য সম্বৎসরের নাম করণ করা হয়েছে বৃষ।[২২] শিবের বাসস্থান কৈলাসের অন্যতম প্রহরী বিবেচনায় শিব মন্দির অভিমুখী বৃষের উপবিষ্ট মূর্তি নির্মাণই শুধু শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করেনি স্থাপত্যশিল্পে দু'প্রকার মন্দিরের নামকরণও করা হয়েছে 'বৃষ' আর 'নন্দী'।[২৩] রাজ্য দেবাংশজাত এই ধারণা পুষ্ট হওয়ার ফলে রাজপ্রমুখ বা রাজচক্রবর্তীর যোগ্যতা আরোপ করবার জন্য 'বৃষ' শব্দটির প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রাজা পৃথিবীর অধীশ্বর, অর্থাৎ ভূপতি এবং পৃথিবীর একটি সাধারণ অভিধা হল 'গো'। এই কারণেই অভিষেকের সময় রাজার সিংহাসনের নিকটে রাখা হত মালা ও বস্ত্রাভরণে সজ্জিত একটি শ্বেতবর্ণ বৃষ।[২৪] এক আরও লক্ষণীয় যৌন ক্ষমতা বা শারীরিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ না থেকে 'বৃষ' শব্দটির তাৎপর্য কালক্রমে উন্নীত হয়েছে আরও উচ্চস্তরে-আত্মসংযম ও শুচিতায়।[২৫] তাই, 'বৃষ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে দু'জন মহামানব বুদ্ধদেব আর প্রথম জৈন তীর্থঙ্করের ক্ষেত্রে প্রথম জন শাক্যপুংগব, দ্বিতীয়জন ঋষভনাথ। শেষোক্তজন আবার বৃষ-বাহনও।[২৬] Foucher বলেন, বৃষ বুদ্ধের জন্মের সংগে জড়িত, কারণ তাঁর জন্মলগ্নে চন্দ্র অবস্থান করছিলেন বৃষ রাশিতে।[২৭]

পবিত্র পশু হিসাবে বৃষ সম্পৃক্ত হয়েছে বোধিসত্ত্বের সংগে। একাধিক জাতকে, যেমন নন্দিবিলাস জাতক, কৃষ্ণ জাতক এবং নুনিক জাতকে বর্ণিত হয়েছে বৃষরূপে জন্ম বোধিসত্ত্বের কাহিনী।[৮]

কৃষি সভ্যতার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বৃষের জনপ্রিয়তার প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন পাওয়া গেছে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত অসংখ্য পোড়া-মাটির প্রতিকৃতিতে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ বৃষ মূর্তির কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। প্রায় সমকালীন বা তৎপূর্ববর্তী বেলুচীস্তানের কুল্লি, নাল এবং ডোব উপত্যকার সংস্কৃতিতে বৃষের চিত্রিত এবং পোড়ামাটির প্রতিকৃতি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।[৯] আনু-মানিক খৃঃ পূঃ ২৮৫০ শতাব্দীর মোথাল সংস্কৃতিতেও সিন্ধু সভ্যতার অনুরূপ বৃষ জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ রয়েছে সেখানে আবিষ্কৃত একাধিক 'সিল' এবং পোড়ামাটির প্রতিকৃতিতে।[১০] হ্রস্বশৃংগ ও বক্ষযুক্ত দেহধারী বৃষ এবং ব্রাহ্মিনী ষণ্ডের পেশীর সুবিন্যাস আর রাজকীয় চেহারা সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে নিদর্শনগুলিতে। ষণ্ডের বিপুল দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে তার বিশাল শৃংগ আর বৃত্তিকাচুড়ী গলকম্বলে। প্রাচীন হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী-খৃঃ অঃ ১১শ শতাব্দী) থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অন্যান্য পুরু সামগ্রীর মধ্যে পোড়ামাটির প্রচুর বৃষমূর্তি।[১০ক] অপেক্ষাকৃত প্রাচীন নিদর্শনগুলির 'মডেলিং' এ শিল্পীর নৈপুণ্য আর কল্পনাশক্তি বিস্ময়-কর। ককুদযুক্ত বৃষমূর্তির সংখ্যাও মোটেই অপ্রচুর নয়। বৃষ মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তক্ষশীলাতেও।[১০১] একটি পিত্তল বলয়ের ফাঁকের মধ্যে উৎকীর্ণ বৃষমূর্তি ছাড়াও ককুদযুক্ত বৃষের প্রতিকৃতি খোদাই করা একাধিক 'সিল' এবং মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে এখানে।

গাংগেয় উপত্যকায় অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান খননের সময় পাওয়া প্রচুর সংখ্যক পোড়ামাটির বৃষমূর্তি পবিত্র জন্তু হিসাবে বৃষের জন-প্রিয়তার সমর্থক। এসব স্থানে আবিষ্কৃত সিলগুলিতে বৃষের প্রতিকৃতি এবং পোড়ামাটির মূর্তি নিঃসন্দেহে শিবের প্রতীক। খেলনা হিসাবেও এগুলি

ব্যবহার হত অনুমান করা অন্যায় হবে না মোটেই। এগুলি খৃষ্ট পূর্ব তিন শতক থেকে খৃঃ অব্দ সাত শতকের।

পোড়ামাটির সিলে প্রতীক হিসাবে উৎকীর্ণ বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে বেসাঢ়ে।[১০২] সারনাথে আবিষ্কৃত একটি বৌদ্ধ রেলিং বা স্তূপের পদ্মাকৃতি ছত্রের কেন্দ্রের চারপাশে উঁচু 'বর্ডারে' অন্যান্য পশুর মধ্যে রয়েছে বৃষ।[১০৩] তাছাড়া, স্তম্ভগাত্রে অলংকরণের উপাদান হিসাবে বৃষ মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে এখানে।[১০৪] এলাহাবাদের অনতিদূরে ভিটায় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত প্রত্ন সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ককুদযুক্ত বৃষের দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট অবস্থার প্রতিকৃতি।[১০৫] মৌর্য রাজশক্তির কেন্দ্র পাটলিপুত্রের কুমরাহার থেকেও পাওয়া গেছে বৃষের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ প্রতিকৃতি।[১০৬] বাসাঢ় বা প্রাচীন বৈশালীতে বৃষ একদা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির এবং 'সিল' এ উৎকীর্ণ বৃষমূর্তি।[১০৭] এগুলি সবই ককুদযুক্ত বৃষ, উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রদর্শিত। অনুরূপ বৃষমূর্তি পাওয়া গেছে বেসনগরে।[১০৮] সারনাথের ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মসৃণ পাথরে তৈরী বৃষের মস্তক, পা, খুর এবং তার উপবিষ্ট বৃষের পশ্চাদ্ভাগ।[১০৯]

ভারতীয় ভাস্কর্যে বৃষ শিবের বাহন। খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত শিবের একক বা উমাসহ মূর্তিতে বৃষ উক্ত দেবতার বাহন স্বরূপ উপস্থিত। মূর্তিফলকে তার স্থান সাধারণতঃ পাদপীঠে, শিবের পদতলে উপবিষ্ট অবস্থায়, যেমন উমা-মহেশ্বর, উমা-সহিত, কল্যাণসুন্দর, অর্ধনারী, নটরাজ প্রভৃতি মূর্তিফলকে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপবিষ্ট হর-পার্বতীর আসন স্থাপিত হয়েছে বৃষের পৃষ্ঠে। বৃষপৃষ্ঠে আসীন কিংবা বৃষপাত্রে হেলান দিয়ে দণ্ডায়মান শিবের একক এবং পার্বতী সহ মূর্তিও পাওয়া গেছে অনেক।[১১০] উমা-মহেশ্বর বা উমালিঙ্গন মূর্তিতে শিবের পদ্মপাদপীঠ বৃষের পৃষ্ঠে স্থাপিত,[১১১] উমা-সহিত মূর্তিতে শিব দুর্গার আসন

বৃষের পৃষ্ঠে নৃত্য,[১১২] কল্যাণসুন্দর বা শিববিবাহমূর্তো পাদপীঠের এক-পার্শ্বে উপবিষ্ট বৃষ অপর পার্শ্বে সিংহ।[১১৩] একাধিক নিদর্শনে অর্ধনারীশ্বর শিব বৃষপৃষ্ঠে হেলান দিয়ে ত্রিভংগঠামে দণ্ডায়মান।[১১৪] শিবের নটরাজ মূর্তিতে বিশেষ করে, বাংলাদেশের নিদর্শনগুলিতে বৃষও নৃত্যরত,[১১৫] কিন্তু তার প্রতিকৃতি সত্যই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেখানে শিব সংহার মূর্তিতে উপস্থাপিত। যেমন অঘোররুদ্র মূর্তি।[১১৬] এখানে বহুভুজ শস্ত্রপাণি দৈত্য নিধন রত শিবকে সহায়তা করছে বৃষ তার তীক্ষ্ণশৃংগ দ্বারা একজন দৈত্যকে ভূপাতিত করে। ক্রোধে তার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত নাসা স্ফীত, লাংগুল উৎক্ষিপ্ত। সংগ্রামরত বৃষের যথাযথ রূপায়নের ফলেই শিবের অঘোররুদ্র মূর্তি বিষয়বস্তুর নাটকীয়তা শিল্পরসোত্তীর্ণ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না মোটেই।

শিব একজন অতিশয় জনপ্রিয় দেবতা। তাঁর মূর্তি সংখ্যার অনুরূপ প্রাচুর্য তাঁর বাহন বৃষেরও। ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত বৃষের একক মূর্তি সংখ্যায় অগণ্য। ধাতব মূর্তিগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি, তবে বৃহদাকার নিদর্শনের অভাব নেই। যেমন চম্বার দেবী মন্দিরের দু'ফিট উচ্চ বৃষের পিত্তল মূর্তি।[১১৭] এখানে উচ্চতার অনুপাতে বৃষমূর্তি যথাযথভাবে নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছেন শিল্পী। নিদর্শনটিতে শিবের বৃষের বিশালতা এবং অমিত শক্তি, উভয়েরই অভাব। দশাবতার নামক ইলোরার গুহা মন্দিরে (১৫শ) প্রস্তর নির্মিত উপবিষ্ট হ্রস্বশৃংগ বৃষমূর্তি অতন্দ্র প্রহরীর একটি যথার্থ প্রতিচ্ছবি।[১১৮] তার সুউচ্চ ককুদে, হৃষ্টপুষ্ট দেহে অমিত বিক্রমের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। খৃঃ ৮ম শতাব্দীর এই নিদর্শনটি যেমন বাস্তব তেমনি জীবন্ত। মামল্লপুরমের সমুদ্রতীরবর্তী মন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরের দেওয়ালের উপর স্থাপিত বৃষের অসংখ্য পূর্ণাবয়ব মূর্তির তাৎপর্য মোটেই দুর্বোধ্য নয়। পবিত্র পশু বৃষকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে মন্দিরের সৌকর্য বৃদ্ধির উপকরণ হিসাবে। এগুলি শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি।[১১৯] শিবের অনুচর এবং প্রহরীর ভূমিকায় উৎকীর্ণ বৃষ মূর্তি রয়েছে উপমহাদেশের একাধিক বিখ্যাত মন্দিরে।

বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী বৃষ হিন্দু মন্দিরের দ্বার রক্ষক, কিন্তু গঙ্গা-যমুনা বা কুবের লক্ষ্মীর অনুরূপ তার মূর্তি প্রবেশ তোরণে উৎকীর্ণ না করে স্থাপন করা হয়ে থাকে মন্দির চত্বরে বা মণ্ডপে একটি উচ্চ বেদীর উপর মন্দির অভিমুখী করে। খাজুরাহোর কন্দরীয় মহাদেব মন্দির এবং উদয়পুরের নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরে প্রহরীর সতর্কতায় উত্তোলিত মস্তক বৃষের বৃহদাকার মূর্তি এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।[১০] তানেশ্বরের বৃহদীশ্বর মন্দিরের মণ্ডপে স্থাপিত বৃষমূর্তি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।[১১]

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন বলা যেতে পারে বৃষ নগণ্য জীব নয়। তার একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস আছে। অতি প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন জাতির ধর্মবিশ্বাসে সে একটি ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং কালক্রমে সে উন্নীত হয়েছে দেবতার বাহনে, এমনকি তার প্রতীক এবং দেবত্বেও। কৃষির সহায়ক এবং উর্বরতার উৎস হিসেবেও তাকে যুক্ত করা হয়েছে প্রাচীন যুগের একাধিক 'মাদার গডেস' এর সংগে। তাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে অনেক কৃষি আচার ও কুতোর। পবিত্র পশুহিসাবে তার স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে বৈদিক এবং উত্তর বৈদিক সাহিত্যে ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের মুদ্রায় বৃষের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। পবিত্র জন্তু এবং দেবতার (শিবের) প্রতীক হিসাবে লিংগ-যোনীর অনুরূপ বৃষ স্থানলাভ করেছে এইসব এবং পরবর্তী কালের একাধিক রাজার মুদ্রায়। তার দেবত্ব লাভ কৃষি এবং অনার্য সভ্যতা সম্ভূত এবং অনার্য সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের অনুরূপ বৃষের পবিত্রতাও সংক্রামিত হয়েছে আর্য ধর্ম ও আচারে। তার জনপ্রিয়তার সমর্থন রয়েছে বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে প্রাপ্ত তার অসংখ্য প্রতিকৃতিতে। দেবতার বাহন ও নিত্যসংগী হিসাবে সে স্থান লাভ করেছে ভারতীয় ভাস্কর্যেও। অতএব বৃষকে নিছক ষাঁড়, ষণ্ড কিংবা বলীবর্দ বলে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না মোটেই। ব্যংগাত্মক 'ধর্মের ষাঁড়' নামে বিদিত হলেও সে বেদে একাধিক মুখ্য দেবতার প্রতিরূপ, "মহাভারতে কৃষ্ণ, পুরাণে চতুষ্পাদ ধর্ম, বৌদ্ধ সাহিত্যে

বুদ্ধ, তন্ত্রে মদ-ক্রোধ ও দেহপিণ্ডে অনাহত নাদধ্বনি, কাব্যসূত্রের অন্যতম প্রবক্তা এবং লোকবিশ্বাসে নন্দী"।[১২]

টীকা

১। L. R. Furnell, Greece and Babylon, Edinburgh, 1911. pp. 252-53.

২। J. G. Frazer, The Golden Bough : Adonis and Osiris, London, 1907, p. 97.

৩। Andre Goddard, The Art of Iran, London, 1965, p. 51.

৪। Larousse Encyclopadia of Mythology (LEM). London, 1959, p. 56.

৫। Erich Neumann, The Great Mother, New York, 1955, p. 271.

৬। Asis Sen, Animal Motifs in Ancient Indian Art (AMAIA), Calcutta, 1972, p. 56 pl. XII. 17.

৭। Ibid.

৮। Ibid.

৯। Sir John Marshall, Mohenjo-daro and Indus Civilization, 3 Vols. London, 1931. p. 54.

১০। AMAIA, p. 56.

১১। J. G. Frazer, Spirits of the Corn and of the Wild (SCW), 2 Vols., London, p. 34.

১২। D. A. Mackenzie, Myths of Crete and Pre-Hellenic Europe, London 1917, p. 185.

১৩। AMAIA, p. 57.

১৪। LEM. p. 326.

১৫। AMAIA, p. 57 (quoted from Standard Dictionary of Folk-lore, Mythology and Legend, edited by M. Leach and J. Fried, New York, 1950, p. 733).

১৬। AMAIA, p. 57 (quoted from The Magical Origin of Kings by J. G. Frazer, London, p. 174),

১৭। Gilbert Murray, Four Stages of Greek Religion, New York, 1912, p. 33.

১৮। AMAIA, p. 58 (quoted from The Origin of the Cross by Swami Satynda, Calcutta, pp. 171-72).

১৯। SCW, p. 34,

২০। Lewis Spence, The Myths of Ancient Egypt, London, 1915, p. 284.

২১। Ibid, p. 288.

২২। Gilbert Murray, Op. cit, p. 33.

২৩। Ibid, p- 34-35.

২৪। SCW, Vol, I, p. 16,

২৫। Ibid, Vol, II, p. 4.

২৬। Ibid, p. 7

২৭। Ibid, p. 9.

২৮। Ibid, Vol. II, p. 10.

২৯। LEM. See figs. on p. 325.

৩০। Gilbert Murray, Op. cit, pp. 35-36.

৩১। Ibid. p. 34.

৩২। Ibid.

৩৩। Ibid.

৩৪। Ibid.

৩৫। Jane Harrison, Myths of Greece and Rome, London, 1927, p. 58.

৩৬। Ibid.

৩৭। C. Witt, Myths of Hellas, London, 1915, p. 122.

৩৮। LEM, p. 196. fig. on p. 192.

৩৯। C. Witt, Op. cit., pp. 184-85.

৪০। N. G. Majumdar, Explorations in Sind (Memoirs of the Archaeological Survey of India), No. 48, Delhi, 1938, p. 52.

৪১। AMAIA, p. 58 ; Mohenjo-daro and Indus Civilization, Op. cit., Vol. III, pl. CX. 261-297 ; pl. CXI. 326-340.

৪২। E. W. Hopkins, Epic Mythology, (EM), Strassbury, 1915, p. 32.

৪৩। AMAIA, p. 60.

৪৪। ঋগ্বেদ, রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ, কলিকাতা, ১৯০৯, ৭।২০।৫, ৭।৪৯।১, ৮।৬।৪০, ৮।৩৩।২, ১০, ১১; ৮।২০।৭, ৮।২০।৯, ৯।৪৭।৭, ১০।২৮।২, ১০।৯২।৪, ১০।১৮।১১, ৭।৩।৩, ৭।৫।২, ৮।২০।১৬, ৮।৬১।১৩, ১০।৩।৪, ১০।৮।১, ১০।২১।৮, ১০।১২২।৪, ১০।১৮৭।১, ১০।১৮৯।১, ১।৭৪।৩, ১।১৫৪।৩, ২।৩৩।১৫, ৬।৪১।৬।

৪৫। অথর্ববেদ (R. T. H. Griffith এর ইংরেজী অনুবাদ, বারাণসী ১৯৬৮) ১।২১।১, ৪।১১।১, ২, ৬; ৫।৩।৮, ৬।৪৮।১, ৬।১৮।৩, ৮।৫।২২।

৪৬। শতপথ ব্রাহ্মণ (Sacred Books of the East Series, translated by D. J. Eggeliog, Oxford, 1882), ২।৫।৩।১৮

৪৭। পূর্বোক্ত।

৪৮। ঋগ্বেদ, ৭।১০১।৬

৪৯। ঋগ্বেদ, ২।৩৩।১৫

৫০। A. A. Macdonell, Vedic Mythology, Strussburg, 1898, p. 150.

৫১। Ibid, p. 151.

৫২। Ibid.

৫৩। R. G. Bhandarkar : Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, Strussburg, 1913, p. 105.

৫৪। শুদ্ধদাস ভট্টাচার্য—বাংলা কাব্যে শিব, কলিকাতা, ১৯৬১, ৫১ পৃঃ।

৫৫। Abinas Chandra Das, Rgvedic Culture, Calcutta & Madras, 1925, p. 205.

৫৬। 'গোষ্ঠ' শব্দের অর্থের জন্য দ্রষ্টব্য : শব্দকল্পদ্রুম, শ্রীরাধাকান্ত দেব বিরচিত, কলিকাতা সংবৎ ১৯৩১, পৃঃ ১০৩৩।

৫৭। ঋগ্বেদ, ১০।২৭।২, ১০।৮৬।১৪।

৫৮। ঋগ্বেদ, ৮।৪৩।১১।

৫৯। R. G. Bhandarkar, Op. cit. p. 105.

৬০। Ibid.

৬১। বাংলা কাব্যে শিব, ৫১ পৃঃ।

৬২। M. Monier Williams, Sanskrit-English Dictionary, Oxford, 1899, p. 1011.

৬৩। SCW, Vol. II, p. 4.

৬৪। SCW Vol. II, pp. 4-5.

৬৫। বাংলা কাব্যে শিব, ৫১ পৃঃ; SCW, Vol. II, pp. 10-11.

৬৬। R. G. Bhandarkar, Op. cit, 105.

৬৭। বাংলা কাব্যে শিব, ৫২ পৃঃ।

৬৮। বাংলা কাব্যে শিব, ৫১ পৃঃ।

৬৯। বাংলা কাব্যে শিব, ৫০ পৃঃ।

৭০। Veronica Ions, Egyptian Mythology, Middlesex, 1968, p. 123.

৭১। ঋগ্বেদ, ১।১৭৩।২।

৭২। বাংলা কাব্যে শিব, ৫০ পৃঃ।

৭৩। বাংলা কাব্যে শিব, ৫২ পৃঃ।

৭৪। বাংলা কাব্যে শিব, ৫২ পৃঃ।

৭৫। Abinas Chandra Das, Op. cit. p. 284

৭৬। বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ ৫২।

৭৭। মহাভারত, (অনুশাসন পর্ব), প্রতাপচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ, কলিকাতা, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫১-৫৬।

৭৮। বাংলা কাব্যে শিব, পৃঃ ৫২।

৭৯। W. Fausboll, Indian Mythology According to the Mahabharata, London, 1903, p. 150,

৮০। EM, p. 223,

৮১। W, Fausboll, Op, cit, p. 150,

৮২। মনুসংহিতা, শ্রীযুক্ত ভরত চন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত, কলিকাতা সংবৎ, ১৯২৩ ৮।১৬।

৮৩। Edward Moore, The Hindu Pantheon, Varanasi, 1968 (reprint), p, 271,

৮৪। অথর্ববেদ, ৫।২২।৪-৫, ৮।

৮৫। AMAIA, p, 62,

৮৬। EM, pp, 207-08,

৮৭। EM, p, 206.

৮৮। EM, p, 206,

৮৯। EM, pp. 215, 217.

৯০। বিরূপদ ভট্টাচার্য, বৈদিক দেবতা, কলিকাতা, ১৩৫৭, পৃঃ ২৭।

৯১। Sir John Marshall, Taxila, 3 Vols., Varanasi, 1975 (Reprint), pp. 30, 31, 35, 52, 61, 67, 68, 130, 131, 797, 798, 801, 805, 806, 807, 811, 861, Archaeological Survey of India, (ASI), Annual Report, 1912-13, p, 48.

২২। Ajaya Mitra Sastri, India as seen in the Brihatsamhita of Varahamihira, Delhi, 1969, pp. 401, 480.

২৩। Stella Kramrisch, The Hindu Temple, 2 Vols., University of Calcutta 1946, p. 93.

২৩ক। Michael Edwardes, Everyday Life in Early India, London & New York, 1969, p. 121.

২৪। AMAIA, p. 63.

২৫। AMAIA, p. 63.

২৬। AMAIA, p. 63.

২৭। শ্রীগিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া, জাতকের গল্প, ঢাকা ১৯৬৪, পৃঃ ৪০, ৪৩।

২৮। Stuart, Piggott, Prehistoric India, Pelican Book, Middlesex, 1952, pp, 94, 106, figs, 6, 7, 8,

২৯। S, R, Rao, Lothal and the Indus Civilization, London, 1972, p, 93, pls, XIX, G, XXIII, B, XXV, C,

৩০। B, B, Lal, 'Excavations at Hastinapura and Explorations in the Upper Ganges Valley', Ancient India. No, 10 & 11, New Delhi, 1954-55, pp, 85-87, figs, 1, 14, 15, 17, 20, 21, 28 ; pls, XLII, A, XLIII; XLIV,

৩১। Taxila, Op, cit. pp, 177, 679-80, 682,

৩২। ASI, 1903-04, p, 106, pl. XLI, 16-17, XLII, 41,

৩৩। ASI, 1904-05, p, 80, pl, XXVII,

৩৪। ASI, 1908-09, pl, XXX, i

১০৫। ASI, 1911-12, pp. 48-57 ; pls. XVII-4, XVIII-26, 27, XXIX. 44-49, 52, 54.

১০৬। ASI, 1912-13, p. 82 (No. 8), p 83 (No. 15).

১০৭। ASI, 1913-14, pp. 126-53 ; pls. XLVI.63, 84, 120 ; XLVII. 142, 154, 227, 228, 229, 239, 248, 251, XLVIII. 397. 418. 453 ; XLIX 559, 579, 589 ; L. 685, 723, 753, 759, 769, 810.

১০৮। ASI, 1913-14, pp. 215-16, pl. LIX. 34, 35, 39. ASI, 1914-15, pp. 81-82, 84, No. 1 and 2.

১০৯। ASI, 1914-15, p. 115 ; পবিত্র, উপকারী বা মহৎ জন্তু বিধায় অশ্ব, সিংহ এবং হস্তীর অনুরূপ স্তম্ভ শীর্ষের অলংকরণ হিসাবে বৃষ মূর্তি স্থাপন প্রাক মৌর্যযুগীয় রীতি বলে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতের উত্তর প্রদেশে রামপূর্বার প্রস্তর স্তম্ভ শীর্ষের বৃষমূর্তি এবং সারনাথে অশোকের সময়ের চারটি সিংহমূর্তি যুক্ত স্তম্ভ শীর্ষের পীঠিকায় উৎকীর্ণ হস্তী, অশ্ব, সিংহ এবং বৃষ-মূর্তি। রামপূর্বার বৃষমূর্তি ত্রিমাত্রিক, বাস্তবধর্মী, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত উক্ত জন্তুর প্রতিকৃতির অনুসারী। (দ্রষ্টব্য : S. K, Saraswati, A Survey of Indian Sculpture, Second Revised edition, Delhi, 1975, pp. 28-29, pl. III. 11, 12).

১১০। V. S. Agrawala, A Catalogue of the Brahmanical Images in Mathura Art, Lucknow, 1951, p. 31 (No. D 14), p. 34 (No. 1080), p. 35 (No. 1970).

১১১। N. K. Bhattasali, Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca

Museum, Dacca, 1929, pls. XLIX, a, pl. a ;
H. Zimmer, The Art of Indian Asia (AIA),
2 vols, New York, 1955, pl. 387.

১১২। AIA, pl. 208 ; H. K. Sastri, South Indian Images of Gods and Goddesses, Madras. 1916, fig. 69 ; T. A. G. Rao, Elements of Hindu Iconography, vol. II (I), Madras, 1916, pls. XXVII, XXVIII, XXIX.

১১৩। A Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society, Rajshahi, 1919, p. 9, pl. 3.

১১৪। H. K. Sastri, Op. cit. figs. 76, 77, 80 ; AIA, pl. 256.

১১৫। N. K. Bhattasali, Op. cit., pls. XLII, XLIII, XLV.

১১৬। N. B. Sanyal, 'Aghora Rudra' Varendra Research Society's Monograph No. 5, Rajshahi, 1934, p. 32, fig. 9.

১১৭। ASI, 1902-03, p. 241, fig. 6.

১১৮। AIA, pl. 202.

১১৯। AIA, pl. 294-95.

১২০। Stella Kramrisch, Op. cit. p. 386, pl. XXXV ; p. 395, pl. LII ; p. 398, pl. LVIII.

১২১। Edward Moore, Op. cit. p. 278.

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবার প্রেম :

'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'

আমানুল্লাহ আহমদ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাতে বাংলার নবযুগের স্বরূপ ধরা পড়ে। যুগ যুগ অবধি যে ভাগ্য-বিড়ম্বিত হিন্দু বিধবা সম্প্রদায় গৃহের অন্তরালে অবহেলা ও লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে আসছিল, তারা অপ্রত্যাশিত-ভাবে এক প্রকাণ্ড ও চরম উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। ভাবতে অবাক লাগে, সেকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালী মানসে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে তা অনেকখানি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল এসব সব সংস্কারমূলক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যাদের কেন্দ্রস্থলে ছিল নারী। উদাহরণস্বরূপ সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ, বিধবা-বিবাহ আইনের প্রবর্তন এবং নারীশিক্ষা আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] নারীর প্রতি এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছে সেকালের মানুষের মূল মানসিকতা, তার সম্বলরূপ যুক্তিবাদ ও মানবতাবোধ। অন্ধ ধর্মবোধ বা আচার-নিষ্ঠা অপেক্ষা মানুষ যে বড়ো, নারীর প্রতি এই নবজাগ্রত মমতায় সে সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু এটাই উনিশ শতকী মানসিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। একদিকে যেমন যুক্তিবাদ বা উদারপন্থী মানবতাবোধ সেকালের শিক্ষিত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনি অপরদিকে তাঁদের অনেকেই প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও ঐতিহ্যের দ্বারা মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারার টানা-পোড়েনে ঐ যুগের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল।

আধুনিক ও রক্ষণশীল মনোভাবের এই দ্বন্দ্ব তৎকালীন বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে সম্যক প্রতিবিম্বিত। সেজন্য আইনসম্মত হলেও বিধবা বিবাহ সর্বজন স্বীকৃত প্রথা হিসেবে সেকালের বৃহত্তর হিন্দু সমাজে গৃহীত হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বচক্ষে দেখে গেছেন তাঁর মহত্তর কীর্তি আসলে কত অন্তঃসারশূন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ সে যুগের মানুষের সহজাত রক্ষণশীলতা এবং অধিগত যুক্তিবাদের উপরোক্ত দ্বন্দ্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকেই তাঁকে নিছক রক্ষণশীল লেখক হিসেবে নাকচ করে দেন। এর মূল কারণ বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব শিল্প প্রতিভা। তিনি এমন একজন লেখক যাঁর কল্পনা বা সৃজনশীলতা এবং নীতিবোধ গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর লেখায় একটিকে অপরটি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না এবং উভয়েরই মিলিত প্রভাবে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য নিজরূপ লাভ করেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতো একালের প্রভাবশালী লেখকরা তাঁর রক্ষণশীলতাকেই বড়ো করে দেখেছেন। রোহিণীর পরিণতি নিয়ে তিনি এমন অনুযোগ করেছেন যে, পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের গতানুগতিক হিন্দু মনোভাবই বেশী প্রকট হয়ে ওঠে।[৩] শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর এ ধরণের কাহিনীগুলির পরিণতিতে কি রকম গোঁজামিল দিয়েছেন সে কথা এখানে না বললেও চলে। কিন্তু সমস্যামূলক উপন্যাসের পরিসমাপ্তি টানতে রবীন্দ্রনাথও যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা বেশী সফল হননি তা তাঁর 'চোখের বালি' প্রমাণ করে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র যে সাংস্কৃতিক সংকটের চাপ অনুভব করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র তা থেকে মুক্তি পাননি। সাম্প্রতিক কালেও তার অবসান ঘটেনি। বরং অনায়াসে বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে যে ভাব-সংঘাত সূচিত হয়েছিল, তা কালের বিবর্তনে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেছে, আরো ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠেছে। মূল্যবোধের এই সংকট থেকে আজো আমরা নিষ্কৃতি পাইনি, আজো তা আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নানা দুরূহ সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। সুতরাং এ কালের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের

বিচার হওয়া উচিত। যদি তাঁর রক্ষণশীলতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয় তবে তাঁর নিজ প্রতিভার স্বরূপ সম্পূর্ণ বোঝা যাবে বলে আমার মনে হয় না। তিনি রক্ষণশীল ত বটেই, তবে তাঁর উপর পাশ্চাত্য প্রভাবও কম গভীর ছিল না। তিনি শেষ বয়সে নাবাবলী গায়ে দিতেন, হবিষ্যান্ন খাওয়ারও চেষ্টা করতেন। কিন্তু যৌবনে কোঁতে, মিল প্রমুখ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের দ্বারা সমধিক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এমন কি এক সময়ে নাস্তিকতা নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিলেন।[৩] বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং তাঁর রচনায় সেকসপিয়র, মিল্টনের ন্যায় লেখকদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর যা কখনও কখনও দাম্ভিকতার কোঠায় গিয়ে ঠেকত। সেকালে হিন্দু ধর্ম একদিকে খৃষ্টান এবং অপরদিকে ব্রাহ্ম সমাজ ও ইয়ংবেঙ্গলদের প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। এ সকল ভাবতরঙ্গের আঘাতে তাঁর নিজ ধর্ম ও সমাজ বিলুপ্ত হয়ে যাক বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় তা চাননি। সেজন্য কিছুটা ব্যক্তিগত কারণে, কিছুটা নিজ ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বশত তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা রোধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি নিজেও ধর্ম সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে হিন্দু ধর্মের এমন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা একেবারে নতুন। কিন্তু অহিন্দু সংস্কারক দ্বারা তাঁর ধর্মের আমূল পরিবর্তন ঘটুক এটা বোধ হয় তিনি পছন্দ করেননি। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন আত্যন্তিকভাবে অথচ যুক্তিবাদী হিন্দু। যুক্তিবাদ ও ধর্মানুভূতি পরস্পরবিরোধী, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ব্রতী ছিলেন।

সে যাইহোক, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে এই দ্বৈত, পরস্পরবিরোধী ভাবের ছাপ সুস্পষ্ট। সুতরাং তিনি শুধু রক্ষণশীল লেখকই নন, তাঁর রচনায় আধুনিক ভাবধারাও যুগপৎ বিদ্যমান। এ-দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে তিনি মূলতঃ মনের, সংঘাতের শিল্পী। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিধবাদের প্রেমের যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাতে তাঁর এই সংঘাতপূর্ণ মনোভাব ফুটে ওঠে। হিন্দু হিসেবে বিধবাদের প্রেম

বা বিবাহ তিনি মনে প্রাণে অনুমোদন করতে পারেননি, কিন্তু যুক্তির খাতিরে এ মানবিক সমস্যাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উক্ত বিষয় সম্পর্কে 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'সাম্য'-এ তিনি যে উক্তি করেছেন তাতে তাঁর এই মনোভাব ধরা পড়ে।[৪] কুন্দনন্দিনীর করুণ পরিণতি সম্বন্ধে পরবর্তীকালে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন তাও এক্ষেত্রে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়।[৫] যদি আমরা 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কাহিনী বিশ্লেষণ করি তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। উপন্যাস দুটির কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় গল্পের নায়ক জমিদার, সুপুরুষ, শিক্ষিত ও চরিত্রবান। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়েই বিবাহিত ও স্ত্রীভাগ্যে অদ্বিতীয়। সূর্যমুখী ও ভ্রমর সতীত্ব পাতিব্রত্যের নিদর্শন। অর্থাৎ দৈহিক, বৈষয়িক ও মানসিক সুখের জন্য যে যে উপকরণের দরকার তা এই দুই নায়কের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। কিন্তু সুখের যাবতীয় উপকরণের অধিকারী হলেও যে সুখ পাওয়া যায় না নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল উভয়ই এ কথার নতুন প্রমাণ দেয়। দীর্ঘকাল সুখী দাম্পত্য জীবন যাপনের পর দুই নায়কই এক চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাদের সুখী অথচ নিস্তরঙ্গ জীবনে অতুল রূপের অধিকারিণী দুই বিধবার আবির্ভাব ঘটে এবং এমন ঘটনা স্রোতের সৃষ্টি হয় যার ফলে উভয় কাহিনীর পরিণতি অনিবার্য কারণে বেদনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। কুন্দ ও রোহিনী যথাক্রমে নগেন্দ্র ও গোবিন্দলালের অন্তরে এক অপ্রতিরোধ্য অথচ নিষিদ্ধ কামনার জন্ম দেয় যা তাদের সকল সুখ বিনষ্ট করে।

পরস্পরের প্রতি নারী ও পুরুষের এই যে আকুতি যা সংসার ও সমাজের সকল বন্ধনের ঊর্ধ্বে বঙ্কিমচন্দ্র নিজ আবেগ ও কল্পনার সাহায্যে তাকে অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছেন। নারী-পুরুষের প্রেমের এমন কাহিনী বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন। নীরদচন্দ্র চৌধুরী একে রোমান্টিক প্রেম রূপে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্লা সাহিত্যে উক্ত বিষয়বস্তুর প্রবর্তক।[৬] কিন্তু তাঁর উপন্যাসে

নারী-পুরুষের এই অভিনব সম্পর্কের পরিণাম সুখের নয়, বরং তা চরম বেদনায় পূর্ণ। আলোচ্য উপন্যাস দুটির মূল চরিত্রগুলির অবৈধ প্রণয়ের দরুণ তাদের মূল্যবোধে যে সংকটের সৃষ্টি হয় তা থেকে এ বেদনার উৎপত্তি। নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল কুন্দ ও রোহিনী সকলেই বুঝতে পারে যে, তাদের প্রেম ধর্ম ও সমাজ বিরুদ্ধ, কিন্তু তবুও তারা নিজেদের দুর্দমনীয় আবেগের গতি রোধে সক্ষম হয় না। সুতরাং 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কাহিনী এমনভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে দুই পরস্পর বিরোধী ভাবধারার সংঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর একদিকে রয়েছে সনাতনী হিন্দু জীবন ব্যবস্থা, অপরদিকে পাশ্চাত্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, একদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, অপরদিকে মানুষের সহজাত কামনা-বাসনা অভিপ্রকাশের তাগিদ। উপন্যাস দুটিতে সনাতনী মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্য বা আধুনিক ভাবধারার এই যে দ্বন্দ্ব তা একালের পাঠকের কাছে সবচেয়ে বেশী তাৎপর্য-পূর্ণ। ধর্ম ও সমাজ বড়ো, না মানুষ বড়ো, এই চিরন্তন প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের কালের যুগজিজ্ঞাসা এবং 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কাহিনীতে আমরা তার প্রতিধ্বনি পাই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা কালে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কারণ তাঁর রক্ষণশীল ও আধুনিক মনোভাব পাশাপাশি বিদ্যমান। কখনও তিনি নীতির প্রচারক, কখনও সুন্দরের উপাসক আবার কোন কোন সময়ে তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি অপেক্ষা নীতি প্রচার করার প্রবণতা অধিক প্রবল হয়ে ওঠে। এ কথাগুলি 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। উপন্যাসটি যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা তা এর নামকরণে, কাহিনী বিন্যাসে ও চরিত্র চিত্রণে স্পষ্ট। বিধবাদের প্রেম বা তাদের বিবাহ যে কত ক্ষতিকর তা বোঝাবার জন্যই যেন গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। উক্ত ভাবের সম্যক অভিব্যক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু উপন্যাসের নাম 'বিষবৃক্ষ' দেননি, তিনি কাহিনীতেও এই বাক প্রতিমার ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। মূল কাহিনী অর্থাৎ কুন্দ-নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর কাহিনী পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বীজ রোপিত হবার পর যে যে স্তরের মধ্য দিয়ে একটি গাছ বর্ধিত হয় ও

ফল ধারণ করে তাদের সাথে কাহিনীর বিভিন্ন অংশগুলির তুলনা করা হয়েছে; যেমন বিষবৃক্ষের বীজ বপন ১ম-১১শ অধ্যায়, অঙ্কুর ১২শ অধ্যায়-২০শ অধ্যায়, মুকুল ২১শ অধ্যায়-২৮শ অধ্যায়, বিষবৃক্ষ কি ২৯শ অধ্যায়-৩১শ অধ্যায় এবং বিষবৃক্ষের ফল ৩২শ অধ্যায়-৫০শ অধ্যায়। এই অংশগুলিতে কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রেমের উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও করুণ পরিণতি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে বোঝা যায় তাদের সম্পর্কের ফল কত বিষময়। উপন্যাসের এই অর্থ নানাভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। নগেন্দ্রের জীবনে কুন্দের আবির্ভাব যেন অভিশাপ সদৃশ। এর আগে সে যে কত সুখী ও ঐশ্বর্যবান ছিল তার প্রমাণ আমরা 'বিষবৃক্ষ'-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে পাই। কুন্দ যখন নগেন্দ্রের বাড়িতে প্রথম ঢোকে, তখন তার চোখ দিয়ে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকার বর্ণনা দেওয়া হয়। তাতে শুধু নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্যেরই উল্লেখ নেই, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনধারারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কুন্দ-নগেন্দ্রের সম্পর্কের দরুন সব কিছু বিপর্যস্ত হয়। ঘটনাক্রমে নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করে, তাদের হৃদ্য মহল। অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অবশেষে কুন্দের অকাল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটে। কিন্তু কুন্দের এই যে করুণ পরিণতি এর জন্য তাকে মোটেই দায়ী করা যায় না। উপন্যাসে তাকে আমরা এক দুর্বল, অসহায়, ইচ্ছাশক্তিবিহীন চরিত্র হিসাবে পাই। তাকে কেন্দ্র করে যে ধ্বংসাত্মক, বিষাদময় ঘটনাস্রোতের জন্ম তাতে সে যেন এক নীরব দর্শক। কুন্দের উক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মনে এ ধারণা জন্মায় যে সে যেন কতকগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনকারী সামাজিক শক্তির ক্রীড়নক মাত্র; যেন এদের কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পন করা ছাড়া তার কোন পথ নেই। তার করুণ পরিণতি আমাদের মনে এমন ধারণা জন্মায় যে বৃহত্তর সামাজিক শক্তির সামনে ব্যক্তি কত তুচ্ছ।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধানে কাহিনীতে যে অর্থ আরোপ করতে চান তা কুন্দের জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তার সকল অংশে হয় না। বিধবার প্রেম যে কল্যাণকর নয়, বরং তা দেহজ কামনারই বিকৃত বা উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ সে কথা

বোঝাবার জন্য হীরা-দেবেন্দ্রের উপকাহিনী 'বিষবৃক্ষ'-এ সংযোজিত হয়েছে। লেখক কুন্দের চরিত্রে যে কদর্যতা দেখাতে পারেননি তা অতিরিক্ত মাত্রায় ফুটিয়ে তুলেছেন হীরার চরিত্রে। তেমনি নগেন্দ্রের কামনার নোংরা দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী দেবেন্দ্রের চরিত্রে। আবার, কুন্দের প্রেমে পড়ায় নগেন্দ্রের যে চারিত্রিক অবনতি ঘটে যেমন তার মদ্যপান অভ্যাস, তাতে উপন্যাসের উক্ত অর্থের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যুক্তি ও উদার মতভিত্তিক তৎকালীন সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রতি উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষে যে কটাক্ষ করেছেন তাতেও তাঁর রক্ষণশীল মনোভাব ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে তারাচরণ ও দেবেন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ প্রীতি এবং নারী আন্দোলন ও বিধবা-বিবাহে তাদের উৎসাহের পরিহাস-উচ্ছল বর্ণনা অথবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সূর্যমুখীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।[৭]

কিন্তু মনোযোগী পাঠক বুঝতে পারবেন এটাই 'বিষবৃক্ষ'-এর একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না। উপরোক্ত অর্থের সাথে উপন্যাসের কোন কোন তাৎপর্যপূর্ণ অংশ খাপ খায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সচেতন মন যে বিধবাদের প্রেম বা বিবাহ অনুমোদন করতে পারেনি সে কথা আগে বলা হয়েছে। কিন্তু নীতিসাধীশ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরে একটি শিল্পীমন লুকিয়ে রয়েছিল যা সংস্কারের পরিবেষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে। 'বিষবৃক্ষ'-এ তাঁর এই মৈতসত্তার অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। ফলে এতে যে জীবন চিত্র ফুটে ওঠে তাতে প্রাচীন ও নবীন, পৃষ্টিভঙ্গী ও ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মনোভাবের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার এই স্বাতন্ত্র্য কুন্দ-নগেন্দ্রের সম্পর্ক বর্ণনাকালে সবচেয়ে বেশী প্রকট। তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি অতি প্রবল। কুন্দ বিধবা অথচ তার রূপ বর্ণনায় তিনি কোন কৃপণতা দেখাননি। নগেন্দ্রের চোখ দিয়ে কুন্দের যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন তাতে তাঁর রূপতৃষ্ণারই পরিচয় মেলে।[৮] যে ভাব-মন্ডলের পটভূমিতে কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রেমের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় তাদের ভালবাসা জন্ম লগ্নেই অভিশপ্ত, তা কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তবুও শিল্পী গভীর আবেগ ও সহানুভূতির সাথে তাদের মনের কথা ব্যক্ত

করেছেন, তাদের ভালবাসার মোহন রূপ আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এক অনিন্দ্যসুন্দর রোমান্টিক পরিবেশে প্রেমিক-যুগলের মিলনের দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। দীঘি, বাগান, বকুল, যুথিকা, মল্লিকা, কামিনীর গন্ধে আমোদিত সন্ধ্যাকাল-সকলই এই আবেগ-কম্পিত, দৃশ্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। এমন এক পরিবেশে নগেন্দ্র "সহস্র মুখে, অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ মর্মভেদী" ভাষায় কুন্দের কাছে নিজের মনের বাসনা ব্যক্ত করে।[৯]

পরস্পরের প্রতি কুন্দ-নগেন্দ্রের এই যে উগ্র কামনা, এই যে দুর্নিবার আকর্ষণ তা মানুষের সহজাত কামনা-বাসনার স্বচ্ছতা প্রমাণ করে, আমাদের মনে এ সত্যের উপলব্ধি জন্মায় যে ধর্ম ও সমাজের ঊর্ধ্বে মানুষের নিজস্ব একটি সত্তা আছে যা গতানুগতিক জীবনধারা দ্বারা প্রভাবিত নয়। মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে উক্ত ধারণা পাশ্চাত্য প্রভাবসম্ভূত এবং কুন্দনগেন্দ্রের কাহিনীতে তা প্রতিবিম্বিত। নগেন্দ্রর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ সূর্যমুখীর চরিত্রেও প্রকাশ লাভ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রাচীন হিন্দু নারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের আদর্শে এই চরিত্রটি সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাচীন ও আধুনিক ভাবধারার সমন্বয়ে সূর্যমুখীর চরিত্র গড়ে উঠেছে। স্বামীর প্রতি তার ভক্তি যেমন অচলা, নিজের আত্মসম্মানবোধও তেমনি প্রখর। বয়ঃপ্রাপ্ত বিবাহই একমাত্র সত্য নয়। ভালবাসা ব্যতিরেকে দাম্পত্যজীবনের যে কোন অর্থ থাকতে পারে না তা সূর্যমুখী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের ভালবাসার কথা সে যখন জানতে পারে তখন দুঃখে ও অভিমানে তার মন ভরে ওঠে। সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে তাদের বিয়ে দেয় এবং সকলের অলক্ষ্যে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। সূর্যমুখীর এই আচরণ তৎকালীন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কারণ সেকালে এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। আবার দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন যাপন করলেও সূর্যমুখীর কোন সন্তান হয়নি। সুতরাং 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'-এই প্রাচীন বিধি দোহাই দিয়ে নগেন্দ্র অনায়াসে আর একটি বিয়ে করতে পারত। করেছেও তাই। তবুও সূর্যমুখী যে নিজের পরিবর্তিত অবস্থা মেনে নিতে পারে না

তার কারণ সে নিজের অস্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। নারীর এই আত্মসচেতনতা নতুন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দান। শ্রীশচন্দ্রকে লিখিত এক চিঠিতে নগেন্দ্র প্রায় এ কথাই বলেছিলেন, "তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি একথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না।"[১০]

সূর্যমুখীর চরিত্রের এই দিক উপন্যাসটিতে একটি মৌলিক নীতিগত প্রশ্নের অবতারণা করে। সূর্যমুখীর দোষ কি যে সে স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে? কিন্তু মানুষের কামনা-বাসনা ত সকল সময় তার বুদ্ধি বা বিচারশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। যার উপর আমাদের কোন নীতিগত দাবী নেই, তা মনোমুগ্ধকর রূপে আমাদের প্রলুব্ধ করে। অর্থাৎ কুন্দকে ভালবেসে নগেন্দ্র যে চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তার মূলে রয়েছে মানুষের বুদ্ধি ও আবেগ, নীতিবোধ ও আত্মাভিমানের সেই চিরন্তন লড়াই যা ট্রাজেডীর বিষয় বস্তু। সুতরাং প্রলোভনের বশে মানুষের পদস্খলন, তার পরিতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত—এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় কাহিনীর ব্যঞ্জনা 'বিষবৃক্ষ'-এ পাওয়া যায়। কিন্তু তার সার্থক রূপায়ন উপন্যাসটিতে হয়নি। কারণ উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি দুটির অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি ও আবেগ, পাপ ও পুণ্যবোধের সংঘাতের শিল্পরূপ দানের জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, যে সার্বিক নিরপেক্ষতা প্রয়োজন তা বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ত্তাধীন ছিল না। বরং তাঁর রক্ষণশীলতা, তাঁর সচেতন পক্ষপাতিত্ব কাহিনীর গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছে। তিনি সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের অপরাধের উপর যতটা জোর দিয়েছেন কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রণয়ের সম্মোহনী প্রভাবের উপর ততটা জোর দেননি। নগেন্দ্রের অধঃপতনের কারণ ব্যাখ্যাকালে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় নীতি প্রচার করার প্রবণতা তাঁর কত বেশী। আলোচ্য উপন্যাসের ২৯শ অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গের আলোচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এক প্রিয় তত্ত্বের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের অনুরাগ রূপজ মোহ মাত্র; বুদ্ধি বা বিচার শক্তি বিফল হলে এ ধরণের ভ্রম মানুষের মনে জন্মলাভ করে এবং তাকে বিপথে টেনে নিয়ে যায়। হরদেব

ঘোষালকে লিখিত এক চিঠিতে এ কথারই পুনরুক্তি করা হয়।[১১] তবে বলা যেতে পারে মানুষের অন্তর্জগতে প্রলোভনের যে বিচিত্র লীলাখেলা চলে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। নগেন্দ্রের অধোগতির কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন : "দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে প্রথম লোচনে দেখিবার পূর্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই কেননা, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার হয় নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত বক্তব্যে মিল্টনের একটি কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অ্যারিওপ্যাজিটিকায় পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন : ... that which purifies us is trial, and trial is by what is contrary. That Virtue therefore which is but a youngling in the contemplation of evil, and knows not the utmost that vice promises to her followers, and rejects it, is but a blank virtue, not a pure ;"[১৩] মিল্টন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মতের এই সাদৃশ্য কোন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত ইংরেজ কবি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তিনি মিল্টনের রচনার সাথে সুপরিচিত ছিলেন কারণ তাঁর লেখায় বার বার এঁর উল্লেখ পাই।[১৪] মেজাজে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে উভয় লেখকের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাঁরা দুজনেই সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে আবির্ভূত হন। মিল্টনের রচনায় যেমন রেনেসাঁস ও তৎকালীন ধর্ম-আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনি সনাতনী হিন্দু ও আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প চেতনা গঠিত হয়েছে। দুজনেরই ধর্মানুভূতি প্রবল। তাঁরা উন্নত নৈতিক জীবনের প্রবক্তা এবং সাহিত্যে যে মহৎ আদর্শের বাহন সে তার বিশ্বাসী। উপরন্তু, মানুষের পাপবোধ ও পদস্খলন সম্পর্কে উভয়েই অনুসন্ধিৎসু।

সুতরাং শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র মিল্টনের সমকক্ষ না হলেও এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় যে, উক্ত ইংরেজ কবির কোন কোন চিন্তা-ভাবনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে থাকতে পারে। মিল্টন কৃত আদম ও স্যামসনের চরিত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীর মোহিনী রূপের প্রতি আসক্তি তাদের পতনের কারণ। এ প্রসঙ্গে 'প্যারাডাইজ লষ্ট' ও 'স্যামসন অ্যাগোনিষ্টিস' থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দুটি প্রণিধানযোগ্য

So saying, she embraced him, and for joy
Tenderly wept, much won that he his love
Had so ennobled, as of choice to incur
Divine displeasure for her sake, or death.
In recompense (for such compliance bad
Such recompense best merits), from the bough
She gave him of that fair enticing fruit
With liberal hand : he scrupled not to eat,
Against his better knowledge, nor deceived,
But fondly overcome with female charm.[১৪]

At times when men seek most repose and rest,
I yielded, and unlocked her all my heart,
Who, with a grain of manhood well resolved,
Might easily have shook off all her snares ;
But foul effeminacy held me yoked
Her bondslove,[১৫]

উপন্যাসে স্বকালের ভাব-দ্বন্দ্বের বাস্তব রূপ দানের প্রয়াসে হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র মিল্টনের উপরোক্ত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। অন্ততঃপক্ষে, তিনি যেভাবে বিধবার অবৈধ প্রেমের কাহিনী রচনা করেছেন তাতে সেকালের

হৈত, পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা প্রতিফলিত। 'বিষবৃক্ষ'-এ যা সূচিত হয়েছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ তা পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রকাশনাকাল লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উপন্যাস দুটি অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত।[১৭] আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে এদের কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বড়ো লেখক যে পর পর দুটি উপন্যাসে একই কাহিনীর নিছক পুনরাবৃত্তি করবেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। বরং একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একই বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত হলেও উভয় উপন্যাসের মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান। শিল্পকর্ম হিসেবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যে 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষোক্ত উপন্যাসে কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে যে দুর্বলতা বা শিথিলতা আমরা দেখি তা থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অনেকখানি মুক্ত। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের অতুলনীয় গঠন-কৌশলের প্রমাণ পাওয়া যায়। পুস্তকটির পাতায় পাতায় আমরা ক্লাসিক্যাল সংযম, আড়ম্বরহীনতা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাই যা বাংলা উপন্যাসে বিরল। কিন্তু শুধু শিল্পকর্ম রূপে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' যে 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা নয়, এতে আমরা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করি। মানুষের আবেগ ও বিচারবোধের যে দ্বন্দ্ব উপন্যাস দুটির প্রধান বিষয়বস্তু তা 'বিষবৃক্ষ'-এ পূর্ণ নৈতিক রূপ লাভ করেনি। কারণ এই পুস্তকটি অনেকাংশে প্রচারমূলক। বিধবার প্রেম বা বিবাহ কত ক্ষতিকর হতে পারে পাঠককে তা বোঝাতে লেখক যত্নবান। ফলে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নীতি-প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র অনেক বেশী প্রকট। তিনি সাধারণতঃ কাহিনী বর্ণনাকালে স্বয়ং পাঠকের সামনে উপস্থিত হন এবং বিভিন্ন ঘটনা বা চরিত্র সম্পর্কে নিজের মত খোলাখুলি ব্যক্ত করেন। উপন্যাসে কাহিনী-কারের নিজস্ব মন্তব্য সংযোজন সেকালের একটি প্রচলিত প্রথা। 'বিষবৃক্ষ' –এ গল্পকারের যে সকল মন্তব্য আমরা পাই তাতে তিনি একাধিকবার স্পষ্ট করে বলেছেন কুন্দ-নগেন্দ্রের অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম কত বিষময়।[১৮] কাহিনী বিন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত নীতি প্রচারের প্রবণতা ধরা পড়ে।

যেমন হীরা—দেবেন্দ্রের উপকাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় ও সামাজিক নীতির প্রচারণা। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে 'বিষবৃক্ষ'-এ লেখকের ট্রাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস মিললেও তাঁর প্রচারমূলক মনোভাবের দরুণ তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি।

অপরপক্ষে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ হীরা-দেবেন্দ্রের উপকাহিনীর অনুরূপ কোন গল্পাংশ না থাকায় লেখকের নীতি প্রচারের অবাধ প্রবণতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। উপন্যাসটিতে কাহিনীকারের নিজস্ব মন্তব্য-গুলি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে 'বিষবৃক্ষ'-এ তাঁর মতামত যতটা প্রচারমূলক এগুলি ততটা নয়। যতদূর সম্ভব নিজেকে মিলিয়ে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র পাত্র-পাত্রীদের প্রেম-কাহিনীর উৎপত্তি, বিকাশ ও বিষাদময় পরিণতির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি চরিত্রগুলির ভুল-ভ্রান্তিতে বা পদস্খলনে দুঃখ পান ঠিকই কিন্তু তাদের দ্রুত বা চালাও বিচারে কখনো প্রবৃত্ত হন। এ কথা স্বীকার করতে হবে যে 'বিষবৃক্ষ'-এর গল্পকার অপেক্ষা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গল্পকার অনেক বেশী প্রাজ্ঞ, অনেক বেশী সংবেদনশীল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কলাকৌশল, এই সংযম বা পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী উপন্যাসটির অন্তর্নিহিত অর্থকে বিশেষভাবে বাঞ্ময় করে তুলেছে। অন্য কথায় 'বিষবৃক্ষ'-এ যে সংঘাতের আভাস আমরা পাই আলোচ্য উপন্যাসটিতে তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। সেজন্য অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' লিখে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি বলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনায় হাত দিয়েছিলেন।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রধান চরিত্রগুলির সম্পর্কে যে কাহিনী আমরা পাই তার মধ্য দিয়ে এর মূল অর্থ প্রকাশ লাভ করেছে। গোবিন্দ-লালের স্ত্রী ভ্রমর রূপহীনা কিন্তু সকল গুণের অধিকারিণী বিশেষ করে সে সতীত্ব ও পতিব্রতার মূর্ত প্রতীক।' শিক্ষিত, রুচিবান ও বিবেকসম্পন্ন গোবিন্দলালের পক্ষে নিরপরাধ ভ্রমরকে উপেক্ষা করা কঠিন। অপরদিকে রোহিণীর অতুলনীয় রূপ তার সৌন্দর্য-পিপাসা প্রবলভাবে জাগ্রত করে।

ফলে গোবিন্দলালের হৃদয় দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়—একদিকে তার বিবেক আর অন্যদিকে তার রূপতৃষ্ণা। এই সংঘাত অনিবার্য গতিতে কাহিনীকে এক বিষাদময় পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে যে, এই সংঘাতপূর্ণ কাহিনীর একটি নাটকীয় রূপ আছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির দুঃখপূর্ণ পরিণতির জন্য তারা নিজেরা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। জমিদার কৃষ্ণকান্তের উইল কাহিনীতে অনেকটা নিয়তির মতো কাজ করেছে। এই উইলকে কেন্দ্র করে গোবিন্দ-রোহিণীর সম্পর্কের সূত্রপাত; আবার, অন্তিম মুহূর্তে তিনি উইলের যে পরিবর্তন করেন তার ফলে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত হয়। অনুরূপ-ভাবে, উক্ত চরিত্রগুলির দুঃখ-কষ্টের মূলে রয়েছে তাদের আবেগের প্রাবল্য বা ভ্রান্তিপূর্ণ বিচারবোধ। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর মোহ তার বিচারশক্তিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে, সে স্বকাল ও সমাজের কথা ভুলে যায়। গোবিন্দলালেরও অতৃপ্ত কামনা-বাসনা পুনিবার গতিতে তাকে রোহিণীর প্রতি আকৃষ্ট করে। উপরন্তু তার হৃদয় জগতে আবেগ ও বিবেকের দ্বন্দ্ব যখন চরম পর্যায়ে উপনীত তখন ভ্রমর স্বামীর মনের কথা বুঝতে পারে না। গোবিন্দলালের প্রতি তার অবিশ্বাস ও অভিমান উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরায় ও পরিশেষে বিচ্ছেদ টেনে আনে।[১১]

কাহিনীর এই নাটকীয় পরিবেশনার ফলে মূল চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা তাদের সম্পর্কের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা বুঝতে পারি দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন যাপন করলেও ভ্রমর ও গোবিন্দলালের সম্পর্কের মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। সেকালের প্রথানুযায়ী নিতান্ত বালিকা বয়সে গোবিন্দলালের সাথে ভ্রমরের বিয়ে হয়। কাহিনীতে আমরা দেখি যে, তার বয়স সতের বৎসর। অপরদিকে, গোবিন্দলাল পূর্ণ যুবক, শিক্ষিত ও সুন্দরের উপাসক। সুতরাং বয়স ও মেজাজের তারতম্য হেতু উভয়ের মধ্যে কিছুটা মানসিক ব্যবধান রয়ে গেছে। উপরন্তু তারা

নিঃসন্তান।[২০] ফলে তাদের বিবাহিত জীবন অনেকটা বৈচিত্র্যহীন, নিস্তরঙ্গ। এ অবস্থায় রোহিণীর সান্নিধ্যে এসে গোবিন্দলালের অতৃপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কামনা-বাসনা নতুন করে উজ্জীবিত হয়। আবার, অতি নৈপুণ্যের সাথে বঙ্কিমচন্দ্র নায়কের রূপতৃষ্ণার সাথে তার সহজাত মানব দরদ সংমিশ্রিত করেছেন। বারুণীর ঘাটে স্নানরতা রোহিণী গোবিন্দলালের মনে সহজেই করুণার উদ্রেক করে "গোবিন্দলাল স্বচ্ছ সরোবরজলে সেই ভাস্করকীর্ত্তিকল্প মূর্ত্তির ছায়া দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুসুমিত কাঞ্চনাদি বৃক্ষের ছায়া দেখিলেন। সব সুন্দর—কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর। সৃষ্টি করুণাময়ী—মনুষ্য অকরুণ। গোবিন্দলাল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে পড়িলেন। রোহিণীকে আবার বলিলেন, 'তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে আজি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও'।[২১] রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের নরম লেখকের মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে। আসলে এই নারী চরিত্র চিত্রণে বিধবাদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর যে প্রেম তা তিনি সজ্ঞানে অনুমোদন করতে পারেননি, অথচ সকল কবির ও দরদ ঢেলে দিয়ে তার অবৈধ, সমাজবিরুদ্ধ ভালবাসা ও হৃদয়ের আকুতির এমন বর্ণনা দিয়েছেন যা বাংলা উপন্যাসে সচরাচর মেলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দোটানা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটির মূল পাঠে যখন তা ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়। এতে রোহিণীর যে চিত্র পাই তা অসঙ্গতি-পূর্ণ। একদিকে তাকে লোভী, নীচ ও স্বার্থপর রূপে তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে দেখি গোবিন্দলালের প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিম। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে চরিত্রটির উক্ত অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; সেজন্য তিনি পরবর্তীকালে এর একাধিক সংশোধন করেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি সেগুলির পুনরাবৃত্তি করে প্রবন্ধের কলেবর বাড়াতে চাই না।[২২] শুধু এ কথা বললে যথেষ্ট হবে যে, পরবর্তীকালের সংশোধিত রোহিণী চরিত্র 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত পাঠে বা উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণে চিত্রিত রোহিণী চরিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথম দিকের

পাঠগুলিতে যে সকল অসমঞ্জসপূর্ণ দোষ-ত্রুটি তার চরিত্রে আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। যাতে সে গোবিন্দলালের যোগ্য প্রণয়িনী হতে পারে। রোহিণী চরিত্রে উক্ত সংশোধন প্রমাণ করে যে, আর্টের খাতিরে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারেন। আমি অবশ্য প্রসাদপুরের রোহিণী, বিশেষ করে নিশাকরের প্রতি তার প্রলুব্ধ হওয়া বা তার অতি নাটকীয় পরিণতির কথা বলছি না। কিন্তু মূল পাঠের এত সংস্কারের পরেও রোহিণীর উদ্দেশ্যে ধ্বনিত যে সকল গালি-গালাজপূর্ণ সম্বোধন উপন্যাসটিতে এখনও রয়ে গেছে, যেমন, 'কালামুখী', 'প্রেতিনী', 'মহাপাপিষ্ঠা', 'পাপীয়সী' ইত্যাদি সেগুলোরও কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না।[১৩] এ সবই বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীল মনের পরিচায়ক। তিনি যে গোবিন্দ-লালের প্রতি রোহিণীর ভালবাসা সজ্ঞানে অনুমোদন করতে পারেননি তা প্রসাদপুরের ঘটনাবলী প্রমাণ করে। আসলে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'--এর দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রের নিকৃষ্ট রচনা। যে সকল রোমাঞ্চকর, অতি নাটকীয় ঘটনার অবতারণা এ অংশে করা হয়েছে সেগুলি উপন্যাসটির মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ন করেছে। এ শ্রেণীর রচনায় শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, এগুলি প্রমাণ করে তাঁর শিল্পপ্রতিভা কত অকৃতাপুণ্য।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য উপন্যাসের প্রথমার্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে। উক্ত অংশে রোহিণীর চরিত্র যেভাবে অংকিত হয়েছে তাতে তাঁর শিল্পীসত্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গভীর দরদের সাথে রোহিণীর 'ক্ষীত, অপরিমিত প্রেমপূর্ণহৃদয়'-এর কথা, তার দুঃখ-হতাশা, আক্ষেপ-পরিতাপের কথা ব্যক্ত করেছেন। রোহিণীর অতুল রূপরাশির এমন বর্ণনা তিনি একাধিকবার দিয়েছেন যে মনে হয় যেন এ কাজে সংস্কার হেতু তাঁর কোন মানসিক বাধা ছিল না। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৌন্দর্যের প্রতি শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র যে কত প্রলুব্ধ, তাঁর মোহ যে কত প্রবল তা এই বিধবা নারীর রূপ বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়।[১৪] পরিষ্কার বোঝা যায় রচনার এ সকল অংশে লেখকের রক্ষণশীল মনোভাব অনেকটা সুপ্ত। রোহিণী শুধু ব্যভিচারী নয়, গোবিন্দলালের প্রতি তার প্রেমও অকৃত্রিম।

গোবিন্দলালকে কোন ভাবে ঠকান তার উদ্দেশ্য ছিল না। অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত রোহিণীর এ আবেগ যে খাঁটি ও সুন্দর সে কথা পাঠককে বোঝানর জন্য কবি বঙ্কিমচন্দ্র এক চরম রোমান্টিক পরিবেশে তার বর্ণনা দিয়েছেন। বসন্তকাল, কোকিলের মধুর স্বর, বারুণীর তীর, ফুলের বাগান, এ সব মিলে যে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে রোহিণীর প্রেমানুভূতি ও ভাব-বিহ্বলতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু কাল ও সমাজ তার আবেগের অভিপ্রকাশের পথে অনতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং রোহিণীর রূপ ও ভালবাসা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা অবধারিত। এ কারণেই বারুণীর ঘাটে তার আকুল কান্না। নিজ অবস্থার বিরুদ্ধে রোহিণীর ক্ষোভ একটি প্রশ্নাকারে উপন্যাসটিতে স্থান পেয়েছে: কি অপরাধে এ বাল বৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পারিলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহ জীবন কাটাইতে হইল?[১৩০] বৈধব্যের দরুন সে আজ পরনির্ভরশীল। নিজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা রোহিণীর প্রেম-কাহিনীর মানবিক দিকটি আরো স্পষ্ট করে তোলে। সে বুদ্ধিমতি এবং বুঝতে পারে এই সমাজ-বিরুদ্ধ আবেগ তাকে চরম দুঃখে নিক্ষেপ করবে। তবু রোহিণীর পক্ষে নিজেকে সংযত রাখা সম্ভবপর হয়নি। ফলে তার বেদনা ও পরিতাপের সীমা থাকে না। তার উক্ত মানসিক অবস্থা নিজের কথাতে ধরা পড়ে: "হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখী-জনের একমাত্র সহায়। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেম বহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার—আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—রহিল কি প্রভু?[১৩১]" রোহিণীর এই দুঃখ গোটা উপন্যাসটিতে একটি বেদনার আবহ সৃষ্টি করে।

রোহিণীর ট্রাজেডীর মূল কারণ যে অপ্রাপণীয় তাকে সে ভালবেসেছে, যে নাগালের বাইরে তাকে হৃদয়দান করেছে। অনুরূপভাবে, গোবিন্দলালের মনে রোহিণীর জন্য যে নিষিদ্ধ কামনার জন্ম লাভ করে তার ফলে সে এক চরম নৈতিক সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়। একদিকে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধ, অপরদিকে প্রণয়িতাকে লাভ করার উগ্র কামনা—এই দোটানা মনোভাবের ফলে তার দুঃখ, পরিতাপ ও আত্মধিক্কারের সীমা থাকে না। সুতরাং দেখা যায় ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল—এই তিন চরিত্রের জটিল সম্পর্ককে কেন্দ্র করে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ এক অবিমিশ্রিত বেদনার কাহিনী গড়ে উঠেছে। দুঃখই হচ্ছে এর মূল সুর বা ব্যঞ্জনা। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর পাঠে বা এর প্রথম তিন সংস্করণে কাহিনীর যে পরিণতি আমরা পাই তার সাথে উপন্যাসটি সম্পর্কে উক্ত ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে দেখান হয়েছে যে, গোবিন্দলাল অবশেষে বারুণীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। কিন্তু ১৮৯২ সালে উপন্যাসটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র সমাপ্তি-অংশের পরিবর্তন করেন। কাহিনীর সংশোধিত উপসংহারে দেখা যায় যে আত্মহত্যার পরিবর্তে গোবিন্দলাল ভগবৎ সাধনার সাহায্যে পরম শান্তি লাভ করেছে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সর্বশেষ পরিবর্তন এর মূল অর্থের সাথে খাপ খায় না। বরং আগেকার বিষাদময় পরিণতি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। আমি এই প্রবন্ধে বলতে চাই যে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার প্রেমের কাহিনী আশ্রয় করে স্বকালের ভাব-সংকটের একটি° গৌণিক রূপ দিতে প্রয়াসী হন। একদিকে উনিশ শতকী মানুষের নবলব্ধ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, আর অন্যদিকে চিরাচরিত ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তার আনুগত্য—এই দুই পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারার দ্বন্দ্বে তাঁর হৃদয় বিক্ষিপ্ত। উক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিবেশের প্রভাব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মুক্ত থাকতে পারেন নি। তিনি না পেরেছেন পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে, না পেরেছেন পুরাতনকে

দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে। এই সংকটবোধ থেকে জন্মলাভ করেছে তাঁর ট্রাজিক চেতনা। 'নিশিপদ্ম'-এ লেখকের এই মনোভাবের সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু তার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেনি। কাহিনীর উপসংহারে যেভাবে কুন্দ মৃত্যু বরণ করে এবং নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন হয় তা থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিতে যে সমস্যার অবতারণা করেন তার নিয়মমত, বিশ্বাস-যোগ্য সমাধান দিতে পারেননি। অপর পক্ষে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ জীবন সম্পর্কে তাঁর ট্রাজিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি বিকাশ লাভ করে। এর নায়ক-নায়িকারা অর্থাৎ ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল তৎকালীন মানুষের ভাব-দ্বন্দ্বের মূর্ত প্রতীক। এই দুই নারী গোবিন্দলালের হৃদয়-জগতে যে সংঘাত সৃষ্টি করে তাতে উনিশ শতকী মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্যক প্রতিফলিত। যদি তাই হয়, তবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রথম দিকের বিশ্লেষণ পরিণতি বইটির মূল অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবলভাবে ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এটা অনুমান করা বোধ হয় একেবারে ভুল হবে না যে, ধর্মীয় অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি উপন্যাসটির উপসংহারে উপরোক্ত পরিবর্তন সাধন করেন।

টীকা

১। তথাকথিত বাংলা রেনেসাঁসের যুগে যে সকল সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে নারীজাতির এই প্রাধান্য বিস্ময়কর। অবশ্যই তারা সমাজের একটি বিপুল অংশ দখল করে আছে এবং তাদের কল্যাণ সাধন যে কোন সংস্কারমূলক আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে সময়ে ইংরেজ শাসকদের ক্রমাগত আক্রমণের চাপে এদেশের নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংসের সম্মুখীন, তখন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি সকল

সংস্কার আন্দোলন বা পুনর্গঠন প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে কেন্দ্রীভূত হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল না? বোধ হয় সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠির প্রতিকূলতার দরুন এ ধরনের কোন উদ্যোগ সেকালে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না।

২। 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ', "স্বদেশ ও সাহিত্য" কলকাতা, পৃঃ ৯৭-১০০। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে মানুষ অপেক্ষা ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের প্রাধান্য বেশী এ ধরনের মন্তব্য শরৎচন্দ্র অন্যত্রও করেছেন: 'জীবন দর্শনে শরৎচন্দ্র', "শরৎচন্দ্রের রচনাবলী" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬১, পৃঃ ৩৮৩ দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্কিম বাবুর প্রসঙ্গ', "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র", সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃঃ ১৩।

৪। "বঙ্কিম রচনাবলী", ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৬, পৃঃ ২৫৭ ও ৪০১-২।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন যে, কুন্দনন্দিনীকে আত্মহত্যা করানো 'নীতিবিরুদ্ধ' হয়েছিল: "কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র", পৃঃ ৪।

৬। নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, 'বাঙ্গালী জীবনে রমণী', মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৮, পৃঃ ৪৫-৬০, ১২১-১২৪, ২৩১-২৬৫। আমি সাধারণভাবে এই বইটি দ্বারা উপকৃত হয়েছি।

৭। 'বিষবৃক্ষ', "বঙ্কিম রচনাবলী", ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ অধ্যায়, পৃঃ ২৬৮, ২৭৩ ও ২৭৯। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্য উপন্যাস দুটি থেকে এ প্রবন্ধে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হবে তা এই বই থেকে নেওয়া। এখন থেকে শুধু উপন্যাসের নাম, অধ্যায় ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।

৮। 'বিষবৃক্ষ', ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৬৬।

৯। ঐ , ১৬শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৮৯।

১০। ঐ , ২৫শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৩০৬।

১১। ঐ , ৩২শ অধ্যায়, পৃঃ ৩১৩।

১২। ঐ , ২৯শ অধ্যায়, পৃঃ ৩১০।

১৩। Areopagitica, ed. Michael Davis, Macmillan, New York, 1967, p. 28,

১৪। উদাহরণ স্বরূপ, 'বঙ্কিম রচনাবলী', ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৭৬, পৃঃ ১৮৬, ১৮৮-৮৯, ৮৭৫, ৮৯৯-৯০০ এবং "বঙ্কিম রচনাবলী", ৩য় খণ্ড, Collection of English Works, পৃঃ ১১৪-১৫, ১৯৪-৯৫ দ্রষ্টব্য।

১৫। Paradise Lost, Bk IX, Lines 990-1000.

১৬। Samson Agonistes, Lines 406-111.

১৭। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ, ১২৭৯) থেকে 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৩ সালে তা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। ঐ পত্রিকায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ধারাবাহিক প্রকাশনা আরম্ভ হয় ১২৮২ সালে, কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' মাঝখানে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়। ১৮৭৮ সালে এটিকে আমরা পুস্তকাকারে পাই।

১৮। 'বিষবৃক্ষ', ৮ম, ১৬শ, ২৯শ ও ৫ম অধ্যায়, পৃঃ ২৭২, ২৮৮, ৩০১ ও ৩৪২।

১৯। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর এ দিকটির চমৎকার আলোচনা করেছেন অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর বই 'বঙ্কিম মানস'-এ; ঐ বইয়ের ২য় সংস্করণ, ১৯৬০, কলকাতা, পৃঃ ৯৩-৯৪ দ্রষ্টব্য।

২০। ভ্রমরের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কিন্তু সূতিকাগারে মারা যায়— 'কৃষ্ণকান্তের উইল', ১ম খণ্ড, ৩১শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৮২। এদিক দিয়ে ভ্রমর সূর্যমুখীর সাথে তুলনীয়।

২১। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৫০।

২২। উদাহরণস্বরূপ ব্রজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিম শতবার্ষিকী সংস্করণ-এর ভূমিকা ও পরিশিষ্ট, কলকাতা, ১৩৫০ এবং অরবিন্দ পোদ্দার কৃত 'বঙ্কিম মানস', ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃঃ ৯৭-৯৯ দ্রষ্টব্য।

২৩। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', ১ম খণ্ড পরিচ্ছেদ ১২শ, ২৫ম, পৃঃ ৫৫৯, ৫৭৩ এবং ২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৯৩।

২৪। ঐ , ১ম খণ্ড, পরিচ্ছেদ ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১৫শ ও ১৬শ, পৃঃ ৫৪৭-৫৫০, ৫৬৩-৫৬৫।

২৫। ঐ , ১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৪৯।

২৬। ঐ , ১ম খণ্ড, ১৪শ পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৬১।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের

"বিলাতী বর্জ্জন রহস্য"

গোলাম সাকলায়েন

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য রত্নের পরিচয় অপর্যাপ্ত হলেও সাম্প্রতিক কালে বোধ করি শিক্ষিত-মহলে কারো অজানা নয়। বিশেষ করে 'আনোয়ারা'-র কল্যাণে তাঁর নাম অল্প-বিস্তর সবারই জানা আছে। নজিবর রহমান কেবলমাত্র একটি নাম নয়, একটি আদর্শ, একটি শিল্পসত্তা। তিনি সর্বপ্রথম আমাদের সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন এবং বলা চলে 'আনোয়ারা' মুসলিম সমাজচিত্র হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। দোষত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে, এ-গ্রন্থের জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর। মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' বাদ দিলে 'আনোয়ারা' যত বেশী বাঙালী পাঠক-পাঠিকার রসপিপাসা মিটাতে পেরেছে তেমন বোধকরি আর কোনটিই নয়। এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন এককালে পঠিত হইয়াছিল, 'বিষাদসিন্ধু' তেমনি আজও পর্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়; বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্য কাব্যখানির সমান আদর।"* ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মীর মোশাররফ হোসেন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন ঔপন্যাসিক

---

* সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২৮-২৯ (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা, পৃঃ ৪৪-৪৫।

নজিবর রহমান সম্পর্কে সে একই কথা প্রযোজ্য। মীর সাহেব যেমন 'বিষাদসিন্ধু' সমগ্র বাংলা ভাষাভাষীর ট্রাজেডী ক'রে তুলেছিলেন মোহাম্মদ নজিবর রহমানের উপন্যাস বিশেষত 'আনোয়ারা' তেমনি সকল সমাজে এখনো সমানভাবে আদৃত। এই গ্রন্থখানির অভূতপূর্ব লোকপ্রিয়তার কারণে গ্রন্থকার নজিবর রহমানের লেখকসত্তার পূর্ণপরিচয়লাভের আকাংক্ষায় সাম্প্রতিক-কালের বাংলা সাহিত্যের গবেষকগণ বেশ তৎপর হয়েছেন। শুধু নজিবর রহমানের ক্ষেত্রেই নয়, উনিশ-বিশ শতকের মুসলমান কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিকদের সাহিত্যসাধনার মৌল প্রেরণা ও জীবনানুভূতির কারণ অনুসন্ধান করতে পারলে তাঁদের সাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয় সহজ হবে। তাই সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আজ নানা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ভক্ত লেখকের গ্রন্থের মোট সংখ্যা কত? কোন্ বয়সে তিনি প্রথম গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন? প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পর পরবর্তী গ্রন্থগুলি প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের মানস-সত্তার কি কি পরিবর্তন লক্ষণীয়? লেখকের সমগ্র সাহিত্য সাধনায় ক্রমশ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে থাকলে সে পরিবর্তনের স্বরূপ কি? ইত্যাকার প্রশ্ন যখন স্বভাবতই পাঠকচিত্তকে কৌতূহলী ক'রে তোলে তখন মনে হয় আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মের সত্যিকার মূল্যায়নের ও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার দিন সমাগত। এবং এ-কারণেই সাহিত্যের অতীত ও বর্তমান এবং ঐ সময়ের সীমারেখার মধ্যে সাহিত্যিকের মানসাদর্শ, অনুভূতি, আবেগ-উপলব্ধি এবং সেইসূত্রে তাঁর বিশ্বাস, সংস্কার এবং গ্রন্থবর্ণিত নরনারীর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হয়ে পারে না।

•

দুঃখের বিষয় উনিশ-বিশ শতকের যে সব মুসলিম লেখক ও সাহিত্যিক সাহিত্য-সাধনায় অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নানা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যাঁরা অকুতোভয়ে লক্ষ্যপথে উত্তরণের প্রয়োজনে সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সবার ব্যক্তিগত জীবন-কথা এবং সাহিত্যসাধনার পূর্ণ পরিচয় এখনো পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। তবু গবেষকদের

নিরন্তর প্রচেষ্টায় আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্র যে সম্প্রসারিত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমানের লিখিত ও মুদ্রিত প্রথম পুস্তক হিসেবে স্বীকৃত "বিলাতী বর্জন রহস্য"-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। যে-বইখানি আমি দেখেছি তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। বইখানির প্রথমাংশ (টাইটেল পৃষ্ঠা) এবং শেষাংশ খণ্ডিত। শেষাংশে বইয়ের কতিপয় পৃষ্ঠা ছিন্ন হওয়ায় পরবর্তী পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। এ বইখানি সম্পর্ক হামেদ আলী নামক জনৈক সমালোচক 'উত্তর বঙ্গে মুসলমান সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক পুস্তিকা। ১ম সংস্করণ, ১৩১১ সাল। সদস্য মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত মুন্সী নজিবর রহমান প্রণীত। ভাষা সাদু বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইহার বেশ অনুরাগ আছে। ইনি আরও পুস্তক লিখিতেছেন।"[১] হামেদ আলীর মন্তব্যের উপর নির্ভর করায় সমালোচক এবং গবেষকদের পক্ষে এর বেশী কিছু বলা সম্ভব হয়নি। বইখানির একটি কপি সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হওয়ায় এখন আর কোনরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে না। এবারে বইখানির পরিচয় দেওয়া যাক্ :

'বিলাতীবর্জ্জন' রহস্যের টাইটেল পৃষ্ঠা না থাকায় সময় কাল, মূল্য এবং প্রকাশকের নাম জানা যায়নি। অতএব হামেদ আলী কথিত ১৩১১ সাল-এর প্রকাশকাল ব'লে ধরে নেওয়া যায়। এ বইয়ের 'মুখবন্ধে' গ্রন্থকার লিখেছেন,

> "বিলাতীবর্জ্জন রহস্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গবেষণা, যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই। নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও

---

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রংপুর শাখা, সম্পাদক : পঞ্চানন সরকার, ত্রৈমাসিক - ৩য় ভাগ, সন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ২২১।

দৃষ্টান্তই ইহার মূলভিত্তি। দ্রুততা ও সময়ের অভাব বশতঃ, ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। অতএব প্রার্থনা—সহৃদয় বিদ্বান্ পাঠক তজ্জন্য কপাল কুঞ্চিত করিবেন না। এই সামান্য পুস্তকে সমাজের সামান্যটুকু উপকার হইলেও শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। গ্রন্থকার।"

লেখক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন পাবনা জেলার অধীন সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাতটিকরী নিবাসী জনাব মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সাহেবকে। উৎসর্গপত্রে নজিবর রহমান লিখেছেন :

"মাননীয় সুহৃদ্,

সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, প্রায় সকল লোকই নিরন্তর স্ব স্ব স্বার্থসাধনে ব্যস্ত আছে, ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ বিশ্রামের সময়টাও তাহারা বাজনা পচালে, হাসি-তামাসায় ও তাস পাশায় ক্ষেপণ করে। কিন্তু আপনাকে সেরূপ দেখিনা। আপনি, কিসে পতিত মুসলমান জাতির পুনরুন্নতি হইবে, কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, কিসে নিরক্ষর, সরলপ্রাণ কৃষককুল পেট ভরিয়া একমুঠা ভাত পাইবে ইত্যাদি মনুষ্যোচিত চিন্তায় ও কার্য্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তাই আজ আমি আমার সাধের এই "বিলাতীবর্জ্জন রহস্য" স্বদেশী তরঙ্গের যুগে আপনার স্বদেশ ও সমাজ হিতৈষিতার কণ্ঠ-উপর হস্তে অর্পণ করিলাম। সাধের সামগ্রী সামান্য হইলেও সুহৃদের নিকট উপেক্ষণীয় নহে, ইহাই ভরসা। ইতি।"

•

মো: নজিবর রহমান সাহেব গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্রে' এবং 'মুখবন্ধে' গ্রন্থখানি রচনার উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেহেতু 'বিলাতীবর্জ্জন

রহস্য' লেখার পশ্চাতে লেখকের স্বজাতি হিতৈষণা, স্বজাতি প্রেম এবং জাতির সর্বাংগীন কল্যাণ চিন্তা লক্ষ্যযোগ্য, তাই এ গ্রন্থখানি লেখক উৎসর্গ করেছেন তাঁর মাননীয় সুহৃদ জনাব মুন্সী মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সাহেবকে যিনি "কিসে পতিত মুসলমান জাতির পুনরুন্নতি হইবে, কিসে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে, কিসে নিরক্ষর, মরণপ্রাণ কৃষককুল পেট ভরিয়া এক মুঠো ভাত পাইবে ইত্যাদি মনুষ্যোচিত চিন্তায় ও কার্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন।" সুতরাং নজিবর রহমান সাহেবের এই প্রাথমিক রচনায় (প্রকাশ, এটি তাঁর প্রথম রচনা) যে মানসিকতা অঙ্কুরিত হয়েছিল তাই উত্তরকালে 'আনোয়ারা', 'পল্লীবের মেয়ে' প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপকতালাভ করে। তিনি কোন সময়ই নিজের লক্ষ্যপথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি, কেননা জগৎ ও জীবনের চিন্তা-ভাবনায় তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। নজিবর-মানসের চারিত্র্য-নির্ণয়ে আমাদের সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এবং সেটা নজিবর রহমানের রচনার চরিত্র-বিচারে অত্যন্ত জরুরী।

নজিবর রহমানের এই গ্রন্থরচনার কালে অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে গেলে তদানীন্তন কালের শিক্ষিত মুসলমানের অবস্থা ও সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এই সময়ের মুসলমানের মধ্যে উর্দুভাষীর সংখ্যা ছিল ১৭,৮০০০০ জন এবং বাংলাভাষী ছিল ২,২২,৪৫,০০০ জন।[২] ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারী তালিকা অনুসারে জানা যায় যে, খাস বাংলার মুসলমান সংখ্যা দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষের উপর। "It is statistically proved that since 1872 out of every 10,000 persons,

---

২. Murray T. Titus, Indian Islam—A religious history of Islam in India, London, 1930, pp 240-241.

Islam has gained 100 persons in Northern Bengal, 262 in Eastern Bengal, and 110 in Western Bengal, on an average 157 in the whole of Bengal proper. The Mussalman increase is real and large. If it were to continue, the faith of Mohammed would be universal in Bengal proper in six and half centuries, whilst Eastern Bengal would reach the same condition in about four hundred years * * * Nineteen years ago in Bengal proper, Hidoos numbered nearly half a million more than Mussalmans did, and in the space of less than two decades, the Mussalmans have not only overtaken the Hindoos but have surpassed them by a million and a half."[৩] মুসলমানগণ অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর এবং দরিদ্র বাংলাদেশের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর বাংলার শাসন বিবরণীতে প্রকাশ করেছেন যে প্রতি ১০,০০০ জন মুসলমান স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র ৭ জন বিদ্যাশিক্ষা করছে, ১০ জন সামান্য মাত্র লেখাপড়া জানে।[৪] শাসক ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কার খুচেষ্টার ফলে মুসলমানগণ বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারেননি, যখন এদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটলে পাশ্চাত্য-শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। ফলে হিন্দুদের মধ্যে নতুন জীবন চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং মুসলমানদের মধ্যেও শেষে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে নতুন যুগ-চেতনা ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। কতিপয়

---

৩. Census Reports of India, 1891 (Quoted from 'আনজুমান', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২, পৃঃ ৮৩-৮৪)।

৪. Bengal Administration Report, 1892-93, p. 110.

সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের প্রচেষ্টায় কয়েকটি পত্র-পত্রিকা[৫] প্রকাশিত হ'ল। কয়েকজন সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি সভা-সমিতি-সংস্থা গঠন করলেন, মুসলমানদের মধ্যে নতুন আত্মমর্যাদাবোধ। তখন মুসলমানগণ ক্রমশ য়ুরোপীয় আদর্শে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হ'তে শুরু করেছেন। তাহ'লেও তাঁদের সামাজিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। "বঙ্গীয় মুসলমানগণ যে কি প্রকার শিক্ষিত,—শিক্ষার আবশ্যকতা কতদূর বুঝেন—তাহা কাহাকেও কষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। শিক্ষার অভাবে লোকের রুচি সভ্যতা ও অবস্থা এত অধোগামী হইয়াছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইতে নামিয়া এই দেশেই বসুমি খাটিতেছি।" "আমাদের সমাজের এমনই দুর্ভাগ্য—আমরা এমনই দরিদ্র যে, সেই তৃতীয়াংশ বেতন দিতে না পারিয়া অনেক যুবক উচ্চশিক্ষা-লাভে বঞ্চিত হইতেছে। বঙ্গীয় অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্র। নানাকারণে মুসলমানগণ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন। দরিদ্রতাই বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতির এক বিষম অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা অনধিক পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছে, অনেকেই স্ব স্ব সন্তান-সন্ততিকে ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্রতা তাহাদের সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে দিতেছে না।"[৭]

ব্রিটিশ শাসন এদেশের অন্যান্য অধিবাসীদের জন্য হিতকর হলেও মুসলমানদের অধিকাংশের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং

---

৫. সুধাকর (সাপ্তাহিক) ১৮৮৯, মিহির (মাসিক) ১৮৯১; ইসলাম-প্রচারক (মাসিক) ১৮৯১ ৮ এবং কিছুকাল পরে সোলতান (১৯০৫), মোসলেম-সুহৃদ (১৯০৭)।

৬. শেখ ফজলল করিমের প্রবন্ধ 'উন্নতির উপায় কি' ইসলাম প্রচারক'-এ প্রকাশিত। ১৯০৩, মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা, পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

৭. নওসের আলি খাঁ ইউসফজী, 'বঙ্গীয় মুসলমান'। কলিকাতা, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ৩৬-৩৭।

ক্রমক সমূলে নির্মূল হয়ে গেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের মুসলমানগণই যে শোচনীয় দুরবস্থাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তাই নয়, প্রতিবেশী জাতি সমূহের সঙ্গে তুলনায় বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজের প্রত্যেক স্তরের মুসলমানের অবস্থাই দুর্দশাগ্রস্ত। 'The Origin of the Musalmans of Bengal' গ্রন্থের লেখক খোন্দকার ফজলে রাব্বি তাই আক্ষেপ করে বলেন :

"Consequently in our opinion, all the inhabitants of the country have been benifited by the British rule, except the high and ancient Musalman families—almost all of whom have been reduced to a deplorable condition while many of them have been totally wrecked and ruined."[৮]

সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানগণ বরাবরই অনগ্রসর এর মূল কারণ হ'ল দারিদ্র্য। এদেশের জনগণের বিশেষত মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতিকল্পে খ্রিটিশ সরকার সচেষ্ট হন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তদানীন্তনকালের ইংরেজ সরকার ডক্টর ডব্লিউ হাণ্টারের সভাপতিত্বে এক শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত করেন। পাক-ভারত-বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য কি প্রকারের শিক্ষা উপযোগী সে বিষয়ে শিক্ষা-কমিশন নওয়াব আবদুল লতিফের কাছ থেকে মতামত জানতে চাইলে তিনি যে-মন্তব্য করেন তা এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেন যে, মূলত দারিদ্র্যই মুসলমানগণের উচ্চ শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। উচ্চ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা নিতান্তই সীমিত। অনেক মুসলমান ছাত্র অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা ছেড়ে দিতে

---

৮. Quoted from 'আল্ ইসলাম'—শ্রাবণ, ১৩২২, ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৪৬।

বাধা হয়েছে।[৯] এর ফলে অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন মুসলিম-সমাজ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হ'ল।[১০]

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতের হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশী উপকৃত হন। তাঁরা ইংরেজ-প্রবর্তিত চিন্তা-চেতনা অনুকরণ ক'রে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করতে শুরু করেন। ১২৯২ সালে অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা তাঁদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ক'রেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের জন্য দেশবাসী মুসলমানদেরও আহ্বান জানালেন। এদিকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের উপায় হিসেবে শাসক ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভক্ত হয় এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হয়। এই নবগঠিত প্রদেশের ভার পড়ে একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্ণরের (বামফিল্ড ফুলার) উপর। ঢাকা দ্বিতীয় রাজধানী। যেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম তৎকালে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল, কাজেই নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় মুসলমানদের উন্নতির পথ সুগম হবে এবং হিন্দু আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবে

---

৯. Nawab Abdul Lateef : A Short Account for my humble efforts to promote education, specially among the Mahomedans, Calcutta, 1885. pp. 49-51.

১০. তুলনীয় :—

"চিন্তা করিয়া দেখ, বঙ্গীয় মুসলমান, বর্ত্তমান সুসভ্য এবং সমুন্নত জগতের কত নিম্নে অসভ্য অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। শিক্ষার আলোক তাহাদের মধ্যে এখনও অতি ক্ষীণভাবেই বিস্তারিত হইতেছে। যে-যুগে ভারতের সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য-জাতি শিক্ষালোকে আলোকিত হইতেছে—যে-যুগে ভারতের অন্যান্য

আশংকায় বাংলার হিন্দু-সমাজ তার তীব্র বিরোধিতা করেন।[১১] তাঁরা বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য তুমুল আন্দোলন শুরু করেন এবং আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[১২] এই আন্দোলন ক্রমে 'স্বরাজ আন্দোলনে' রূপান্তরিত হয়। হিন্দু ছাত্রেরা এই আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করে। তাদের আগ্রহ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে আন্দোলনের তীব্রতা ও গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শহরে-মফঃস্বলে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রবলভাবে জনমত গঠিত হতে থাকে।[১৩] কোন কোন শিক্ষিত মুসলমানও 'হিন্দু পরিচালিত' এই স্বরাজ আন্দোলনে যোগ দেন; এবং তারা মিলিতভাবে বিলাত থেকে আমদানীকৃত বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বর্জনের আন্দোলন চালায়, এবং চরকায় তৈরী বস্ত্রাদি ব্যবহার করতে শুরু করে। "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কে লোকে সাধারণত 'স্বদেশী-যুগ' ব'লে

জাতির নারীগণও উচ্চজ্ঞানগৌরবে ও বিদ্যা-বৈভবে বিমণ্ডিত হইতেছেন—হায়! সে যুগেও আমরা কেমন পশুর ন্যায় অলস ও অকর্ম্মণ্যভাবে জীবন যাপন করিতেছি। আমরা সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট শক্তিশূন্য হইয়া, অবনতিস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছি, আর আমাদের পশু, মূর্খতা গোড়ামী 'আহ্‌মকী' এবং 'বেওকুফী' আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে তীব্রবেগে ধ্বংসের আবর্ত্তাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে!! (এসমাইল হোসেন সিরাজী, 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধ। 'ইসলাম-প্রচারক', ১১০৪ খ্রীঃ ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১১।

১১. মৎ লিখিত প্রবন্ধ "পারস্যপ্রতিভা'র লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্।" মাহেনও, ঢাকা, জানুয়ারী ১১৭১, পৃঃ ৩৭।

১২. সঞ্জীবনী, ১৩ই জুলাই, ১১০৫; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৩. হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার সমাজ।' কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬১, পৃঃ ৩২।

অভিহিত করে থাকে। ১৩১২ সালের (১৯০৫ খ্রীঃ) শেষ ভাগ থেকে ১৩১৮ সাল (১৯১১ খ্রীঃ) পর্যন্ত এই যুগের স্থিতিকাল।''[১৪]

বলা বাহুল্য যে, এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং হিন্দুরা মুসলমানদেরকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেন, এই সময়ে এ-ধরণের উপলব্ধি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যিক গোলাম হোসেনের (১৮৭৩-১৯৬৪ খ্রীঃ) 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান' (১৯১০) প্রকাশিত হয়। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ততা নিরসনের চেষ্টা ক'রে বই লিখলেও বইয়ের মধ্যে (ইংরেজিতে) বলেছেন,

'We must not hesitate to say that the so-called 'Swadeshi Movement' has been carried on wrong line. Surely it might be safe, if had no connection with the Partition of Bengal.'[১৫]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ও ময়মনসিংহের জমিদারদের চেষ্টায় এবং লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ব্যামফিল্ড ফুলারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাংলাদেশের মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার আদায়ের উপায় স্বরূপ মুসলিম লীগের (১৯০৬) পত্তন হয়।[১৬] মুসলিম-লীগের জন্ম উপলক্ষে ঢাকায় যে-অধিবেশন হয়,

---

১৪. অমরেন্দ্র নাথ রায়, 'বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও ভাষাপ্রীতি'। কলিকাতা, ১৯৫২, পৃঃ ৫৯।

১৫. আনিসুজ্জামান কর্তৃক উদ্ধৃত, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'। ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ৩৬৯।

১৬. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', ঢাকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৫০।

সাহিত্যিক নজিবর রহমান তাতে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেছিলেন ব'লে প্রকাশ এবং সেই সময় তদানীন্তন হিন্দু-জমিদারদের অকথ্য নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত এক অভিভাষণ পাঠ করেন।[১৭]

যাহোক, স্বদেশী-যুগের প্রেক্ষাপটে নজিবর রহমানের 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' রচিত হয়। লেখকের দৃষ্টিভংগী মুসলিম আদর্শজাত। এ-বইখানি না-প্রবন্ধ, না-নাটক। হিন্দুজাতি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধিকার অর্জনের অভিলাষে মুসলমানকে ব্যবহার করার যে প্রয়াস করেছিল সেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটনের জন্য স্বজাতি হিতৈষী লেখক এ-গ্রন্থটি রচনার তাগিদ অনুভব করেন। যে সময়ে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী, আবদুর রসুল, মৌলবী লিয়াকত হোসেন প্রমুখের মতো শুদ্ধেয় মুসলিম নেতারা পর্যন্ত সেকালে ভারতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন,[১৮] তখন মুসলিম ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' প্রণয়ন করা সহজ কথা নয়। নজিবর রহমান বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন অথচ এর সাথে কোনদিনও নিজেকে যুক্ত করেননি, বরং স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এদেশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের পথে কিভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে এ বইয়ে। লেখক অনুভব করেছিলেন যে, স্বরাজ আন্দোলনের যুগে মুসলমান সমাজের উপর হিন্দুদের আধিপত্য বিস্তারের কুফল মারাত্মক হ'য়ে উঠবে এবং হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতির প্রকৃষ্ট কল্যাণ সাধিত হবে না। তাঁর এই বক্তব্য মুসলমান পাঠক সমাজের

---

১৭. মৎ লিখিত 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন' প্রবন্ধ। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ২০।

১৮. এম. সেরাজুল হক, 'সিরাজী চরিত', কলিকাতা ১ম সংস্করণ ১৯৩৫, পৃঃ ১৫৩।

কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনে গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয় বস্তুকে নাটকের সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন নজিবর রহমান। কতিপয় চরিত্রের সৃষ্টি এ-জন্যেই। যেমন: সদু মোল্লা, মুন্সী, দীনদয়াল বসু, হাজি সাহেব, মাতু জমাদ্দার, কেতাব ফকির, মনির উদ্দীন, বালক, জনৈক মুসলমান বিধবা।

শিল্প হিসেবে গ্রন্থখানির যত না গুরুত্ব, তার চেয়ে অধিক মর্যাদা এই জন্য যে, শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উন্নততর হিন্দুজাতির সংস্পর্শে এসেও নজিবর রহমানের ব্যক্তিসত্তা অথবা সাহিত্যিক জীবনের উপর তারা মোটেই কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু মুসলমান।[১৯] ধর্মীয় জীবন এবং ধর্মীয় আদর্শ থেকে তিনি কোনদিনই বিচ্যুত হননি। এর পরিচয় তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। 'আনোয়ারা' অথবা 'গরীবের মেয়ে' বা 'হাসনবানু' বাহ্যিক উপন্যাসের মধ্যে যেসব মুসলিম চরিত্রের অবতারণা আছে সেগুলি মূলত লেখকের ব্যক্তি চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল। কেননা জীবনের সর্বক্ষেত্রে লেখকের মুসলিম-মানস নিজস্ব জীবন পদ্ধতির অন্বেষায় ব্যাকুল ছিল, তাই তিনি ধর্মীয় আদর্শকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন।[২০] আলোচ্য বই থেকে উদাহরণ দেওয়া হ'ল

"মুন্সী। তোমার যুক্তিগুলি তোমার সেই প্রাণবাতান মৌলবীর যুক্তির মত শুনিতে বেশ লাগে, কিন্তু ভিতরে গলদ

---

১৯. মৎ লিখিত 'মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক'। ১ম সংস্করণ ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ১৯১।

২০. ঐ, পৃঃ ১৯২।

ভগ। তুমি বলিতেছ—বিলাতী বর্জ্জনে দেশের মূলধন বাড়িবে, নূতন নূতন কলকারখানার সৃষ্টি হইবে। তা ঠিক। আবার ইহাও ঠিক যে, দেশের জমিদার তোমরা। কুসীদ-গ্রাহী তোমরা, চাকুরে তোমরা, শিল্প, বাণিজ্য, কন্ট্রেক্টরী, দালালী সবই তোমাদের আয়ত্তাধীন। সুতরাং বিলাতী বর্জ্জনের ফলে যে উন্নতি হইবে তাহা তোমাদেরই হইবে—মুসলমানের নহে। তোমরা যদি মুসলমানদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে, তবে তোমাদের উন্নতির ফলভোগী মুসলমানে হইতে পারিত। কিন্তু ভাই, মুসলমানদিগের সহিত তোমাদের যেরূপ সম্ভাব তা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তোমার মুখে আজ জোলার উন্নতির কথা শুনিয়া হাসি পাইল। তাই তোমাকে এ সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি ধর্ম্মতঃ সত্য উত্তর দিবে।

দীন দয়াল। কি কথা?

মুন্সী। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে তোমরা কি কখন জোলার কাপড় ব্যবহার করিয়াছ?

দীন। না।

মুন্সী। বর্ত্তমান সময়ে কর কি?

দীন। করি কিন্তু বড়-বেশী-না।

মুন্সী। হিন্দুর বাড়ীতে জোলার কাপড়ের বেশী চল আছে কি?

দীন। না।

মুন্সী। মফস্বল, সহর, বন্দরে, হাটে বাজারে যে ২/৪ খানা জোলার দোকান আছে, তাহাতে তোমাদের হিন্দুদিগকে কাপড় কিনিতে সচরাচর দেখিয়াছ কি?

দীন। না।

মুন্সী। তবেই দেখ, তোমার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে, তোমরা ভোলার কাপড় আদৌ পর না।

দীন। (আমতা আমতা করিয়া) হাঁ।

(পৃঃ ৬৪-৬৪)।

অন্যত্র মুসলমান। .....ভাই হিন্দু, স্বদেশী চরকা তুলিয়া তোমরা তলে তলে যে কত ছলনা, স্বার্থের ফাঁদ পাতিয়াছ, তাহা কত বলিব। সেদিন কোন নগরের উপকণ্ঠেই দেখিলাম বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—দেশী শান্তি চুরটের দোকান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কতকগুলি ভিজা তামাকের পাতা দোকান ঘরে ছড়ান রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দিয়া চুরট হয় না কি? দোকানদার হিন্দু, বলিল, হাঁ, ইহাতে সন্দিকাশ নাশক মূল্যবান মসলা সংযোগ করিয়া চুরট তৈয়ার হয়। সর্দ্দি আমার চিরসঙ্গী শত্রু, তাই আরোগ্য আশায় এক পয়সায় ৪টি খরিদ করিয়া দেশী অভাবে বিলাতী দেশলাই ঐ দোকান হইতেই খরিদ করিয়া তাহার সাহায্যে সেই দেশী শান্তির মুখে অগ্নি সংযোগ করতঃ টানিতে টানিতে পথে চলিলাম। রাত্রিতেও শান্তির ধূম সেবন করিলাম। কিন্তু সর্দ্দিকাশির উপশম ত দূরের কথা, চুরটের আস্বাদটুক পাইলাম না।.....

তারপর তোমরা যেভাবে সাধারণের নিকট বিলাতী জিনিসের কুৎসা রটাইয়া, উহার বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, তাহা যে কতদূর অন্যায় তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। বিলাতী চিনিতে নিষ্ঠিবন দেওয়া, বিলাতী নবনী শূকর ও গরুর রক্তচর্ব্বি মিশাইন করা, ইত্যাদি কত কি পুর্ণাম তোমরা রাষ্ট্র করিতেছ।"

(পৃঃ ১৮-১৮)

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের ব্যক্তি-চেতনা ও লেখক-মানসের দুটি দিকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল।

প্রথমত, বিলাতী দ্রব্য বর্জনের পশ্চাতে হিন্দুদের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের উদ্দেশ্য স্পষ্টতর হয়েছে। এবং এ আন্দোলন যে মূলত মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী সে বিষয়ে কতিপয় concrete উদাহরণ লেখক পাঠক-সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয়ত, স্বদেশের প্রধান শক্তির উৎস যে কৃষককুল তাদের জীবন উন্নত করার জন্য যারা মূলত দায়ী সেই হিন্দু কুটীরশিল্পীদের হাত থেকে কৃষককুলের উদ্ধার সাধনের প্রয়োজনে লেখকের উদাত্ত আহ্বান। দেশের ও সমাজের সর্বাংগীন কল্যাণ বিলাতীবর্জনে নয়, প্রকৃত মনুষ্যত্ব রক্ষায়।[২১]

নাটকীয় আঙ্গিকে এ গ্রন্থ রচিত হলেও এটি নাটক নয়, কেননা নাটকের মতো দৃশ্য-অংকের অবতারণা নেই। তাছাড়া, নাটকের যে মূল গর্ভ চরিত্র-সৃষ্টি সেটা এ-বইতে লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য হল, স্বদেশী-যুগে এ-দেশের মুসলমানের জীবনে বিশেষ করে কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাকে পাঠকসমাজের সামনে তুলে ধরা এবং এই জটিল সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করা। এবং শুধু সেই কারণে তিনি সংলাপ ও চরিত্রের সাহায্য নিয়েছেন।

---

২১. 'বিলাতী বর্জন রহস্য'-এর উৎসর্গপত্রেও এ মন্তব্যের সমর্থন আছে। এবং অন্ততম চরিত্র মুন্সীর উক্তি লক্ষণীয় :—

"……এ বেটা হিন্দু কি দয়াধর্ম্ম এককালে বিসর্জ্জন দিয়াছে ?…… জানি না, এই পাষণ্ড কাফের কত নিরক্ষর চাষার এইরূপে সর্ব্বনাশ করিয়া পাপোদর পূর্ণ করিতেছে। খোদায় আর কতকাল বঙ্গীয় মুসলমানকে পাপমতি জুয়াচোরদিগের স্বার্থের যাঁতায় নিষ্পেষিত করিবে ? (বিলাতী বর্জন রহস্য, পৃঃ ৫৬)।

তাছাড়া, আধুনিক বাঙালির জীবনে যে-সব সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তাকে ভিত্তি করে বাংলা নাটক রচিত হ'তে পারে কি না, তাও গভীর ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা প্রয়োজন। যেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্য জীবন একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ (Materialistic), তাই অর্থনৈতিক সমস্যা তার জীবনের একটি গুরুতর ও অপরিহার্য সমস্যা।[২২] এ দ্বারা তার জীবনের ব্যষ্টি ও সমষ্টির সকল ব্যবহারিক সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে—অর্থনৈতিক সমতা (equilibrium) সৃষ্টিই পাশ্চাত্য সমাজভুক্ত নরনারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।[২৩] তথাপি এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অর্থনৈতিক সমস্যার মতো এক সাময়িক বিষয় উচ্চতর নাট্যরচনার উপজীব্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কেননা এর সর্বজনীন আবেদন নেই।[২৪] তাছাড়া সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যদি চরিত্রের কোন বিকাশ সাধিত না হয় তাহ'লে শিল্প ও সাহিত্যের মানদণ্ডে তা মূল্যহীন। অতএব নাটক হিসেবে ব্যর্থ। তাছাড়া গ্রন্থের কোন কোন চরিত্রের মাধ্যমে নজিবর রহমান টাকা-আনার হিসেব কষেছেন, জমি খরিদের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন, অগ্রিহার সুদে টাকা কর্জের বিষয় পাঠকের গোচরে এনেছেন। এতে ক'রে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা সুস্পষ্টরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বটে কিন্তু নাট্য-সংলাপ হিসেবে একান্তই অনুপযোগী; কেননা নাটকে চরিত্রই মুখ্য এবং সে চরিত্র ফুটে ওঠে যথোপযুক্ত নাট্য-সংলাপে। উদাহরণ উপস্থিত করছি :

"দীন দয়াল। আমি বন্ধকাদি বড় রাখি না। তবে বিধবা বিপদে পড়িয়া আসিয়াছে, টাকা প্রতি ৵০ আনা সুদে ১৲টি টাকা দেওয়া যাইতে পারে।

---

২২. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'. (১ম খণ্ড) কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৬।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. প্রাগুক্ত।

(এই কথা শুনিয়া মুন্সী সাহেব মনে মনে) ধিক্‌রে সুদখোর কায়েত। তোর পয়ার মস্তকে শত পদাঘাত। (এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইয়া বিধবাকে ১৲টি টাকা দান করিয়া বালাজোড়া কেরত দিলেন তারপর ঘরে আসিয়া -)

মুন্সী। ভাই দীনদয়াল, একটু মনোযোগ দিয়া শুন। বিনোদপাড়ার সদুনোল্লা পেট ভরিয়া এক মুঠা ভাত খাইবার আশায় ছোট ভাইদের সহিত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ১৫৲ টাকা সংগ্রহ করতঃ তিন কুড়া জমি খরিদ করিল, কিন্তু নায়েবের চুল চাতুরীতে খালাতন হইয়া তোমার নিকট হইতে ও সারদা দাসীর নিকট হইতে ৩ পক্ষ অধিকার সুদে ১০৲ টাকা কর্জ্জ করিয়া জমিদার নায়েবের পেট ভরিল। নরপিশাচ নায়েব খাজানার অজুহাতে সদুর নিকট হইতে ২৫৲ টাকা চুরি করিয়া খাইল। এ টাকাও সে তোমার নিকট কর্জ্জ করিয়া দিয়াছে। ফলকথা জমিদার ভৃত্যের এই প্রবঞ্চনার ফাঁদে পড়িয়া সদু অল্প সময় মধ্যে (৫০৲ + ২৫ + ২৯৷৷০ + ৩৬) = ১৪০৷৷০ অকারণ ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়িল। এই ঋণ সুদে আসলে শোধকরা সদুর পক্ষে অসাধ্য। তোমরাও আগামীর রক্ত মাংস চর্ব্বণে লোলজিহ্বা বাহির করিয়া বসিয়া আছ। কাজেই তাহার ভোগ্য ঘটী বাটী সবই তোমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে।

রতন দিয়ারের মালু, আকবাল, বৈদ্যনাথের কেতাব ফকির প্রভৃতি ধর্ম্মার্থে কোরবাণী করিয়া নায়েব ম্যানেজারের অত্যাচারে পথের কাঙ্গাল হইয়াছে। এই অজুহাতে সেই ক্ষুদ্র দুখানি গ্রামের সরল প্রাণ নিরক্ষর চাষার ঘর হইতে জমিদার ও তস্য ভৃত্য, দারোগা, মহাজন, মোক্তার প্রভৃতির ঘরে ৩০০০ টাকারও বেশী উঠিয়া গিয়াছে। কালু মোল্লা, গহর প্রামানিক ও ছনির আকন্দের দাদন অস্থাবর সম্পত্তি আজ বিদেশী পোদ্দারের হাতে গেল।

মহেশের মোহন্ত কর্তৃক অনাথা বিধবার আর্থিক সর্ব্বনাশের কথাও প্রত্যক্ষ অবগত হইলে। ভাই দীনদয়াল, আজ সদু, মানু, মনির উদ্দীন সেখের দুরবস্থা যাহা স্বচক্ষে দেখিলে, স্বকর্ণে শুনিলে, সুবিশাল বঙ্গের সর্ব্বত্রই এইরূপ লক্ষ লক্ষ সদু, মনির উদ্দীন, শত শত জমিদার ও জমিদারভৃত্যাগণের পৈশাচিক অত্যাচারে উৎসন্ন যাওয়ার পথে দাঁড়াইয়াছে। লক্ষ লক্ষ কেতাব, আফজাল, তাহাদের পবিত্র ধর্ম্ম কার্য করিতে যাইয়া শত শত জমিদার ভৃত্য বাহাদুর কর্তৃক পাদুকা প্রহারে জর্জ্জরিত ও ছিন্নশ্মশ্রু হইয়া ঘৃণায় অপমানে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু সেই ভৃত্য বাহাদুরগণের অনন্ত জোগাড় কৌশলে, তাহাদের অমানুষিক অত্যাচার দমনে বিফল মনোরথ হইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় দিনরাত চোখের জল ফেলিতেছে। গফের, কালু, ছবিরের ন্যায় লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রজার ঘর বাড়ী ক্রোক জব্দ, তোমার ও বিপিন পোদ্দারের ন্যায় শত শত উত্তমর্ণের অগ্নিহার সুদী টাকার দায়ে নীলাম হইতেছে। ইত্যাদি।" (পৃঃ ৫৭-৬২)

সংলাপে এই ধরণের টাকা-আনার হিসেব অন্যত্রও আছে।[২৫]

মোহাম্মদ নজিবর রহমান নিজের এই গ্রন্থখানিকে 'নাটক' আখ্যায় আখ্যায়িত করেননি। করলে 'মুখবন্ধে' তার উল্লেখ থাকত। বইখানির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি একটিমাত্র উক্তি করেছেন, 'নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও দৃষ্টান্তই ইহার মূল ভিত্তি।' অবশ্য এ উক্তি নাটক সম্পর্কেও প্রযোজ্য কিন্তু এখানে লেখক যে-অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সমস্যাকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং প্রবন্ধের মতো সুবিস্তৃত বক্তব্য বহুস্থলে জুড়ে দিয়েছেন, সেটা মূলত প্রবন্ধের মাধ্যমে রচিত হলেই শোভন হতো। লেখক 'বিলাতী বর্জন রহস্য'-যে নাটকীয় পোশাক পরালেও পাঠকের কাছে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, নাট্য-বর্ণিত চরিত্রের ন্যায় এ-বইয়ের চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই। নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্বই প্রধান। তাছাড়া, যে "নারী-জীবন

---

২৫. বিলাতী বর্জন রহস্য, পৃঃ ৩৮-৪৪, ৪৮-৫১, ৫৫।

সমাজ-জীবনের একটি প্রধান অংশ, শুধু প্রধান অংশই নহে, একদিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে নারীই প্রকৃতপক্ষে সমাজ জীবনের মধ্যমণি স্বরূপ''[২৬] এ-গ্রন্থে তার ভূমিকা উপেক্ষিত।[২৭] এতদ্ব্যতীত ভাষা, শব্দচয়ন কোনটাই নাট্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নয়। তবে কোন কোন চরিত্রে এমন কিছু সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে যা বিদ্রূপাত্মক হলেও রচনাকে এক ঘেঁয়েমী দোষ থেকে মুক্ত করেছে। যেমন

ক. হা বিধাতা:। এমন মূর্খের সহিত কথা বলিতে আছে। (পৃ: ২)

খ. কুয়ার বেঙের নিকট সে পরিচয় দিয়া লাভ কি ? (পৃ: ২)

গ. ইহাদের স্বভাব নেংটে ইঁদুরের স্বভাবের ন্যায়। (পৃ: ৯)

ঘ. গোময় তোমরা পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ কর, আমরা অতিশয় অপবিত্র জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করি ? (পৃ: ১১)

ঙ. ভাই, তোমার স্বভাব দেখছি জলৌকার মত। জলৌকাগুলি যেমন সমতল জলের উপর দিয়া যাইতেও আঁকে বাঁকে চলে, তুমিও সেইরূপ সাদা-সিধে ভাল কথার মধ্যে জটিল বেঁকা কথার অবতারণা কর। (পৃ: ১৩)

চ. ভাই, তুমি যখন তোমার পিণ্ড ছাড়িতেছে না, কথার কথা বাড়াইয়া চলিলে, তখন তোমাকে বিলাতী বর্জ্জন উপলক্ষে তোমরা যে ছল চাতুরী আরম্ভ করিয়াছ তাহা একটু খুলিয়াই বলিতে হইল। (পৃ: ১৪)

ছ. পাণ্ডা ঠাকুর বস বস। রেগে যে টং হয়েছ। (পৃ: ১৯)

---

২৬. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

২৭. কেবল একটিমাত্র বিধবা চরিত্রের অবতারণা আছে। (পৃঃ ৫৬-৫৫ দ্রষ্টব্য)।

ঙ. এখন দেখিতেছি তুমি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এক অস্ত ধামাধরা পোষ্যপুত্র। (পৃঃ ১৯)

ঝ. তোমার কথায় প্রমাণ হইতেছে তোমাদের ন্যায় মূর্খ ও কাপুরুষ জাতি জগতে আর নাই। (পৃঃ ২১)

ঞ. তোমাদের পাণ্ডাপ্রভুরা যে কারণ ধরিয়া ঘোষণা জারী করিয়াছিলেন, পরে ফুলার সাহেবের গুতার ভয়ে সদ্য সদ্য যাহা হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। (পৃঃ ৩০)

ট. লোকে বলে হিন্দু মরিলে ভূত হয়, আমি দেখছি, তোমরা মরার আগেই ভূত হইয়াছ। (পৃঃ ৩৪)

ঠ. তোমার ঐতিহাসিক যুক্তিকে সেলাম। (পৃঃ ৩৫)

ড. জানি না, এই পাষণ্ড কত নিরক্ষর চাষার এইরূপে সর্বনাশ করিয়া পাপোদর পূর্ণ করিতেছে। (পৃঃ ৫৬)

ঢ. তোমার যুক্তিগুলি তোমার সেই প্রাণঘাতক মৌলবীর যুক্তির মত শুনিতে বেশ লাগে, কিন্তু ভেতরে গলদ ভরা। (পৃঃ ৬৩)

ণ. তোমাদের বাবুনীরা যদি বলেন যাবজ্জীবন উলঙ্গ থাকিব তাও সার্থক তবু জোলার শাড়ী পরিব না। (পৃঃ ৬৭)

ত. দীন। তোমার মুখ বড়ই বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে।

মুন্সী। কেন?

দীন। আমাদিগকে বীবরের সহিত তুলনা কর কোন্ আক্কেলে? (পৃঃ ৬৯)

নাটকের সংলাপ আগাগোড়া মোটামুটি সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। তবে এই মিশ্র ভাষা অনেক ক্ষেত্রে গতিশীল। তাতে মনে হয়, বাস্তবিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে হয়ত নাটক রচনা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না। কিন্তু কোনদিন নাটক লিখবেন সে চিন্তা বোধকরি তিনি মনের কোণে স্থান দেননি। এবং সেইজন্য উত্তরকালে তিনি যে-ক খানি প্রহসন ও প্রকাশ

করেছিলেন সেগুলির কোনটিই নাটক নয়। তিনি কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন। দু'একটি প্রবন্ধ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৮] উপন্যাস-রচনার জন্যই ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি পাঠক সাধারণের কাছে পরিচিত। অথচ তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলি বিশেষত 'বিলাতী বর্জন রহস্য' লিপিবদ্ধ করার সময় তিনি যে কৌশল অনুসরণ করেন তার সঙ্গে পাঠক-সাধারণের বড় একটা পরিচয় নেই। কেননা বইখানি সাধারণ্যে দুষ্প্রাপ্য। পত্রিকাতেও কেউ আলোচনা করেননি। সুধীসমাজের সুবিধার্থে বইখানির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থিত করা হ'ল।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা

আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৪।

খাঁ ইউসুফজী, নওসের আলি, বঙ্গীয় মুসলমান, কলিকাতা, ১২৯৭ সাল।

গোলাম সাকলায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৯৬৭।

---

২৮. হামেদ আলী মন্তব্য করেছেন যে, 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' নামে (প্রকাশিত ১৩১১ সাল) তাঁর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত হয়। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। রংপুর শাখা, ত্রৈমাসিক, তৃতীয় ভাগ, সন ১৩৫৫, পৃঃ ১২৯) 'ইসলাম-প্রচারক' (ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্রিকা) থেকে জানা যায় যে, মোহাম্মদ নজিবর রহমান আরো কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেমন: (১) পবিত্র নিদর্শন, মুসলমানের সপ্তরত্ন, (২) তীব্বতে মুসলমান এবং তীব্বতবাসীর আচার-ব্যবহার, (৩) পূর্বস্মৃতি—কুতবুদ্দীন আয়বক। প্রবন্ধত্রয়ের শেষে লেখক নিজের নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—'মহাম্মদ নজিবর রহমান, ভাদাঘাড়ী—সলপ; পাবনা।' ইসলাম প্রচারক, জুলাই-আগষ্ট, ১৯০১ পৃঃ ২৮-৩৮ রচনাত্রয়ের মধ্যে লেখকের জাতীয় চেতনা ও ধর্মবোধ যুগপৎ প্রতিফলিত হয়েছে।

Titus, Murray T, Indian Islam—A religious history of Islam in India, London, 1930.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২৮-২৯, ২য় খণ্ড, কলিকাতা।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৬০।

মুখোপাধ্যায়, হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৩৬১।

রায়, অমরেন্দ্র নাথ. বঙ্গ সাহিত্যে স্বদেশ প্রেম ও ভাষাপ্রীতি, কলিকাতা, ১৯৫২।

Lateef, Nawab Abdul, A Short Account for my humble efforts to promote education, specially among the Mahomedans, Calcutta, 1885.

সুফিয়ান, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ, বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস. ঢাকা, ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ। প্রকাশ-কাল (?)

হক, এম. সেরাজুল, সিরাজী চরিত, কলিকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৩৫।

পত্র-পত্রিকা

আল্‌ইসলাম, কলিকাতা, ১৩২২ শ্রাবণ।

ইসলাম-প্রচারক, কলিকাতা, ১৯০১ জুলাই-আগষ্ট, ১৯০৩ মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৪, মে-জুন।

Census Reports of India, 1891.

Bengal Administration Report, 1882-83.

বাঙ্‌লা একাডেমি পত্রিকা, ঢাকা, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৬৪, পৌষ-চৈত্র।

সঞ্জীবনী, কলিকাতা, ১৯০৫, ১৩ই জুলাই (২য় ও তৃতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ)।

সাহিত্য পরিষৎ, রংপুর শাখা, ত্রৈমাসিক —৩য় ভাগ, সন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

মাহেনও, ঢাকা, ১৯৭১, জানুয়ারী।

মূলগ্রন্থ থেকে সংকলিত

খোদা তরসা

বিলাতী বর্জ্জন রহস্য

মুসলমানের বৈঠকখানায় হিতবাদী হস্তে চলমাবাদী হিন্দুর প্রবেশ।

মুসলমান। এস এস, ... পাও, এস আজ তোমার জন্য ১০ ঘা বেতের ব্যবস্থা করিব।

হিন্দু । তা পার, কারণ আজকাল তোমরা যে, ফুলার সাহেবের প্রিয়তমা বিবি হইয়া উঠিয়াছ।*

মুঃ । না ভাই ঠাট্টা করছি না, খবরের কাগজে দেখিলাম ..... একটি স্কুলের ছেলেকে, জরিমানা না করিয়া ১০ ঘা বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিঃ । আর কত কি হবে, হউক, হিন্দুর পথ 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'।

---

* নূতন প্রদেশের ছোটলাট মিঃ ফুলার সাহেব বাহাদুর কোন দরবারে নাকি হিন্দু-মুসলমানকে ২টি স্ত্রী বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। —গ্রন্থকার।

মুঃ । তা বটে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য শরীর পতন করিতে কে না পারে ?

হিঃ । তবে স্বদেশী সেবায় যোগ দেও না কেন ?

মুঃ । তাহাতে মুসলমানের লাভ কি ?

হিঃ । হা বিধাতঃ। এমন মূর্খের সহিত কথা বলিতে আছে। আরে গোখাদক গণ্ডমূর্খ। স্বদেশী সেবায় দেশের টাকা দেশে থেকে যাবে, তাতে দেশের হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই উন্নতি হবে, তাহার ফলে তোমার আমার অর্থ কষ্ট দূর হবে। এই সার কথাটি বুঝি তোমার মাথায় আজ পর্য্যন্ত ঢুকল না। তা না ঢুকুক, তোমার সমাজের উচ্চশিক্ষিত ধীমান, সমাজনেতা মহাত্মাগণ ইহার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া এখন স্বদেশ সেবায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মুঃ । তাঁহাদের দুই একজনের নাম কর দেখি।

হিঃ । কুমার বেড়ের নিকট সে পরিচয় দিয়া লাভ কি ?

মুঃ । (ঈষদ্ধাস্যে) নামগুলি শুনিলে অনেকটা ধাঁ ধাঁ ঘুচে যাবে আর তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার সহিত আলাপ করিতেছ, তোমার সে উদ্দেশ্যও হয়ত সফল হইতে পারে।

হিঃ । তবে শুন, বগুড়ার নবাব আবদুস ছোবহান চৌধুরী সাহেব, সেলদুয়ারের গজনবী সাহেব, করটিয়ার জমিদার ওয়াজিদ আলী খাঁ সাহেব, মৌলবী আবুল হোসেন, আবদর রহিম সাহেব, রঙ্গপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার আরও অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার সাহেবগণ আজকাল স্বদেশী গুভমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

মুঃ । ঢাকার নবাব সাহেবের নামটা বলিতে বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ ?

হিঃ । (রাগান্বিত হইয়া) অমন দুই-একটা ইংরেজের ধামাধরা নবাব, স্বদেশী গুভমেণ্টে যোগ না দিলে কিছু আসে যায় না।

মুঃ । তা বটে। হিন্দুর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ।

হিঃ । শুধু হিন্দু বলিবে কেন? স্বদেশ হিতৈষী অনেক বড় বড় মুসলমানও একথা বলিতেছেন।

মুঃ । পতিত মুসলমান বলে চাকরি নবাব অপেক্ষা বড় পদের লোক বড় নাই।

হিঃ । তা যাক, সেদিন টাউন হলে তোমাদের সমাজেরই নেতা মৌলবী সাহেব সভা করিয়া স্বদেশ সেবার সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝি জান না?

মুঃ । না, কি বলিয়াছেন?

হিঃ । সেদিন সভায় অন্যূন পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া স্বদেশী সেবার অনুকূলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেরূপ বক্তৃতা আমরা পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। আমার বোধহয়, তোমাদের সমাজে অতবড় বিদ্বান, বহুদর্শী উচ্চপদস্থ সুবক্তা বুঝি আর নাই। মৌলবী সাহেবের প্রত্যেক কথাই প্রাণ মাতান।

ভাই মুসলমান। দেখ দেখি তোমার জাত ভাই মৌলবী সাহেবের দৃষ্টান্তগুলি কত মূল্যবান ও যুক্তিপূর্ণ, ইহার সারটুকু বুঝিলেই ত তোমার দুর্বুদ্ধি দূর হইতে পারে। ... ... ভাই তুমি যদি সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহার বক্তৃতা শুনিতে তবে তোমার মন নিশ্চয়ই বিলাতী বর্জ্জনের দিকে ঝুঁকিত।... ইংরেজ রাজত্বে দেশের আর্থিক দুরবস্থার হৃদয়ভেদী কারণ যাহা মৌলবী সাহেব বর্ণন করিলেন, তাহা শুনিয়া সেই বিরাট সভায় কেহই চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারে নাই। অধিক কি বলিব, অনেক মেয়ে, মৌলবী সাহেবের বক্তৃতায় বিলাতী জিনিষের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া সেই প্রকাশ্য সভামধ্যে তাহাদের সাধের কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া 'এ জন্মে আর উহা পরিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এবং প্রত্যেকে

দেশীয় শিল্পের উন্নতি কল্পে ১৲ টাকা করিয়া চাঁদা মৌলবী সাহেবের হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

মুঃ । ভাই, ... পাণ্ডা হইয়া, দেখছি, বেশ একজন বক্তা হইয়া উঠিয়াছ।

হিঃ । ঠাট্টা রাখ, তুমি যে ... ... শব্দ শুনিয়া মুখ বিকৃত কর, সেই মহার্ঘ-শব্দের জন্ম কোথা হইতে হইয়াছে তাহা কি জান?

মুঃ । ফল কথাটার জন্ম তোমাদের সংস্কৃত ভাষা হইতেই হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, বঙ্কিমচন্দ্রের নভেলে প্রথম একথা দেখিয়াছি।

হিঃ । এখন আমার মন্ত্রে তুমি দীক্ষিত হইবে কি না? শুনিতে চাই।

মুঃ । তুমি যে মৌলবীর দোহাই দিয়া আমাকে তোমার মতাবলম্বী হইতে বল সেই মৌলবীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তোমার কথার ভাবে বুঝিতেছি মৌলবীটি নিষ্ঠুর বারিষ্টারদিগের করুণা-ভিখারী সমাজদ্রোহী লোক। নামাজ রোজা করাকে, ইহারা অজ্ঞ লোকের মূর্খতা বলিয়া ধরে। বোধহয় মৌলবীটি হ্যাট কোটধারী হইবে।... ...

হিঃ । (রাগান্বিত হইয়া) ইহা তোমার ভয়ানক গোড়ামী ও মূর্খতা বই আর কি বলিব? কারণ মৌলবী যে স্বভাবেরই হউক না কেন তাহা দেখিবার দরকার কি? তাহার কথাগুলি ন্যায় ও সর্ব্ববাদী সম্মত কি না? জ্ঞানী লোক তাহারই বিচার করিবেন।

মুঃ । আচ্ছা তাহাই হউক, তোমার প্রাণ মাতান মৌলবী সাহেব, হিন্দু-মুসলমানের রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম আরোপ করিয়া উভয় জাতিকে একপ্রাণে বিলাতী বর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশের বাহিরের ভাবটা যেমন প্রাণমাতান, ভিতরের ভাবটা তেমনি প্রাণঘাতী। তোমার মৌলবী যদি মফঃস্বলে আসিয়া

হিন্দু-মুসলমানের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, চলন চরিত্র, ধর্ম্মাধর্ম্মের অবস্থা স্বচক্ষে তলাইয়া দেখিতেন, তবে আর উভয় জাতির এক প্রাণতার কথা বলিতে সাহস পাইতেন না।..... এক নৌকায় হিন্দু-মুসলমান থাকিলে উভয়কেই উপবাসে মরিতে হয়। এক বিছানায় উঠাবসা তামাক খাওয়া পর্য্যন্ত চলে না। ভাই হিন্দু, আর বেশী বলিব না, যে ধর্ম্মভাব হইতে প্রকৃত একতার উৎপত্তি, সেই ধর্ম্মভাবেই যখন হিন্দু মুসলমানের এইরূপ দারুণ পার্থক্য রহিয়াছে, তখন উভয় জাতির রাম-লক্ষ্মণরূপে কার্য্য করা কিরূপে সম্ভবে?

হিঃ। ভাই, তোমার স্বভাব দেখছি জলৌকার মত। জলৌকাগুলি যেমন সমতল জলের উপরি দিয়া যাইতেও আঁকে বাঁকে চলে, তুমিও সেইরূপ সাদাসিধে ভালকথার মধ্যে জটিল বেঁকা কথার অবতারণা কর। তা ভাই, হিতে বিপরীত বুঝিলে তোমাকে কি করা যায়।

মুঃ। ভাই, আমি হিতে বিপরীত বুঝি নাই, বরং তুমিই আমার হিতের ছলনায় বিপরীত ঘটাইতে চাও।

হিঃ। স্বদেশের উন্নতি লইয়া কথা। আমরা বিলাতের জিনিস ব্যবহার করিয়া দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছি, আর কিছুদিন এইভাবে চলিলে আমাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিক্ষারী হইতে হইবে। তাই স্বদেশী বস্তু ব্যবহার করিয়া দেশের টাকা দেশে রাখিয়া দেশ রক্ষা করিতে তোমাদের সহিত একমত হইতে চাই।..... এখন আবার বলিতেছ, আমি তোমার হিতের ছলনায় বিপরীত ঘটাইতে চাই। ধিক্ তোমার মুসলমানী বুদ্ধিকে।

মুঃ। ভাই, তুমি যখন আমার পিতা ছাড়িতেছ না, কথায় কথা বাড়াইয়া চলিলে, তখন তোমাকে বিলাতী বর্জ্জন উপলক্ষে তোমরা যে ছল চাতুরী আরম্ভ করিয়াছ তাহা একটু শুনিয়াই

MANUSC

বলিতে হইল। ... ... তুমি যে বলিয়াছ বগুড়া, করটিয়া প্রভৃতি স্থানের নবাব জমিদারগণ স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, একথা সৈব্বৈব মিথ্যা। বঙ্গের মুসলমান জমিদার নবাবগণ কেহই তোমাদের বিকৃত আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। ... ... তোমাদের নিকট পসার প্রতিপত্তি স্বার্থসন্মান পাইবার আশাতে ২/৪ জন মুসলমান সমাজদ্রোহী কুলাঙ্গার ঐ সকল সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়াছে। ফলতঃ কলা, ছোলা খাওয়াইয়া সার্কেলের পাওয়া যেমন বাঁদর দ্বারা নাচাইয়া আসর জমকায়, সেইরূপ তোমাদের পাণ্ডারাও স্বদেশী-পর্ব্বে আসর জমকানের জন্য ঐ জাতীয় ২/৪টা মুসলমানকে ঐ জাতীয় লোভ দেখাইয়া বক্তৃতার রঙ্গমঞ্চে নাচাইতেছে।... ... তারপর তোমরা যেভাবে সাধারণের নিকট বিলাতী জিনিসের কুৎসা রটাইয়া, উহার বর্জ্জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ, তাহা যে কতদূর অন্যায় তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।...

হিঃ। বিলাতী বর্জ্জনের মহত্ত্ব তোমার মাথায় প্রবেশ করে নাই।

মুঃ। মহত্ত্ব বুঝিয়াছি, কিন্তু তোমাদের ভণ্ডামীতে মহত্ত্বের মূল্য কমিয়া গিয়াছে।

হিঃ। ভণ্ডামী কিরূপে হইল?

মুঃ। তাহার উপসর্গগুলি ত পূর্ব্বেই বলিলাম।... ... ...

হিঃ। ... ... আজকাল ফুলার সাহেব যে তোমাদিগকে চাকুরী দেওয়ার ধুয়া তুলিয়াছে উহা ছলের প্রীতি বই আর কিছু নহে। আজকাল আবার তোমরা এই ছলের প্রীতিতে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছ। ... ... আমরা যে বিলাতী বর্জ্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছি তাহাতে ব্রহ্মদত্য ধূর্ত্ত ফুলার ভাবিয়াছেন, কি জানি, এ-সময় যদি মুসলমান ভূতগুলো হিন্দুদিগের সহিত একমত হইয়া উঠে, তবে ত কঠিন ব্যাপার। তাই

তোমাদিগের মন রাখার জন্য ছলের প্রীতি দেখাইয়া চাকুরী দেওয়ার কথা তুলিয়াছেন।... ...

মুঃ । ... ... ভাই হিন্দু, তোমাদের মুসলমান বিদ্বেষের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। মুসলমান যোগা হইলেও তোমাদের নিদারুণ হিংসায় তাহারা আজ অফিস আদালতে জমিদারের কাছারিতে মহাজনের ঘরে শিক্ষা-বিভাগে কোন চাকুরীতেই ঢুকিতে পারিতেছে না। ... ভাই, সংসারের উন্নতি লইয়া মুসলমানদিগের সহিত তোমরা এতখানি বন্ধুত্ব ও নেমকহারামী করিতেছ। ইহার উপর তোমরা আমাদের ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করিতেও ছাড়িতেছ না। কোরবাণী আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম-কার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ; কিন্তু তোমাদের ধার্ম্মিক (?) জমিদার প্রভুরা প্রজার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানের এই ধর্ম্মকার্য্য প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে।...

হিঃ । বঙ্গবিচ্ছেদে আমাদের মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। ইহা ধ্রুব সত্য।

মুঃ । ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের শাসন সংরক্ষণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা দেশটাকে দুই ভাগ করিয়া লইয়াছেন তাহাতে তোমাদের মনে আঘাত লাগে কেন?

হিঃ । (অট্টহাস্য) এতক্ষণে তোমার বুদ্ধির আসল পরিচয়টা পাওয়া গেল। তবে এখন উঠি, আর বাগযুদ্ধে প্রয়োজন নাই, ঢের হইয়াছে। বেলাও ঢের হইয়াছে (উঠিতে উদ্যত)।

মুঃ । তোমরা নব্য, ভব্য, শিক্ষিত, ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, পৌরুষ-শালী, উচ্চপদস্থ ও উচ্চ-উপাধিধারী তা তুমি অকারণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলে আর উপায় কি?

(উভয়ের গাত্রোত্থান ও প্রস্থান)।

(পরদিন প্রাতে হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমানের উপস্থিতি)।

মুঃ । ভাই, কল্য রাগের বশে, তোমার প্রিয়তম হিতবাদী ও চসমাখানি আমার ওখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলে। এই নাও।

হিঃ । (গ্রহণ করিয়া) থ্যাংস, চাকর দিয়া পাঠিয়ে দিলেই ত হইত। নিজে বহন করিয়া আনিবার কি দরকার ছিল ?

মুঃ । তাতে দোষ কি ?

হিঃ । (একখানি লোহার চেয়ার দেখাইয়া দিয়া) বস। হিতবাদী পড়িয়াছ ?

মুঃ । পড়িয়াছি।

হিঃ । কি দেখলে ?

মুঃ । স্বদেশী আন্দোলনের ধুমাধুমি, বঙ্গবিচ্ছেদের দরুণ রোষারোষি, তোমাদের পাণ্ডাপ্রভুগণের বিলাত পর্য্যন্ত লড়ালড়ি ইত্যাদি। কিন্তু বঙ্গবিচ্ছেদের দরুণ তোমাদের মনে আঘাত লাগিয়াছে কেন, তাহার কোন কথাই দেখিলাম না।

হিঃ । তুমি কি সংবাদপত্র রীতিমত পড় না ?

মুঃ । পড়ি।

হিঃ । ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যৎ বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের ন্যায় অন্ধ কাপুরুষ হইতে ইচ্ছা করি না।

মুঃ । লোকে বলে হিন্দু নম্বিলে ভূত হয়, আমি দেখছি তোমরা মরার আগেই ভূত হইয়াছ।

হিঃ । সেদিন মাননীয় সুরেন্দ্র প্রমুখ বাবুরা বড় লাটের সহিত দেখা করিতে যাইয়া বঙ্গীয় জমিদারগণের চিরস্থায়ী স্বত্বের সম্বন্ধে আলাপ করেন। বাবুরা আলাপে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর মুখে আশাজনক ত নয়ই বরং আশাভঙ্গনক উত্তরই শুনিয়া আসিয়াছেন। তাই অনেকে ভাবিতেছেন, বঙ্গভঙ্গের পাপে বুঝি সর্ব্বাগ্রে বঙ্গীয় জমিদার কুলতিলকগণের সর্ব্বনাশ ঘটে।

মুঃ । আমরা ইহাই চাই।

হিঃ । এমন সর্ব্বনেশে কথা কেন বল ?

মুঃ । সর্বনেশে কথা নয়, সর্ব্বমঙ্গলজনক বাক্য। বঙ্গবিচ্ছেদের কল্যাণে যদি বঙ্গীয় জমিদারগণের বাড়াবাড়ি কমিয়া যায় তবেই দেশের মঙ্গল। তাই একদিকে বাঙ্গালাদেশের ৮৵০ জমিদার হিন্দু, অপর দিকে বাঙ্গালাদেশের ৮৵০ রকম দেশের লোক মুসলমান কৃষক। ইহা দেখা শুনা ধরা বাঁধা কথা।...
তুমি কল্য আমার স্থান হইতে উঠিয়া আসিবে পর আমি স্নানাহার করিয়া বাহির বাড়িতে বসিয়া একখানি পারসী কেতাব পড়িতেছি, এমন সময় বিনোদপাড়ার সদুমোল্লা অতি বিমর্ষচিত্তে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইল অত বেলাতেও সে কিছুই খায় নাই। আমি তাহাকে খাওয়ার আদর করিলাম। সে বলিল, মুন্সী সাহেব, আমার খিদে নাই। খাজানার ভাবনায় আমার সারারাত ঘুম হয় নাই। কাছারীর নায়েব মহাশয় খাজানা পত্রের জন্য যেরূপ হুকুম জারি করিয়াছেন তাতে আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরা বাকী হইয়াছে।
..। আমি তাহার দুরবস্থা জানাইয়া নায়েব মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিলাম। অনেক কান্নাকাটি করিলাম কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন গলিল না। ।

(মুন্সি সাহেবের কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সদু মোল্লার বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে দীন বাবুর বৈঠক খানায় উপস্থিত)

দীন । কি হাজি সাহেব, কাঁদিতেছ কেন ? কি হইয়াছে ? (সদুর পিতা হজ করিয়াছিল বলিয়া সকলে তাকে হাজি বলিত)

হাজি । বাবু, আমার সদুকে আজ ভোরে কাছারীতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। খাজানা আদায় না হইলে ছাড়িয়া দিবেন না বলিয়া, নায়েব মহাশয় হুকুম করিয়াছেন। বাছা আমার কাল সারাদিন না খাইয়া খাজানার চেষ্টা করিয়াছে। কোথাও পায় নাই,

শেষে ও পাকী কেনা জমিই ম্যাদী রাখিবার পরামর্শ হইয়াছে।

।

মুঃ । হাজি সাহেব, নায়েবের এত অত্যাচার সহিয়া থাকেন কেন? মূল জমিদারের নিকট নালীশ করিলেই ত এসকল অত্যাচার দমন হইতে পারে।

হাজি । মুন্সি সাহেব, নায়েবের অত্যাচারের কথা অনেকবার সদর কাছারীতে আরজা জানাইয়াছি, কোন ফল হয় নাই। মুন্সি সাহেব, জমিদারের সাথ না থাকিলে কি একজন আমলা এত অত্যাচার করিতে পারে?

মুঃ । ... আচ্ছা ফৌজদারীতে খাজানা চুরি, কয়েদ রাখার নালীশ দায়ের করিলে কি এসব অত্যাচার দমন হয় না?... ...

(রতন দিয়ারের মালু জমাদার, বৈদ্যনাথের কেতাব ফকির টাকা কর্জ্জের জন্য তখন দীন বাথুর বাটীতে উপস্থিত ছিলেন)

মালু । মুন্সি সাহেব, অমন কুযুক্তি হাজি সাহেবকে দিবেন না।... ...

... সে বৎসর আমাদের গ্রামে গরু কোরবানী হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিয়া নায়েব মহাশয় আফজাল খাঁ, গাদু আকন্দ, সিকিম শিকদার প্রভৃতিকে কাছারীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া প্রত্যেকের ১০০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করিলেন এবং টাকা আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের বুকে পাথর চাপা দিয়া মানখানায় আবদ্ধ রাখিবার হুকুম দিলেন। ... ...

মুন্সি । ... আমার বিশ্বাস তখন সদাশয় গভর্ণমেণ্ট প্রজার এমন সর্ব্বনাশী দুরবস্থার প্রতিবিধানে নিশ্চয়ই যত্নবান হইবেন।... ... ... ।

(এমন সময় ঢোলের আওয়াজ শুনিয়া)

মুঃ । দক্ষিণ পাড়ায় অনেকক্ষণ যাবত ঢোলের আওয়াজ শুনিতেছি খবর কি?

দীন । খবর আমি জানি। বিপিন পোদ্দার কানু মোল্লা, গঞ্জের প্রামাণিক ও ছবির আকব্বের নামে দেনার দরুণ ডিক্রীজারী করিয়াছেন। আজ বোধহয়, আদালত হইতে পিয়াদা আসিয়া নিলাম আরম্ভ করিয়াছে।...

(এমন সময়ে নাবালক পুত্রসহ একটি শতগ্রন্থিযুক্ত মলিন দেশী বসন পরিহিতা মুসলমান বিধবা, দীনবাবুর কাছারী ঘরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পুত্রটিকে ঘরে প্রেরণ)

বালক । (মালু জমাদারকে লক্ষ্য করিয়া) চাচা বিঞা, মা ডাকে, বাহিরে আইসেন।

বিধবা । (নতশিরে মালুর হাতে একজোড়া রূপার সামান্য বালা দিয়া) এই বালাজোড়া বাবুর নিকট বন্ধক রাখিয়া আমাকে ১।০ লইয়া দেন।

বিধবা । মহেশবাবুর মোহরী আদিয়া চৌকিদারী টেক্সের জন্য ভারী উৎপাত করিতেছে। আজ টেক্স না দিতে পারিলে সে আমার চেঁকি ও ঘটিটা নীলাম করিবে বলিয়াছে। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ঘর বিঞা, বাড়াকুটা ডানিয়া কায়ক্লেশে গোজরান চালাই, চেঁকি গেলে তবে আর উপায় নাই। ঘটীটি গেলেও পানি খাইবার আর যো নাই। তাই, দিশেহারা হইয়া সধবা মেয়ের হাত খালি করিয়া এই দুইগাছ বালা আনিয়াছি।

মালু । তোমার টেক্স কত?

বিধবা । তিনি থাকিতে শুনিয়াছি, আমাদের বছরে ৸০ বার আনা টেক্স লাগে। কিন্তু মহেশ বাবুর মোহরী তিন সন ধরিয়া আমার নিকট হইতে ৸৶০ আনা টেক্স আদায় করে।

মুন্সী । (অতি দুঃখে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন) হা। এ বেটা কি দয়াধর্ম্ম একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছে? দীনহীনা অনাথা বিধবার দুঃখগুা পয়সা চুরি করিয়া খাইতে কি ইহার

হৃদয় একটুকও বিচলিত হয় নাই ? জানি না, এই পাষণ্ড কাফের কত নিরক্ষর চাষার এইরূপে সর্ব্বনাশ করিয়া পাপোদর পূর্ণ করিতেছে। খোদায় আর কত কাল বঙ্গীয় মুসলমানকে পাপমতি জুয়াচোরদিগের স্বার্থের ঘাঁতায় নিষ্পেষিত করিবে ?...

দীন । তুমি দেখছি বাস ভানিতে শিবের গীত আরম্ভ করিলে।

মুন্সী । আচ্ছা থাক্। আমাদের জোলায়া ত আজকাল ভাল আঁচলাদার কাল্‌পিণের শাড়ী চারখানা শাড়ী, মসলন্ডল, বটয়দানা প্রভৃতি রমণীবাহার কাপড় তৈয়ার করিতেছে। তোমাদের রমণীদিগকে তাহা কিনিয়া পরাও না কেন ?

দীন । সেগুলিও তেমন চিক্কণ ও পরিমার্জ্জিত হইবে না বলিয়াবোধ হয়। তা না হউক, আমরা এক্ষণে ঐসকল দেশী কাপড়ই চলা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

মুন্সী । (হাস্যমুখে) তা হলে তোমাদের বাবুনিদের হাতে চড় খাইতে হইবে। যদি তাহাতেও না ছাড় তবে তারা চরকাকাটা মেয়ের ন্যায় জবাব দিয়া বসিবে।

দীন । সে কেমন ?

মুন্সী । জান না, কয়েকদিন হয় ঢাকা অঞ্চলের কয়েকটি অবিবাহিত স্বদেশী ছোকরাপাওা পণ করিয়াছিল "আমরা চরকা কাটিতে পারে এমন পাত্রী না পাইলে বিবাহ করিব না।" তা শুনে ঐ অঞ্চলের একটি কুমারী বলিয়াছিল, "যদি আজীবন বিবাহ নাও হয় তাও ভাল, তবু চরকা কাটিতে পারিব না।"...

দীন । যাও অনর্থক কথার কাটাকাটি করিও না।

মুন্সী । অনর্থক বলিতেছি না। তোমাদিগের জোলাপ্রীতির ভণ্ডামী বুঝিতে এত কথার অবতারণা করিয়াছি। তাই দীনদয়াল, তুমি মুখে বলিলে বিলাতী বর্জ্জনে জোলার উন্নতি হইবে। কাজের বেলায় দেখিতেছি তোমরা বিলাতী বিবর্জ্জন দিলেও [illegible] কাপড় স্পর্শ করিবে না। সুতরাং জোলার উন্নতির

কথা বলা তোমাদের মন-মুখের ভণ্ডামীমাত্র।

শুনিতে পাই জেলেরা নির্ব্বোধ, কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমাদের মত ধূর্ত্ত ধীবরস্বভাব জাতি জগতে দুটি নাই।

দীন । (রাগান্বিত ভাবে) তোমার মুখ বড়ই বেয়াড়া হইয়া উঠিয়াছে।

মুন্সী । কেন ?

দীন । আমাদিগকে ধীবরের সহিত তুলনা কর কোন্ আক্কেলে ?

মুন্সী । ... দেশ মধ্যে বিলাতী জিনিস চল থাকায় কৃষক-জাতির হাড়ভাঙ্গা মেহনতির কড়ি সবগুলি নিজেরা পাইতেছ না, কতক ইংরেজগণ পাইতেছে। তাই সবগুলি কড়ি নিজেদের ঘরে তোলার জন্য বিলাতী উঠাইয়া দিয়া দেশী চল্ করিতে আন্দোলনের জগতবেড় জাল রচনা করিয়াছ। এমতাবস্থায় তোমাদিগকে ধূর্ত্ত ধীবর প্রকৃতি বলায় দোষ আছে কি ?

ভাই, তুমি স্বীকার কর না কর তোমাদের বিলাতী বর্জ্জনের ইহাই একটি প্রধান গূঢ় রহস্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করাও আর এক উদ্দেশ্য। কিন্তু ভাই আমি বলি তোমাদের বিলাতী বর্জ্জনের যত উদ্দেশ্যই থাকুক কোনটিও সফল হইবে না। যে দেশে পৌত্তলিক একেশ্বর-বাদের একত্র বাস, অথচ উভয়েই পরাধীন, যে দেশে এক পৌত্তলিকতায় হাজার মত, হাজার জাতি, হাজার রীতি সে দেশে ঐ সকল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। ইহা যেন প্রকৃতিরই নিয়ম। আর তুমি যদি বল, বিলাতী বর্জ্জনের উদ্দেশ্য ইহার কোনটিই নহে। স্বদেশের দুরবস্থা মোচন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তবে আমি বলি স্বদেশের জীবন যাহারা, সেই কৃষককুলের জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এবং ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এখন

তুমি যদি দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হও তবে বিলাতী বর্জ্জন প্রবঞ্চনা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব রক্ষার পথে পদার্পণ কর।* ... ...

রচনাকাল, জানুয়ারি ১৯৭৩

---

* গ্রন্থাদির বানান অবিকল রক্ষণ করা হয়েছে। —লেখক।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

সাহিত্য ও মন ঃ সমীক্ষা

আকিল আহমদ

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) পৈতৃক নিবাস ছিল যশোহরের ছাতিয়ান তলা গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়া' পর্যন্ত তাঁর বালাশিক্ষা হয়। তাঁর পিতা ওয়াজেদউদ্দিন সাধারণ বিত্তের মানুষ ছিলেন। মেহেরুল্লাহ বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হলে পাঠশালা ত্যাগ করে জীবিকার জন্য তিনি দর্জির দোকানে সেলাই-এর কাজ শুরু করেন। খ্রীস্টান মিশনারীরা যশোহরে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতেন। তাঁরা বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেন ও অজ্ঞ মুসলমানদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতেন। মেহেরুল্লার মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি নিজ চেষ্টায় আরবী উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন এবং কোরান-হাদিস সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রথমে পাদরীদের প্রতিবাদে হাটে-বাজারে ধর্মীয় বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি ইসলামের মাহাত্ম্য, বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে সমাজে আলোড়ন তোলেন। ক্রমে সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মোল্লাদের মত গতানুগতিক বক্তৃতা করতেন না, তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে *যুগোপযোগী যুক্তিশীল বক্তৃতা দিতেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, লোকশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সবকিছুই তিনি বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্ত করেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে জাগান ও সুপথ দেখান। একই উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তক রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, সমিতি গঠন, মাদ্রাসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বরিশালের পিরোজপুরে পাদরী স্পার্জন ও পাদরী টিসডালের সঙ্গে বঙ্গীয় বিতর্ক মুনশী মেহেরুল্লার জীবনের একটি বড় ঘটনা। ১২৯৮ সনের ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিন তিনদিন ধরে প্রকাশ্য সভায় ঐ 'তর্কযুদ্ধ' হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১] তর্কযুদ্ধে কোরান-বাইবেল, যীশু-মহম্মদ, ঈশ্বর-আল্লাহ'খ্রীস্টান ও মুসলমান সমাজ-সম্প্রদায়—সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই বিতর্কে মেহেরুল্লার ভূমিকা ছিল প্রধান। তাঁর রচিত 'খ্রীষ্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' (১৯০১) গ্রন্থখানি এই বিতর্কের ফল। ১৩০৪ সনে রাণাঘাটে পাদরী মনরোর সঙ্গে অনুরূপ তর্কযুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মনরোর অনুপস্থিতিতে মেহেরুল্লা ও জনিরুদ্দীন খ্রীস্টধর্মের অসারতার ও ইসলাম ধর্মের মহিমা ও তৎসহ মুসলমান সমাজের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন।[২] এ ছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতাকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র রাজশাহী ও পশ্চিমবাঙ্গ-এর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি একজন উৎসাহী কর্মী হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রচার কার্য দ্বারা অধিবেশনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেন।[৩] তিনি জন জনিরুদ্দীনকে প্রবন্ধ-তর্কে পরাভূত ও বশীভূত করে তাঁর শিষ্য ও প্রচারক সঙ্গী করে নেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সিরাজগঞ্জ), মোহাম্মদ ইব্রাহিম (বরিশাল), গোলাম রব্বানী (যশোহর) শাহ আবদুল্লা প্রমুখও তাঁর তাবিশিষ্য ছিলেন।[৪]

---

১. ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮।
২. শেখ হবিবর রহমান—কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা, মধুমুখী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃঃ ৩৬।
৩. ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, কোহিনুর বৈশাখ ১৩১২।
৪. কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা, পৃঃ ৮৬।

মেহেরুল্লা যে কয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার সবগুলি ধর্ম ও সমাজমূলক ছিল। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম এরূপ :

১. খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৭), ২. বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার (১৮৯৪), ৩. বঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান ও পলিটোন এসলাম (১৮৯৫), ৪. মেহেরুল এসলাম (১ খণ্ড, ১৮৯৭), ৫. জওয়াবোয়াসায়া (১৮৯৮), ৬. হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮, ২ সং), ৭. খ্রীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ (১৯০১), ৮. কাসায়াতিয়া মাদ্রাসা (১৯০১), ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮), ৯. প্রার্থনা (১৯০৮)।[১]

খ্রীস্টান পাদরীদের প্রচারণার বিরুদ্ধেই মেহেরুল্লার মৌলিক বিরোধ। এজন্য খ্রীস্টধর্মকে তিনি আক্রমণের ক্ষেত্র করেছেন। 'খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা', 'বঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান', 'জওয়াবোয়াসায়া' 'খ্রীষ্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' গ্রন্থগুলি তারই ফলশ্রুতি। তিনি পাদরীদের অপপ্রচারের প্রতিরোধ

---

১. 'মিহির ও সুধাকরে' (২৫ আশ্বিন ১৩০৮) এক বিজ্ঞাপনে মুনশী মেহেরুল্লা প্রণীত 'ঈসানচন্দ্র বাবুর মুসলমান ধর্মগ্রহণ', 'শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের ইসলাম গ্রহণ', 'সাহেব মুসলমান' নামে অপর তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ আছে। মেহেরুল্লার প্রভাবে ঈশানচন্দ্র মণ্ডল (মোহাম্মদ এহসান উল্লা) ও শেখ জমিরুদ্দীন খ্রীস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ের ধর্মান্তর গ্রহণের বৃত্তান্ত প্রথম দুখানি পুস্তিকায় লিখিত হয়েছে। তৃতীয় পুস্তিকা সম্পর্কে অধ্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন, "অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী একজন সাহেব মোসলমান হইয়া লিভারপুলস্থ মোহাম্মদ আবদুল্লা কুইলিয়ম সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ১৩১৪ হিজরী পাঁচবী মহরম তারিখে মনসুর-ই-মোহাম্মদী প্রেজেট হইতে মোহাম্মদ মেহেরুল্লা দ্বারা সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত।"
আলী আহমদ প্রণীত গ্রন্থপঞ্জী (অপ্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

করার জন্যই এগুলি প্রণয়ন করেন। 'খ্রীষ্টান ধর্মের অসারতা' গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলেন, "সম্প্রতি এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বাগযুদ্ধ চলিতেছে,—যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি প্রায় সকলেই স্ব স্ব ধর্মের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণকে যেরূপ অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দ্বেষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়কে দেখা যায় না। তাঁহারা অপর ধর্মের সামান্য দোষকেও বর্ণনায় পর্বত সমান ও আপন ধর্মের সামান্য গুণকে অলঙ্কারে পর্বত করিয়া তুলেন। ...বলেন, এই পৃথিবীতে বাইবেল শাস্ত্র ব্যতীত ঈশ্বরদত্ত অন্য কোন পুস্তক নাই; আরও বলেন, এ জগতে কোনও মনুষ্য নিষ্পাপ নহে, সকলেই পাপাসক্ত; কেবল প্রভু যীশুই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক; সেই মহাত্মা ব্যতীত পরিত্রাণ দিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। ...কেবল যাহারা ঈশ্বরের ত্রিত্বে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে; প্রায়ই খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক পাদরিগণ এরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, খ্রীষ্টিয়ানগণ যাহা প্রচার করেন ও যাহা শিক্ষা দেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন।"[১] খ্রীস্টধর্মের মূল ভিত্তি যে ত্রিত্ববাদ, মেহেরুল্লা বাইবেল থেকে বিস্তর উদ্ধৃতি দিয়ে তার অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। 'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থে তিনি কোরান ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বাইবেলের ভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা এবং কোরানের সত্যতা ও উৎকৃষ্টতার কথা আলোচনা করেছেন।[২] 'খ্রীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' পিরোজপুরের ও 'জওয়াবোল্লাসারা' নোয়াখালীর পাদরী-মৌলবীদের বিতর্কের বিষয় নিয়ে রচিত। 'জওয়াবোল্লাসারা' রচনার

•

---

১. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা—খ্রীষ্টিয় ধর্মের অসারতা, মোয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩১৬ (৩ সং), পৃঃ ১—২।

২. রদ্দ (∠ আরবী রদ্) শব্দের অর্থ প্রতিবাদ; দলিল অর্থ প্রমাণপত্র। 'দলিলোল এসলামে'র অর্থ ইসলামের দলিল বা প্রমাণপত্র।

বিবরণ দিয়ে শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "...নোয়াখালির পাদ্রীসাহেবেরা তথাকার মুসলমানদিগের নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া, প্রশ্নগুলি মুনশী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুনশী সাহেব আমাকে (জমিরুদ্দীনকে) সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুনশী মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সাহেব 'জোয়াবোল্লাগারা' (১৩০৫) নাম দিয়া পাদ্রীর প্রশ্ন ও আমাদের উত্তরগুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন।"[১]

খৃষ্টধর্মের মত হিন্দুধর্মকেও মেহেরুল্লা সমালোচনার বিষয়ভুক্ত করেন। কেননা তখন উভয় সমাজের মানুষের কাছ থেকে মুসলমান সমাজের উপর আঘাত এসেছিল। 'বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার' এবং 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থ দুটিতে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলমান সমাজে বিনা বিবাহ দেওয়া হত না। মুন্সী মেহেরুল্লা এ-প্রথার নিন্দা করেছেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলন এবং সরকারের প্রবর্তিত আইনের তিনি প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি 'উপক্রমণিকা'য় বলেন, "কেবল হিন্দু গৃহেই যে বিধবাদিগের প্রতি নিগ্রহ, এমত নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাসমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর বিজ্ঞ সাহেবদিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। বিধবাবিবাহ না হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, গর্ভপাত, ভ্রূনহত্যা এবং পবিত্র মুসলমান নামে কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে? আদি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তি সমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল,

---

১. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—মেহের-চরিত, কলিকাতা, ১৯০৭, পৃঃ ৫২।

সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। ... ... যদি ইহা দ্বারা একজন বিধবা বিবাহ বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে, সন্দেহ নাই।"[১]

সমকালীন কোন কোন হিন্দু লেখকের মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিবাদে পুরাণোক্ত হিন্দু দেবদেবীর লীলারহস্যের বিবরণ দিয়ে 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থখানি রচিত। তিনি ধর্মবিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের সমকালীন দ্বন্দ্বের উপর আলোকপাত করে বলেছেন, বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায়ই ভারতের প্রধান অধিবাসী। বাস্তবিক আমাদের এই দুইয়ের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ হওয়াই সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আবার ধর্মের বিভিন্নতাই সেই বিবাদের মূল। হিন্দু যাহাকে পুণ্য, মুসলমান তাহাকে পাপ ও মুসলমান যাহাকে পুণ্য, হিন্দু তাহাকে পাপ জ্ঞানে একজন অন্য জনকে ঘৃণা ও হিংসার চক্ষে দেখিতেছে। অতএব আসুন, আমরা অকপট মনে, বিবাদীয় বিষয়গুলির সূক্ষ্মালোচনা দ্বারা মীমাংসা এবং কল্পনার অনুসরণ পরিত্যাগপূর্বক প্রকৃত সত্যানুরাগী হইয়া পরস্পর বিবাদ নিষ্পন্ন করি।"[২] 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলার' ভাষা আক্রমণাত্মক ও রুচিহীন। প্রতিবাদধর্মী রচনায় তিনি একতরফাভাবে হিন্দুধর্মের ত্রুটি দেখাবার চেষ্টা করেছেন, যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিশ্লেষণ করেননি। তত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল বাইরের রূপটা দেখে বিচার করেছেন। মেহেরুল্লার মৃত্যুর পরপরই তাঁর উভয় গ্রন্থই অশ্লীলতা ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[৩]

---

১. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা—বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার, যশোহর, ১৩৭৬ (৭ সং), পৃঃ ৵০—।৹ (উপক্রমণিকা)।

২. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা—হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, পৃঃ ১৩।

৩. অধ্যাপক খালী আহমদ তাঁর অপ্রকাশিত 'গ্রন্থপঞ্জী'তে বলেছেন যে, বিধবা গঞ্জনা ও হিন্দুধর্ম রহস্য প্রচারের জন্য হুগলী মেহেরুল্লার পুত্র

যশোহরের মনোহরপুর গ্রামে কারামাতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মেহেরুল্লা মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন। 'কারামাতিয়া মাদ্রাসা' পুস্তিকায় উক্ত মাদ্রাসার বিবরণ আছে। মেহেরুল্লা জৌনপুরের কেরামত আলীর সমর্থক ছিলেন। তিনি ফুরফুরার পীর আবু বকরকেও মান্য করতেন। কেরামত আলী ও আবু বকর খ্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেহেরুল্লাও শাসকদের বিরুদ্ধে যাননি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের বিপক্ষে মত দেন।[১] মেহেরুল্লা 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, ইসলামধর্ম প্রচার-উদ্দেশ্যেই এটি গঠিত হয়।[২]

মুন্সী মেহেরুল্লা শুধু নিজেই লেখেননি, তরুণ লেখকদের লিখতে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজ ব্যয়ে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' (১৯০০), শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ' (১৯০৩) এবং শেখ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) মুন্সী মেহেরুল্লার উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। শেখ ফজলল করিম 'পরিত্রাণের অবতরণিকায় লিখেছেন, "বঙ্গ বিখ্যাত মিশনারী, বাগ্মীপ্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেব গ্রন্থ-মুদ্রাঙ্কণে যে অকৃত্রিম সদাশয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"[৩]

মুন্সী মেহেরুল্লার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, "বাস্তবিক মুন্সী

মনসুর আহমদ ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। মনসুর আহমদ দণ্ডিত হন এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন সর্বস্বান্ত হন।

১. কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, পৃঃ ১০৮।

২. মেহের-চরিত, পৃঃ ১—১০।

৩. শেখ ফজলল করিম—পরিত্রাণ, কলিকাতা, ১৩১৩ 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য।

সাহেব একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তিনি পরম ধার্মিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রীগণ কম্পিত হইতেন। ধর্মদ্রোহী নেড়ার ফকিরগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। তাঁহার চেষ্টায় বহু মাদ্রাসা স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে নির্জীব মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্মভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল।"[১]

সাহিত্য সেবার উদ্দেশ্যে নেহেরুল্লা লেখনি ধারণ করেননি, তিনি সমাজ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কলম ধরেছিলেন। মুসলমান সমাজের তখন পতনশীল অবস্থা। সমাজকে রক্ষা করাই বড় দায়িত্ব ছিল। তিনি নিজেই ছিলেন ধর্মীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ; ধর্মীয় চেতনা দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্যউদ্ধার ও স্বার্থ-রক্ষার প্রয়াস চালান। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রই তাঁর সংস্কার-অভিযানের নির্দেশ ছিল। প্রগতিশীল নব্য চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। সমাজের ছিদ্রপথ বন্ধ করতে তাঁর শক্তি ব্যয় হয়েছিল, সমাজকে বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করে গতিশীল করে তুলতে পারেননি। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অর্থে সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, মুন্সী নেহেরুল্লা, মীর্জা মোহম্মদ ইউসুফ আলী, রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রমুখ সমকালীন লেখকগণ সে অর্থে স্বসমাজের গ্লানি মোচন ও পঙ্ক উদ্ধার করতে পারেননি। এমন কি, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলীও মুক্তিপূত রূপে আবির্ভূত হননি। মুসলমান সমাজ-কাঠামো প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁরা সমাজের উন্নতি চেয়েছেন। তাঁদের কারও বিপ্লবী মন ছিল না। উনিশ শতকের বিপ্লব-বিমুখ ভাবান্দোলনের শরীক মুন্সী নেহেরুল্লারও সীমাবদ্ধতা ছিল। এজন্য তাঁর ভাবমূর্তি আমাদের ভাবায় না, ভারাক্রান্ত করে।

---

১. 'কর্মবীর মুন্সী নেহেরুল্লা' থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ১৪৪।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
ও
বাঙালী মুসলিম নারী জাগরণ

শাহাজারা হোসেন

বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একটি অনন্য ও অবিস্মরনীয় নাম। কুপমন্ডুক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেও তিনি মুক্ত মানসের অধিকারিণী ছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বলে আঁধারপুরে বন্দিনী বাঙালী মুসলিম নারী সমাজকে তিনি হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন নতুন আলোর পথে। যে রেঁনেসা বা পুনর্জাগরণের ফলে বাঙালী শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মানস সমাজে এক নীরব বিপ্লব উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয়েছিল তা বাঙালী মুসলিম সমাজের সুপ্তি বহুকাল ভাঙ্গাতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাংলার রেঁনেসা যুগের মহান ব্যক্তিত্ব ; তাঁরা অবহেলিত বাঙালী হিন্দু নারী সমাজের অবনমনের ও নিপীড়নে উদ্বেলিত হয়েছিলেন। নবযুগের নতুন ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁদের নারী সমাজের করুণ অবস্থার উন্নতি কল্পে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিলেন এবং প্রয়াস করেছিলেন নারী শিক্ষা বিস্তারের। বাংলার তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ যখন স্বসমাজে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো তখনো তাদের সমাজের নারীদের অবস্থার কথা তারা খুব কমই ভেবে দেখেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান সমাজে কোন মানবতাবাদী রাজা রামমোহন রায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেননি। তাই সে শতাব্দীতে যে প্রগতিশীলতার ফলে হিন্দু নারী সমাজের সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার অনেক উন্নতি সাধন হয়েছিল তা মুসলিম নারী সমাজকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। ফলে, তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সে তিমিরেই থেকে গেলেন। বাঙ্গালী মুসলিম নারীদের মুক্তি আন্দোলনের প্রবর্তন করেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এই আন্দোলনের সূচনা কাল রোকেয়া লিখিত প্রবন্ধ সঙ্কলন মতিচুর, প্রথম খণ্ড প্রকাশনার তারিখ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেই সংগে মতিচুর প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের মুক্তি মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসেরও এক যুগান্তকারী ঘটনা। মতিচুর, (প্রথম খণ্ড) রূপকথা, সঙ্কীর্ণচেতা বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে সূচনা করেছিল এক উদার ও মুক্ত চিন্তাধারা।

অসাধারণ প্রতিভাশালিনী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রংপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের অভিজাত গৌড়া ভূস্বামী সাবের পরিবারে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ আবু সাবের রক্ষণশীল, অপব্যয়ী, আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। তাঁর জীবৎকালেই তিনি পৈত্রিক অর্থ ও সম্পত্তির অপব্যয় করেন, বিনষ্ট করে ফেলেন। তবে, আরবী ও ফার্সী ভাষায় সাবের সাহেবের যুৎপত্তি ছিল। রংপুরে প্রচলিত কিংবদন্তী হতে জানা যায় যে, তিনি সিপাহী বিপ্লবের সময় কোম্পানী সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন এবং এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই বিদেশী মহিলাকে খোশ মেজাজে রাখার জন্যে সাবের সাহেব প্রচুর অর্থ কুকুর প্রতিপালনে ব্যয় করেছেন।[১] রোকেয়ার মায়ের নাম রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী। রোকেয়ার লেখা থেকে আমরা জানি যে, রাহাতুন্নেসা পর্দা প্রথার গোড়া সমর্থক ছিলেন।[২] রাহাতুন্নেসা ও জহির সাবের সাহেবের তিন কন্যা ও দুই পুত্র ছিল : করিমুন্নেসা, রোকেয়া ও হোসেরা এবং আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবের ও

খলিল সাবের। জহির সাহেব তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। তাঁরা উভয়েই সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সাবের পরিবারের অবরোধ বাসিনী কন্যাগণকে শুধু কোরান পাঠ করতে ও উর্দু ফার্সী পড়তেই শিখানো হয়। জ্যেষ্ঠা করিমুন্নেসার বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দেখে জহির সাবের তাঁকে অল্পবিস্তর বাংলা শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু অল্পদিন পরেই কাঠমোল্লা ও মুরুব্বীদের সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে করিমুন্নেসার বাংলা শেখা জহির সাবের বন্ধ করে দেন। রোকেয়ার বাংলা ভাষা শিক্ষা জ্যেষ্ঠা ভগ্নি করিমুন্নেসার আনুকূল্যে ও উৎসাহে সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও রোকেয়া বাংলা সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার পেছনে এই মহিয়সী মহিলার প্রেরণার কথা রোকেয়া অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন।[৩] রোকেয়ার দুই ভাই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে করিমুন্নেসা ও রোকেয়াকে ইব্রাহিম সাবের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ইংরেজী শেখান। রোকেয়া তাঁর উপন্যাস পদ্মরাগ ইব্রাহিম সাবেরকে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গ পত্রে বলেন :

আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ।[৪]

ভাগলপুর নিবাসী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকেয়ার ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়। হোসেন সাহেব তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং সরকারী বৃত্তি পেয়ে ইংল্যাণ্ডেও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ধীর গম্ভীর সাখাওয়াত হোসেনের এটি ছিল দ্বিতীয় বিবাহ। তাঁর প্রথমা পত্নী একটি কন্যা রেখে অল্পবয়সে মারা যান। মনে হয় রোকেয়ার অসাধারণ গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব তাঁর স্বামীর নিকট সমাদৃত হয়েছিল। সাখাওয়াত হোসেনের জীবৎ কালেই রোকেয়া তাঁর অধিকাংশ সৃজনশীল, যুক্ত ও নির্ভীক ভাবদীপ্ত রচনাদি লিখেছিলেন। রোকেয়ার স্বামী ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্বে সাখাওয়াত হোসেন দশ হাজার টাকা মেয়েদের একটি স্কুল করার জন্য

রেখে যান। এ-স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালিকা হবেন সন্তানহীনা রোকেয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর বাঙালী মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতিকা রোকেয়ার সংসারে আর কোন বাধা বন্ধন রইলোনা। পূর্ব পরিকল্পিত মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দেই ভাগলপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ স্কুলটি স্থানান্তরিত হয় কলিকাতায় এবং সাখাওয়াত হোসেনের নামানুসারে এর নাম হয় সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল। এর পর থেকে রোকেয়া তার সমস্ত অর্থ, উদ্যম ও সময় নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করেন স্কুলটি আদর্শ মুসলিম বালিকা রূপে গড়ে তুলতে।*

সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে হতেই বাঙালী সুধী সমাজে রোকেয়ার নাম সুপরিচিত ছিল। ১৯০৩-১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অবরোধ বাসিনী নারী জীবনের দুঃখ, বেদনা ও সমস্যার বিভিন্ন দিক ও নারীর ন্যায়গত অধিকার সম্পর্কিত রোকেয়ার প্রবন্ধাবলী তার সমাজে আলোড়ন তোলে। এই প্রবন্ধগুলি সঙ্কলিত হয়ে মতিচুর, প্রথম খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সমসাময়িক নারীদের দুঃখ-দুর্দশা ও তাদের হীনাবস্থা থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে মুক্তমনা রোকেয়ার নির্ভীক মতবাদ পড়ে অনেকেই তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাদের কেউ কেউ লেখনীর সাহায্যে রোকেয়াকে প্রত্যাঘাত করার প্রচেষ্টাও করেন। কিন্তু মতিচুর প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত রচনাবলী বাঙালী মুসলমান সমাজে যে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বুদ্ধির মুক্তি প্রবণতা প্রবর্তন করেছিল তার গতি রুদ্ধ হয়নি।

মতিচুর প্রথম খণ্ডে সাতটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় রচনা "স্ত্রী জাতীর অবনতি"। ১৩১১ ভাদ্রের নবনূরে প্রকাশিত হয়েছিল "আমাদের অবনতি" শিরোনামে। এই প্রবন্ধ লেখিকা নারীদের বর্তমান অবস্থা, তাদের অবনতির কারণ ও নারী উন্নতির পথ ও পন্থা সম্পর্কে

পর্য্যালোচনা করেছেন। প্রারম্ভেই তিনি নারীদের দুটি হৃদয় স্পর্শী প্রশ্ন করেন এবং তিনি নিজেই নীরস ও সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর দেন :

> পাঠিকাগণ, আপনারা কি কোন দিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন ? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি ? দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি ? না। আমরা দাসী কেন ? —কারণ আছে।[১]...

সুযোগের অভাবকে রোকেয়া স্ত্রীজাতির অবনতির কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন :

> আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি ? সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী পক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুকদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছেন অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুক সংখ্যা বাড়িতেছে। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক মনে করে না। এইরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের, —প্রকারান্তরে পুরুষের-দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে।[২]

রোকেয়া এই প্রবন্ধের অন্যত্র নারীকুলের রক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী রূপে পুরুষের ভূমিকার শ্লেষাত্মক ও গরল সমালোচনা করে নারী সমাজের উপর এই ভূমিকার কুফলগুলি দেখিয়েছেন। তার এই গরলতা ও শ্লেষের মধ্য দিয়েও প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর আত্মনির্ভরশীলতার অভাবে তার অন্তরের পীড়া :

> পুরুষজাতি বলেন যে, তাহারা আমাদিগকে "বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া" রাখিয়াছেন এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া চলিয়া রহিয়া যাইতেছি। ফলতঃ তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। তাহাতেই আমরা ক্রমশঃ মরিতেছি।
>
> .....তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ। বিপৎ সংকুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্ম-নির্ভর ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি।[৮].....

তার সমসাময়িক কালে নারী সমাজের শিক্ষা লাভের সুযোগের অভাব এবং স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার সমূহ রোকেয়াকে বিচলিত করেছিল। তিনি বলেন :

> আমাদের শয়ন-কক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল কলেজ এপর্যন্ত নাই।

পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞান রূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোন উদারচেতা মহাত্মা দয়া করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্র জনে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্র জনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটি আশার আলোক-দীপ্তি পাইতে না পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা "স্ত্রী শিক্ষা" শব্দ শুনিলেই "শিকার কুফলের" একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষা প্রাপ্তা মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোন কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারীর ঐ "শিকার" ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে "স্ত্রী শিক্ষা নমস্কার।"[৯]

ধর্মের নামে পুরুষ সমাজ নারীদের উপর প্রভুত্ব করে আসছেন—এর অভিযোগ রোকেয়ার প্রবন্ধ "আমাদের অবনতি"তে উত্থাপিত হয়েছে। এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে পরবর্তীকালে মতিচূরে এই প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হয় "স্ত্রীজাতির অবনতি" শিরোনামে। মতিচূরে ধর্মের নামে পুরুষদের নারী শাসন সম্পর্কিত রোকেয়ার অভিযোগ সম্বলিত অনুচ্ছেদগুলি পরিবর্জিত হয়। পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদগুলি হতে কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হোল :

> আমাদের যখন সম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারিনাই, তাহার প্রধান কারণ বোধহয় যে যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা

করিয়াছেন, অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে।.....

আমরা যখনই উক্ত মন্তব্যে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে : 'ঘুমাও, ঘুমাও, ঐ দেখ নরক'। মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত: আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।[১০].....

পুরুষ সমাজ ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের উপর প্রভুত্ব করছে—রোকেয়ার এই অসম সাহসিক অভিযোগ বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষিত সমাজে সেদিন তীব্র ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সবনুরেই 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধের প্রতিবাদে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। ১৩১১ কার্তিকের নবনুরে নওশের আলী খান ইউসফজী রোকেয়ার বক্তব্যকে অনাহূত, গর্হিত ও অবান্তর বলে আখ্যা দিয়ে বলেন,

> আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।[১১]

"স্ত্রী জাতির অবনতি" প্রবন্ধে রোকেয়া সকল নারীকে নিজ উন্নতির জন্য সমাজের ভয়, শাস্তি সব কিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে আসতে আহ্বান করেছেন।[১২] রোকেয়া আরো বলেন :

> .....একবার একই সংগে সকলে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, সমাজ সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে।
>
> এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কি করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কি করিলে আমরা দেশের উপযুক্ত কন্যা হইবে? প্রথমত: সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার

ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতালাভ হয় তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিষ্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাস বৎসর পরে লেডী viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব।...

আমরা অকর্মণ্য পুতুল জীবন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ কথা নিশ্চিত।[১৩]

•

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রোকেয়া তাঁর লেখার মাধ্যমে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর দাসত্বের যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রনায়িকার যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাতে ক্রোধান্বিত বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ তাঁকে প্রতি আঘাত হানতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেনি। তাঁদের কেউ কেউ এ কথাও ঘোষণা করেন,

নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ হইবে।[১৪]

মতিচুরের চতুর্থ প্রবন্ধ "অর্ধাঙ্গী"। রোকেয়া এই প্রবন্ধে স্বীয় দেশ অনুন্নত থাকার জন্য নারী সমাজের হীনাবস্থাকে দায়ী করেন,

•

"যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না, সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারত বাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।"[১৫]

নারীর শিক্ষা লাভ শুধু মাত্র পাশ্চাত্য জীবনের সু সন্মুখের জন্যই কাম্য নয়। সু পুত্র গঠনের জন্য ও সুশিক্ষিতা মাতার প্রয়োজন।[১৬]

বেগম অভিযোগ করেছেন যে মুসলমান সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ভংগ করে নারীকে পার্থিব ও অপার্থিব সকল সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয়। তিনি এই প্রসংগে বলেন :

> মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের "অর্ধেক", অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্য। অথবা দুইটি ভ্রাতা একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা "আড়াই জন" হই। আপনারা "বহুত্বদীয় আইনে" দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোন ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিম্বা জমিদারী পরিদর্শন করিতে যান তবে দেখিবেন, কার্যতঃ কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।
>
> আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশী। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন তিনি কন্যার জন্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ. পর্যন্ত) পাশ করে, সেখানে কন্যা দেড়টা ত্রাশ (এণ্ট্রান্স পাশ ও এফ. এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না বালিকা বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না।[১৭]

বাংলাদেশে মুসলমান নারীদের শিক্ষার প্রচলিত বন্দোবস্ত সম্পর্কে বেগম দুঃখ করে বলেন :

আমাদের জন্য ঐ দেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ—প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরীফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণ শক্তির সাহায্যে টিয়াপাখীর মত আবৃত্তি করা। বঙ্গ দেশেও বালিকাদিগকে রীতিমত মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সলমা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতো-মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।[১৮]

আদি ইসলামি স্বর্ণ যুগের দৃষ্টান্ত দিয়ে রোকেয়া আরব মহিলাদের শিক্ষক ও নারীর মুক্তিদাতা রূপে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ভূমিকার কথা পুরুষ সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন :

> পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশী অত্যাচার-অনাচার করিয়াছে, তখনই এক একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রী জাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল, আরব বাসিগণ কন্যা হত্যা করিতেছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কন্যা কুলের রক্ষকরূপে পরায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমা-ময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল। আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের দুর্দশা।[১৯]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রেঁনেসা যুগে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী শাস্ত্রকারদের অনুশাসনকে হাতিয়ার করেই হিন্দু নারীদের ধর্মের দোহাই দিয়ে যে হীনাবস্থায় রাখা হয়েছিল তা

থেকে তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেইরূপ মুক্তমনা মানবতাবাদী রোকেয়াও ইসলামী অনুশাসন ও ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে মুসলিম সমাজ যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের অপব্যাখ্যার দ্বারা তাদের নারীদের ইসলাম প্রদত্ত সকল অধিকার হতে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত করে চলেছেন এ অনোষ সত্য নির্ভীক-ভাবে প্রকাশ করে বাঙালী মুসলিম নারী মুক্তির প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

রোকেয়া ছিলেন মুক্তিবাদী। বুদ্ধির মুক্তিবাদে তাঁর ছিল পরম বিশ্বাস। তাই নিছক শারীরিক শক্তির দোহাই দিয়ে পুরুষজাতির নারী জাতির উপরে প্রভুত্ব রোকেয়া মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন :

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত: নারী জাতি অপর জাতির সাহায্যের উপর নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ "প্রভু" হইতে পারে না।[১০]

রোকেয়া আরো বলেন যে, নারী-সমাজের বর্তমান অগ্রসরতার কারণ পুরুষের মত সমান সুবিধা লাভ হতে তারা বঞ্চিত :

পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সমধিক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না?[১১]

রোকেয়ার লেখার ছত্রে ছত্রে নিগৃহীতা নারী সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় তাঁর নিদারুণ মর্মবেদনা, তীব্রদাহ ও অস্থিরতা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। সেই সংগে লক্ষণীয় পুরুষ-প্রধান সমাজের প্রতি তাঁর মরণ আঘাত। অতুলনীয় শ্লেষের সাথে তিনি তাদের অভয় দিয়েছেন যে, কোন রকম নারী বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র হচ্ছে না :

•

অনেকে হয়ত ভয় পাইয়াছেন যে, বোধ হয় একটি পত্নী-বিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া

বিপক্ষে রাজকীয় কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার করিবেন—শাবলা, চোগা, আইন-কানুনের পাঁজি-পুঁথি লুটিয়া লইবেন। অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।[২২]

রোকেয়া "বোরকা" প্রবন্ধে পর্দা সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে অবরোধের সাথে উন্নতির বেশী বিরোধ নেই। উন্নতির জন্য উচ্চ শিক্ষাকেই তিনি আবশ্যকীয় বলে মনে করেছেন। এই প্রসংগে তিনি স্বতন্ত্র নারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহিলা পরীক্ষকের ব্যবস্থা সুপারিশ করেছেন [illegible] পর্দা অর্থে তিনি সুরুচি ও শালীনতা বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেন :

> পর্দা অর্থে ত আমরা বুঝি গোপন হওয়া বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরে চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভাল মত শরীর আবৃত না করাকেই "বেপর্দা" বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমত পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।[২৪]

সভ্যতার সাথে রোকেয়া অবরোধ প্রথার বিরোধ দেখতে পাননি।[২৫] তবে সেই সংগে তিনি স্বীকার করেছেন যে,

> তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে।[২৬]

রোকেয়া আরো বলেন :

> ..... ঐ সকল কৃত্রিম পর্দা কম (moderate) করিতে হইবে। আমরা অন্যান্য পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব।[২৭]

নারী সমাজের পরাধীন অবস্থার জন্য তিনি দায়ী করেছেন তাদের অশিক্ষা ও অজ্ঞানতাকে :

> শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে।[২৮]

তাই তিনি পুরুষ সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন :

> ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই, তাঁহারা যে টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে অর্ড স্বর্ণ-মুদ্রার অলঙ্কারে গঠিত করেন ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন।[২৯]

তিনি আরো প্রস্তাব করেন :

> অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা স্কুলের আয়োজন করা হউক।[৩০]

গৃহ সুখে বঞ্চিতা নারীদের ব্যথা ও বেদনার প্রতিচ্ছবি অংকিত হয়েছে মতিচুরের শেষ প্রবন্ধ "গৃহ"-য়ে। এই প্রবন্ধে পুরুষ শাসিত সমাজে নারী নিজ গৃহে কত গ্লানিপূর্ণ ও অসহায় অবস্থার মধ্যে বাস করছে তার টুকরো টুকরো চিত্র রোকেয়া তুলে ধরেছেন হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে। রোকেয়া বলেন :

> আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি অধিকাংশ ভারত নারী গৃহ সুখে বঞ্চিতা। যাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটিকে আপন ভবন

> মনে করিতে যাহাদের অধিকার নাই গৃহ তাহাদের নিকট কারাগার তুল্য বোধ হয়।[৩১]

সাধারণতঃ পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন, গৃহখানা কেবল "আমার বাটী"—পরিবারস্থ সকলেই তাঁহার আশ্রিতা।[৩২]

অন্তঃপুরের কতগুলি ছত্রের পর ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন রোকেয়া এবং পরম ক্ষোভে উক্তি করেছেন,

> অসহায় অন্তঃপুরিকাদিগকে ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?[৩৩]

এই প্রবন্ধে রোকেয়া আরো দেখিয়েছেন কিভাবে পুরুষ শাসিত সমাজে মুসলিম উত্তরাধিকার আইনকে কার্যত ফাঁকি দিয়ে নারীকে তার প্রাপ্য পিতৃ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। এই প্রসংগে রোকেয়া উক্তি করেন,

> আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলাদের জন্য নহে।[৩৪]

নারী জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই কাটে কোন না কোন পুরুষের অভিভাবকত্বে আশ্রিতারূপে। প্রাণী জগতে একমাত্র তারাই গৃহহীন নিরাশ্রয়। তাই ক্ষোভে দুঃখে রোকেয়া বলেন,

> জানিনা কবরের ভিতরেও অভিভাবকের বাটিতে থাকা হয় কি না।[৩৫]

•

মতিচুরে সঙ্কলিত রোকেয়ার রচনাবলী যখন প্রথম 'নবনূরে' প্রকাশিত হয় তখন বাঙালী মুসলিম সুধী-সমাজে প্রচণ্ড ক্রোধ ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ক্রমশঃ এই উত্তেজনা ও ক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে এবং তার পরিবর্তে দেখা দেয় দুই পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া। উদাহরণ

স্বরূপ ১৩১২ সনের 'নবনূরের' ভাদ্র সংখ্যায় 'মতিচূর' সম্পর্কে যে সমালোচনা হয় তা উল্লেখ্য :

মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম নবনূরে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছিল। এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে একটু অনুকূল ধারণা জন্মে। লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতিচূর প্রকৃত মতিচূরই বটে। .....তাহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। মতিচূর রচয়িত্রীর একটি দোষের কথা এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গৃহ মাদ্রাজের Christian Trust Societyর প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকা সমূহ দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই আমাদের ধারণা। খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়া আমাদের সম্বন্ধে পাদরী সাহেবগণ যাহা বলেন বা বলিয়াছেন, লেখিকার নিকট তাহা অভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে।

> সমাজ সংস্কার কথা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না।[৩৬]

•

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রোকেয়ার সঙ্কলন গ্রন্থ মতিচূর, দ্বিতীয় খণ্ড এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে "অবরোধবাসিনী" প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দশটি নানাবিধ রচনা 'মতিচূর', দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে। 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে ৪৭টি অবরোধ সম্পর্কিত দুর্ঘটনার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখিকা বলেছেন :

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া "অবরোধ বাসিনী" রচিত হইল।[১৭]

অপূর্ব শ্লেষ ও শিল্পিকুশলতার সাথে বর্ণিত ঘটনাগুলি পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে যেমন কৌতুক রস সঞ্চার করে তেমনি সমাজের অন্ধত্ব, গোড়ামি, প্রচলিত পর্দা প্রথার কঠোরতা এবং এই সবের শিকার মহিলাকুলের দুর্ভোগ, ব্যথা বেদনা আমাদের মনে কান্নার ঢেউ তোলে। এ কথা নিঃসন্দেহাতীত যে 'অবরোধ বাসিনী' পাঠে সমসাময়িক মুসলিম সমাজের "চিত্তচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল"।[১৮]

রোকেয়ার একটি সার্থক সৃষ্টি তৎরচিত উপন্যাস "পদ্মরাগ"। এর নায়িকা সিদ্দিকা এক অসম সাহসিকা নারী। পুরুষ শাসিত সমাজের কাছে ন্যায় বিচার লাভ করতে ব্যর্থ হয়ে সিদ্দিকা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলে :

> আমি আজীবন ... ... নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।[১৯]

বিদ্রোহী সিদ্দিকা রোকেয়ার মানস-কন্যা।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Sultana's Dream রোকেয়ার একমাত্র ইংরেজি গ্রন্থ। এই ছোটগল্পটিতে রোকেয়া চিত্র এঁকেছেন এক নারী রাজ্যের যেখানে শারীরিক শক্তিতে দুর্বল নারী পুরুষের উপর প্রভুত্ব করে তার নিন্দা করে এবং পুরুষগণ সেইখানে অন্তঃপুরে আবদ্ধ। রোকেয়া "অসহায় বন্দীত্ব নারী হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির বীজ বপন করিবার উদ্দেশ্যে বোধকরি এই Sultana's Dream রচনা করিয়াছেন।"[২০]

আমরা যতদূর জানি বামাবোধিনী পত্রিকায় মার্চ, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যায় বিবি শ্রীমতি তাহেরন নেছার স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কিত প্রকাশিত একটি চিঠিই বাঙালী মুসলিম মহিলার এ বিষয়ে প্রথম রচনা।[৪১] সম্পাদককে সম্বোধন ক'রে লিখিত এই চিঠিতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহেরন নেছা বলেন,

> যদি এই ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা পান।[৪২]

বিবি তাহেরন নেছা বোধ্য বালিকা বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আমরা আর কোন তথ্য জানি না। তবে তিনি আমাদের জানাবতে প্রথম বাঙালী মুসলিম গদ্য রচয়িত্রীর অনন্য মর্যাদার অধিকারিণী।[৪৩]

বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন সংখ্যায় সাহাজাদপুরের শ্রীমতি লতিফন নেসা লিখিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির শিরোনাম "বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি" এবং বাঙালী মুসলমান মহিলাদের অধঃপতিত অবস্থার জন্য শোকোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হ'ল :

কার পানে রয়েছ চাহিয়া করুণ নয়নে তুমি বোন ?
কেবা দয়া করিবে বোদের ? কে শুনিবে বোদের ক্রন্দন ?
টেনে দিয়ে সুদীর্ঘ ঘোমটা (পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে),
কত আর কাঁদিব নীরবে আপন কর্তব্য পাসরিয়ে।
আমাদের পিতা ভ্রাতা-স্বামী সবাই আপন হিত খোঁজে,
আমাদের দুর্দশা নেহারি সবারি নয়ন আগে বুজে।
হায়রে এ বঙ্গভূমি মাঝে অভাগিনী আমাদের সম
কেহই নাহিক বুঝি আর, মোরা হায় হীন-হীনতম।[৪৪]

লতিফন নেসার কবিতায় বাঙালী মুসলিম সমাজে মেয়েদের অসহায় অবস্থা ও তাদের প্রতি সামাজিক অবিচার সম্বন্ধে কবির সচেতনতা অতি সুস্পষ্ট-ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কবি শুধু শোকই প্রকাশ করেছেন। তাঁর রচনায় সামাজিক অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কোন প্রবণতা নেই।

রোকেয়ার সমসাময়িক কালে আরো কয়েকজন মুসলিম মহিলা সাহিত্য সাধনা করেছেন। কিন্তু সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে তাঁরা কেউই রোকেয়ার মত সুতীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখতে সক্ষম হননি। এঁদের মধ্যে নুরুন্নেসা (১৮৯৮-১৯৭৬) ও খায়রুন্নেসার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। রোকেয়ার মত নুরুন্নেসার জন্ম হয়েছিল অভিজাত রক্ষণশীল পরিবারে। বাল্যকাল হতেই তাঁকে কঠোর পর্দা প্রথা মেনে চলতে হয়েছিল এবং লেখা-পড়া যাই শিখুন তা তাঁকে অন্তঃপুরেই বসেই শিখতে হয়েছিল। কাজী গোলাম মোহাম্মদের সাথে বিয়ের পরেই তিনি বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান দেখার সুযোগ লাভ করেন। তিনি কয়েকটি উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। কিন্তু সমাজের নারীদের অনুন্নত অবস্থা সম্বন্ধে তীব্র সচেতনতা এবং সামাজিক কুপ্রথাকে আঘাত করার প্রবণতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে লক্ষিত হয় না।[৩১] তাঁর সমকালের ও পরিবেশের প্রভাব ও ধ্যানধারণার বেশী ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেননি এবং স্ত্রী-শিক্ষা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁর মতবাদ আমাদের কাছে প্রগতিশীল বলে মনে হয় না। স্ত্রী-শিক্ষাকে তিনি অপরিহার্য মনে করেছেন এবং এর অভাব যে বাঙালী মুসলিম সমাজের অনুন্নত অবস্থার একটি বড় কারণ সে কথাও তিনি বলেছেন। তবুও তিনি মেয়েদের জন্য উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। নজীর মোসলেম মহিলা সম্মেলনের[৩২] একটি অধিবেশনে সভানেত্রীর ভাষণে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আমি এখন আমার স্বজাতীয়া ভগ্নিদের লেখাপড়া শিখে ডিগ্রী নেবার জন্য আহ্বান করছি না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এইটুকু যে, তাঁরা যেন একেবারে মূর্খ না হয়ে থাকেন। সংসারের কাজ কর্মের ও পর্দার

ভিতর থেকে যতটুকু শিক্ষা করতে পারেন সেই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহলে তাঁরা তখন আপনা আপনিই নিজেদের সন্তানগুলো যাতে শিক্ষায় উন্নতি লাভ কর্তে পারে সেই দিকে সর্ব্বদা নজর রাখবেন। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলেই যাই।[৪৭]

রোকেয়া নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এমন নারী রাজ্যের পরিকল্পনাও তিনি তাঁর সাহিত্যে করেছেন যেখানে নারী মস্তিস্কের বলে প্রভুত্ব করছে। কিন্তু তাঁরই সমসাময়িক নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনেরও পক্ষপাতি ছিলেন না। এ প্রসংগে তিনি বলেছেন :

•

অনেকে হয়ত মনে করবেন—তবে কি আমরা লেখাপড়া শিখে এখন থেকে সমাজের উন্নতির জন্য রাস্তায় রাস্তায় হৈ হৈ করে বেড়াব, না অধুনাতন নারী franchise এর আলো পেয়ে, অর্থোপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনে পুরুষ সেজে অফিসের দ্বারে গিয়ে চুঁ মারব? না, এই উদ্ভাবনীয় উপদেশ দিবার জন্য আজ আমি আপনাদের কাছে আসি নাই। বরং আমার মনে হয়, শিক্ষা যে অর্থের জন্য নয়, এই কথাই আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে; আর সেই নামাটাই সফল হবে।[৪৮]

রোকেয়ার সমকালীন আরেকজন মুসলিম মহিলা সাহিত্যিক ছিলেন খায়রুন্নেসা (১৮৭০ (?)-১৯১২)। তাঁর সম্পর্কে আমরা আজো খুব বেশী জানি না। তিনি পাবনা জেলার অধিবাসী ছিলেন এবং একটি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পিতা মুন্সী মেহেরুল্লাহ উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ইসলামী সংস্কারক ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন মৌলভী আসিরুদ্দিন। 'নবনূরে' তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকের নাম "সতির পতি ভক্তি"। স্বামীর আদেশে লিখিত এই গ্রন্থে তিনি সমাজের অনুন্নত অবস্থার জন্য স্ত্রী-শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছেন। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক হলেও খায়রুন্নেসা মা ও স্ত্রী রূপে নারীর চিরাচরিত

ভূমিকার উপরেই জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে নারীর গৌরব তার স্বামীকে মহৎ কার্যে অনুপ্রাণিত করার মধ্যেই নিহিত।[৪৯]

একথা নিঃসন্দেহাতীত যে, সমসাময়িক বাঙ্গালী মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যে সমস্যা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে মুকুলমনা রোকেয়ার চিন্তাধারা তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভীক ও সৃজনশীল ছিল। নিজ পরিবেশ ও যুগের প্রচলিত বিশ্বাস ও মতের গড্ডালিকা প্রবাহে তিনি ভেসে যাননি। সৃষ্টিধর্মী রোকেয়া দুঃসাহসিকতার সাথে তাঁর যুগের মানুষদের দিয়েছিলেন নূতন ধ্যান-ধারণা, বাঙ্গালী মুসলিম নারী সমাজকে নিয়ে গিয়েছিলেন নূতন আলোর পথে। তাঁর সময়কাল ও পরিবেশ এবং সমাজকে প্রভাবান্বিত করে তিনি শিখিয়ে ছিলেন মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে।

নিশ্চিত রোকেয়া নারী মুক্তির প্রথম বাঙ্গালী মুসলিম মহিলা প্রবক্তা, নারীর অধিকার অর্জনের আন্দোলন ব্রাহ্ম ও হিন্দু মহিলা সমাজে অনেক আগে হতেই শুরু হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে হিন্দু নারীদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্ম মহিলারা এতে সন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চুপ থাকেন নি। বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা, বহুবিবাহ ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন করেছিলেন। সমাজ সংস্কারকেরা বিধবা বিবাহের ব্যাপক প্রসার ও নারী শিক্ষা বিস্তারেরও সমর্থক ছিলেন। রোকেয়ার সমসাময়িক হিন্দু ও ব্রাহ্ম মহিলা সাহিত্যিকেরা সকল সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের সমালোচনা করেছেন এবং তারা নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছেন। নারী মুক্তি আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে কামিনী রায় (১৮৩৩-১৯৪০), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীর (১৮৭২-১৯৪৫) নাম উল্লেখ যোগ্য।[৫০] এই কালে সখী সমিতি (১৮৮৬), মহিলা শিল্প সমিতি

(১৯০৭), ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল (১৯১০), নারী শিক্ষা সমিতি (১৯১৯) প্রভৃতি মহিলা সংগঠন নারী কল্যাণ ও নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।[৩১] সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক হতে শুরু হয়। ভূপালের নবাব বেগম সুলতান জাহান এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূপালে একটি সর্ব ভারতীয় মুসলিম মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন ও সমকালে অনুষ্ঠিত এই জাতীয় অন্যান্য সম্মেলনে বাল্যবিবাহ, নারীর উত্তরাধিকার, স্ত্রী শিক্ষা, পর্দা প্রথা প্রভৃতি প্রশ্ন আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কথা মনে রাখতে হবে যে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে আয়োজিত সকল সমাজ সংস্কার আন্দোলনে মুসলিম মহিলারাই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।[৩২]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হতে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার যে আন্দোলন সারা ভারতে শুরু হয়েছিল সে স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে পুরুষদের চোখে নূতন মর্যাদা লাভ করেছিল। ফলে একদিকে যেমন যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নানাবিধ সংস্কার হতে সমাজ ক্রমশঃ মুক্ত হয়েছে অন্যদিকে নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে জেগেছে এক নূতন সচেতনতাবোধ যা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে পুরুষের সাথে সমান অধিকার লাভ করতে।[৩৩]

একথা নিঃসন্দেহাতীত যে, হিন্দু ও খ্রীষ্ট মহিলাদের সংগঠিত বিভিন্ন নারী সমিতির কার্যাবলী এবং যুগের আবহাওয়া নারী মুক্তি সম্পর্কে রোকেয়ার চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নারী সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য চিন্তা ও কাজ করতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতায় তখন আরো দুটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়

ছিল। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফেরদৌস মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় কলিকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৯] খ্যাতনামা বাঙ্গালী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মাতা সমাজ কর্মী খুজিস্তা আখতার বানু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সোহরাওয়ার্দীয়া বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০] উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক হতেই সমসাময়িক পত্র পত্রিকায় অল্প সংখ্যক মুসলমান মেয়েদের স্কুলে পড়ার বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪১] ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার। অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীতে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা এই সংগঠন করেছিল। পাঠ্যসূচীর মধ্যে বাংলা অথবা উর্দু ভাষা শিক্ষা, আরবী শিক্ষা এবং প্রাথমিক অঙ্ক শিক্ষা ছিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে কলিকাতা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি জায়গায় মেয়েদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মাহবুল আলিম, কজলুল করিম, নোয়াখালীর বজলুল রহিম প্রমুখ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানেরা এই সংগঠনের প্রধান কর্মী ছিলেন। মুসলমান সমাজে যখন বালকদের মধ্যেই শিক্ষার বিস্তার সন্তোষজনক নয় তখন সংগঠনের কর্মীরা কেন স্ত্রী শিক্ষার দিকে এত মনোযোগ দিচ্ছেন—এই অভিযোগ তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু সংগঠনের উদ্যোক্তারা এই সমালোচনায় দমে যাননি। ১৮৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। আমরা যতদূর জানি বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষা বিস্তারের প্রথম প্রয়াস মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী করেছিল।[৪২]

•

সমসাময়িক বাংলার পত্র-পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙ্গালী মুসলিম জনমত থেকে মনে হয় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই বাংলার মুসলমান সমাজ ক্রমশঃ স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) স্ত্রী সমাজের নিরক্ষরতাকে ভারতীয়দের দুর্বলতার একটি প্রধান কারণ বলে

চিহ্নিত করেছেন।[১৮] ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বিহির ও সুধাকরে' বালিকা মাদ্রাসায় ইংরেজী শিক্ষা দানের প্রস্তাবও করা হয়েছিল।[৩৯] এইভাবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারী শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই বাঙালী মুসলিম সমাজে এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা চলছিল, যদিও তা কোনদিন ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি। রোকেয়াই প্রথম এই ব্যাপার নিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা করেন এবং স্ত্রী শিক্ষার পক্ষে স্বীয় সমাজে শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলেন। শিক্ষায় প্রসার হলে স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই তাদের হিতাহিত বুঝতে পারবে; ফলে নারী মুক্তি আপনা হতে আসবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। নারী শিক্ষা বিস্তারই সেজন্য তাঁর জনসেবা ব্রতের প্রধান অংশ ছিল।

•

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রোকেয়া কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা দেখতে পান। ১৯১১ সালে ১৬ই মার্চ মাত্র আটটি ছাত্রী নিয়ে কলিকাতার একটি ছোট গলিতে রোকেয়ার স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। ২রা এপ্রিল ব্যারিষ্টার আবদুল রসুলের বাসভবনে কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত মুসলমান মিলিত হয়ে স্কুলটির জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করেন এবং স্কুলটির নাম রোকেয়ার স্বামীর নামানুসারে "সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল" রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯১৫ সালে স্কুলটি একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে এবং ১৯১৭ সালে মাধ্যমিক ইংরাজী স্কুলে পরিণত হয়। স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭-এ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের দুই দশকে রোকেয়ার অক্লান্ত সাধনা, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও অসমসাহসিকতার ফলে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল বাংলার একমাত্র উচ্চ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। কিন্তু তবুও বাঙালী মুসলিম সমাজ রোকেয়ার নারী শিক্ষা বিস্তারের সকল প্রচেষ্টায় সামগ্রিকভাবে উৎসাহহীন মনোভাবই দেখিয়েছেন। স্কুলটির কোন নিজস্ব দালান তখনো হয়নি এবং এর আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। কিন্তু রোকেয়া নিঃস্বার্থভাবে স্কুলটির জন্য কাজ করে যান। তিনি স্কুলটির

উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে সমস্ত প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করেছেন বাঙালী মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।"[৩]

রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে, নারী শিক্ষার প্রসারই অবহেলিত নারী সমাজকে উন্নত করার একমাত্র উপায়। তাই তিনি তাঁর জীবনের বহু সময় বাংলার মুসলমান নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাঁর আত্মত্যাগ, কঠোর ও অক্লান্ত কর্ম সাধনার জন্য তাঁকে কাঠমোল্লা ও গোঁড়া ধনী সম্প্রদায়ের বহু সমালোচনা ও নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর বিরোধী ব্যক্তিগণ সর্ব প্রকার বিপত্তি ও প্রতিরোধ সৃষ্টি করে তাঁর কাজে বাধা দিয়েছেন। এই প্রসংগে 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের উপক্রমনিকায় রোকেয়া লিখেছেন :

> .....জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজ সেবা করিয়া কাঠ মোল্লাদের অভিসম্পাৎ কুড়াইতেছি।"[৪]

কিন্তু কোন বাধা বিরোধিতাই তাঁকে অবদমিত করতে পারেনি এবং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরে তাঁর অকাল মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি নারী কল্যাণের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় লেখিকা, শিক্ষাবিদ্ ও সমাজকর্মী রূপে নারী মঙ্গলের জন্য তিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সাধনা করেছেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'আঞ্জুমন-এ-খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি মুসলিম মহিলা সমিতি রোকেয়ার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তাদের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করা। নারী-কল্যাণের জন্য রোকেয়ার আত্মত্যাগ ও সাধনার জন্য তাঁকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের সভানেত্রী পদের গৌরব দেওয়া হয়েছিল। একই বছরে আলীগড়ে অনুষ্ঠিত মুসলমান মহিলাদের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

রোকেয়ার অক্লান্ত কর্ম সাধনার ফলে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে তিনি তাঁর কর্মপথে নিঃসংগ ছিলেন না। নারী মুক্তির স্বপক্ষে মিসেস এম, রহমান, আয়েশা আহমেদ, ফজিলতুন্নেসা প্রমুখ নারী সাহিত্যিকেরা এ সময় হতে জোরালো ও নির্ভীক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পর্দা প্রথা ও মুসলমান নারী অধিকার সম্পর্কে মিসেস এম, রহমান বলেন :

> পর্দার দোহাই দিয়ে, অনেক ভালো জিনিসে আমাদের বঞ্চিত করে রেখেছে, আর তা আমরা থাকবো না। তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ..... আমরা চাই আমাদের ইসলাম দত্ত স্বাধীনতা, চাই ইসলাম দত্ত অধিকার । কে আমাদের পথ রোধ করবে ? সমাজ রূপী শয়তান ? কখনই পারবে না। .....[৬৭]

মিসেস এম, রহমান ও অন্যান্য মুসলিম মহিলা সাহিত্যিকদের লেখাতে নারীর ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রামী মনোভাব দেখা যায় তা অনেকাংশে নারী জাগরণের অগ্রদূতী রোকেয়ার জীবনব্যাপী নিঃস্বার্থ সাধনারই ফল। বাঙালী মুসলিম নারী যুগ যুগ ধরে যে সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারে নিপীড়িতা হয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে রোকেয়া একাকী তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং নারী শিক্ষা আন্দোলন মুসলিম সমাজে ব্যাপকতর করেছিলেন।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা উন্নীতকরণ এবং নারী শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণভাবে মুসলমান সমাজে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে সচেতনতা দেখা যায়। বিশেষ করে বাঙালী মুসলিম তরুণ সম্প্রদায় স্বার্থহীন ভাষায় রোকেয়ার নারী মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। মুসলিম সাহিত্য সমাজের[৬৩] তরুণ কর্মী কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির ও আবুল হোসেন মতিচুরে প্রতিফলিত রোকেয়ার ধ্যানধারণা ও পুরুষ শাসিত সমাজের

সমালোচনাকে সমর্থন করেই থেমে যাননি। আবুল হোসেন "শতিচুর" পুস্তকের সমালোচনায় এমন কি একথাও বলেছেন যে,

> পুস্তকে তিনি পুরুষের বিরুদ্ধে এমন কিছু বলেন নাই যাহাতে পুরুষেরা আপত্তি করিতে পারে। আমার মনে হয় পুরুষের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক কশাঘাত করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখিকার মাহাত্ম্য ঐ স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে বেশী, তিনি ভগিনীগণের ত্রুটি বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন, —পুরুষকে কেবল অঙ্গুলি দ্বারা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন মাত্র।[১৩]

এই সময়কালে তরুণ সমাজ কর্মী লুৎফর রহমান 'নারী স্বাধীনতা মিশন' ও 'নারী তীর্থ' নামে দুটি নারী কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রচারকল্পে 'নারী শক্তি' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।[১৪] গোড়া মুসলমানেরা এ ধরণের তরুণদের কার্যকলাপের সমালোচনা করেছেন এবং তাদের আধুনিকপন্থী বলে বিদ্রূপ করেছেন।[১৫] গোড়া মুসলমানেরা এই সব তরুণকে আধুনিকপন্থী বলে বিদ্রূপ করলেও তরুণদের নারী কল্যাণের এই সব উদ্যোগের মধ্যে বাঙালী মুসলিম সমাজের মানসিকতার পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয়।

রোকেয়া আজীবন নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছেন তার সফলতার নিদর্শনও রোকেয়ার জীবনকালে দেখা যায়। রোকেয়া নিজেই এই সফলতার কথা ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি প্রবন্ধে বলেছেন :

> এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রী-শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ধাত্রীবিদ্যা লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দিকে স্ত্রী শিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে।[১৭]

রোকেয়ার মধ্যে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তিবাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাবপ্রবণতা ও গভীর অনুভূতি দেখতে পাই। লেখনীর মাধ্যমে প্রগতিশীল ভাবধারা প্রচার করে তিনি বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সামাজিক পূর্ব সংস্কার প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন। নারী জাগরণের মূল কথা যে শিক্ষা তা তিনি জানতেন। তাই নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি দুই দশকেরও অধিক সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলকে একটি আদর্শ মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত করার ব্রতে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। তাঁর সমাজের নারীদের অধঃপতিত অবস্থা দেখে সারা জীবন তিনি এই অবহেলিতাদের চেনে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। বাঙালী মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূতী ছিলেন তিনি এবং প্রগতিশীলতার পথে তাদের অভিযানে তিনি চিরদিন আলোর দিশারী হয়ে থাকবেন।

তথ্য-নির্দেশ

১। মোঃ সুফর রহমান, রংপুর বিচিত্রা, রংপুর, ১৯৭২, পৃঃ ৩০-৩২।

২। আর, এস, হোসেন, অবরোধ বাসিনী, কলিকাতা, ১৯২৬, প্রথম সংস্করণ, উৎসর্গ পত্র।

৩। মতিচুর, দ্বিতীয় খণ্ড, উৎসর্গ পত্র, রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃঃ ৭৬। করিমুন্নেসার সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য ঐ, 'সুকানো রতন', পৃঃ ২৮৫-২৮৮, এবং S. Husain, Karimunnessa Khanam Choudhurani—A Notable Bengali Muslim Lady Of The 19th Century. Awaiting Publication.

৪। পদ্মরাগ, উৎসর্গ পত্র, রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ৩১৯।

৫। রোকেয়ার জীবনের বিশদ বৃত্তান্ত জানার জন্য দ্রষ্টব্য বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঢাকা, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গে মহিলা কবি, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৫; এবং রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাদকের নিবেদন।

৬। ঐ, পৃঃ ১৭।

৭। ঐ

৮। ঐ, পৃঃ ২২-২৩।

৯। ঐ, পৃঃ ২৬।

১০। ঐ, সম্পাদকের নিবেদন, পৃঃ ১১।

১১। ঐ, পৃঃ ১৩।

১২। ঐ, ২৮-২৯।

১৩। ঐ, পৃঃ ২১-৩০ এবং ৩১।

১৪। ঐ, সম্পাদকের নিবেদন, পৃঃ ১৩।

১৫। ঐ, পৃঃ ৩৮।

১৬। ঐ, পৃঃ ৩৮-৩৯।

১৭। ঐ, পৃঃ ৪১।

১৮। ঐ, পৃঃ ৪১-৪২।

১৯। ঐ, পৃঃ ৪২।

২০। ঐ, পৃঃ ৪৩।

২১। ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৪।

২২। ঐ, পৃঃ ৪৪।

২৩। ঐ, পৃঃ ৫৭।

২৪। ঐ।

২৫। ঐ, পৃঃ ৫১।

২৬। ঐ।

২৭। ঐ, পৃঃ ৬০।

২৮। ঐ, পৃঃ ৬১।

২৯। ঐ, পৃঃ ৬২।

৩০। ঐ।

৩১। ঐ, পৃঃ ৬৪।

৩২। ঐ, পৃঃ ৬৬।

৩৩। ঐ, পৃঃ ৬৭।

৩৪। ঐ, পৃঃ ৬৯-৭২।

৩৫। ঐ, পৃঃ ৭৪।

৩৬। ঐ, সম্পাদকের নিবেদন, ১৪-১৫; আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃঃ ৯৮।

৩৭। অবরোধবাসিনী, রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ৪৭৯।

৩৮। ঐ, পৃঃ ৪৭২।

৩৯। পদ্মরাগ, ঐ, পৃঃ ৪৫২-৪৫৩।

৪০। ঐ, পৃঃ ৪০২।

৪১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১১ সংখ্যা, মার্চ ১৮৬৫, পৃঃ ২৭৫-২৭৭।

বামাবোধিনী পত্রিকা উমেশচন্দ্র দত্ত নাম্নী একজন তরুণ ব্রাহ্মের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে নিয়োজিত বামাবোধিনী সভার মুখপত্র ছিল। নারী কল্যাণকামী এই মাসিক পত্রিকাটি কলিকাতা হতে প্রকাশিত হোত।

৪২। ঐ, পৃঃ ২৭৭।

৪৩। গোলাম মুরশিদ: প্রথম মুসলমান গদ্য লেখিকা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ঢাকা, একবিংশ-দ্বাবিংশ বর্ষ, মাঘ-আষাঢ়, ১৩৮৩-৮৪, পৃঃ ৭১-৭৬।

৪৪। বামাবোধিনী পত্রিকা, ৩৮১ সংখ্যা, জুন ১৮১৭, পৃঃ ৭৭-৭৮।

৪৫। নূরুন্নেসা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, নূরুন্নেসা গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, ভূমিকা, এবং মুহম্মদ আবদুল হাই ও

সৈয়দ আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬, পৃ৪ ২১২-২১৪ ।

৪৬ । বঙ্গীয় মোসলেম মহিলা সঙ্ঘ তৎকালের একটি মুসলিম মহিলা সংগঠন ছিল । এই মহিলা সংঘের যে অধিবেশনে নুরুন্নেসা সত্তানেত্রীর ভাষণ দেন তা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । তাঁর ভাষণের জন্য দ্রষ্টব্য, সওগাত, ৪র্থ বর্ষ, ৮ সংখ্যা, পৃঃ ৫৪১-৫৪৪ ।

৪৭ । ঐ ।

৪৮ । ঐ ।

৪৯ । খায়রুন্নিসা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মোঃ মনসুরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃঃ ২০৫-২০৬, মোহাম্মদ আবদুল্ হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২১৫ ; এবং মজিরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃঃ ১০১-১৩৩ ।

৫০ । এই মহিয়সী রমণীদের জীবনী ও কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, সাহিত্য সাধকচরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সিরিজ, ৫ম খণ্ড, ৫৮ ভাগ, পৃঃ ৬ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে ; ২য় খণ্ড, ২৮ ভাগ, পৃঃ ৫ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে, ৫ম খণ্ড, ৫৯ ভাগ, পৃঃ ৫ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে ; ১০ম খণ্ড, ৯১ ভাগ, পৃঃ ৬ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে ।

৫১ । এই সংগঠনগুলি ও সমসাময়িক অন্যান্য মহিলা সংগঠনগুলি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, Usha Chakravarty, Condition of Bengali Around The Second Half of The Nineteenth Century, Calcutta, 1963, pp. 98-105, 128, 139 ; S, S. Gupta, A Study of Women of Bengal, Calcutta, 1970, P. 249 ; প্রবাসী, ২১ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩২১, পৃঃ ১৬, ১৭, ১৮ । আরো দ্রষ্টব্য, ছবি রায়, বঙ্গে নারী আন্দোলন ।

৫২। S. Natarajan, A Century of Social Reform In India. London, 2nd ed., 1962. pp. 11, 66; 140, 180, 185, 186, 197 ; বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, 'আজাদী সংগ্রামে নারী, শতাব্দী পরিক্রমা, হাসান জামান (সম্পাদক), ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৬১।

৫৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য কমলা দাসগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালী নারী, কলিকাতা, ১৯৬৩। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রখ্যাত নারী আন্দোলনের অগ্রদূতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর মেয়ে সরলা দেবী চৌধুরাণী উভয়েই উৎসাহী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন।

৫৪। বামাবোধিনী পত্রিকা, ৩৮৫ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭, পৃঃ ২৯৮।

৫৫। বাংলা বিশ্বকোষ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম (প্রধান সম্পাদক), দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ২৬০।

৫৬। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৯ সংখ্যা, মাঘ ১৮৬৯, পৃঃ ১৭৭ ; ২০৬ সংখ্যা, মাঘ ১৮৮২, পৃঃ ৩৭৩-৩৪৪ ; ২২০ সংখ্যা, মে ১৮৮৩, পৃঃ ১৭।

৫৭। শামসুন্নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, পৃঃ ৬৬, আবু জোহা নুর আহমেদ, মুসলিম জগতের মহিয়সী নারী, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃঃ ১৯০। Sufia Ahmed, Muslim Community In Bengal, Dacca, 1974, P. 248 and foot-note 4 of this page : মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, 'সাময়িক পত্রে সেকালের কথা', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ সংখ্যা, পৃঃ ৪১-৫০ ; Qazi Abdul Mannan, Emergence And Development of Dobhashi Literature In Bengal, University of Dacca, First Edition, P. 220. উপরে উল্লিখিত বই পুস্তক ও পত্রিকার যে সব তথ্য সরবাহ করা হয়েছে তা আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার কাজী আবদুল মান্নান দিয়ে সাহায্য করেছেন।

৫৮। আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ভূমিকা, পৃঃ ৩৭।

৫৯। Quoted in M. N. Islam, Bengali Muslim Public Opinion As Reflected in the Bengal Press, Bangla Academy, Dacca, 1973, P. 126.

৬০। এই প্রবন্ধে রোকেয়ার কুল সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, পৃঃ ৩৬ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে এবং মোশফেকা মাহমুদ, পত্রে রোকেয়া পরিচিতি পৃঃ ৩৭ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে লিপিবদ্ধ তথ্যাবলী হতে গৃহীত।

৬১। রোকেয়া রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৪৭১।

৬২। মিসেস এম. রহমান, 'পর্দা বনাম প্রথকনা', সহচর, কলিকাতা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯২৩, আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ৩১৫ হতে উদ্ধৃত।

৬৩। ১৯২৬-এ ঢাকায় "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামে একটি সাহিত্য গোষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সাহিত্যিক মুখপত্র ছিল বার্ষিক শিখা এবং তাঁদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। 'শিখা'য় প্রকাশিত এই গোষ্ঠির আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির প্রমুখ কর্মীদের ভাবধারা বাঙ্গালী মুসলিম সমাজে তীব্র চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃঃ ৪৭২ হতে পরবর্তী পৃষ্ঠা সমূহে, এবং কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ, কলিকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ১৯৬-১৯৫।

৬৪। রোকেয়া জীবনী, পৃঃ ৫১৭।

৬৫। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৪, পৃঃ ৪০২।

M. N. Islam, Bengali Muslim Public Opinion As Reflected In The Bengal Press, P. 256 & foot-note 51 of this page.

৬৬। ঐ।

৬৭। রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ২৬০-২৬১।

পুস্তক সমালোচনা

মশাররফ রচনা সম্ভার : (প্রথম খণ্ড)
সম্পাদনায়—কাজী আবদুল মান্নান। প্রকাশকাল—সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।
প্রকাশক—বাংলা একাডেমী, ঢাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৬৭৪। মূল্য—৪০·০০

বহু-প্রতীক্ষিত মশাররফ রচনা সম্ভার (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেনের রচনাবলীর অধিকাংশ এতদিন ছিল অপরিচিত ও বিক্ষিপ্ত এবং সে কারণে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত-প্রায়। প্রফেসর কাজী আবদুল মান্নানের সুযোগ্য সম্পাদনায়, আপাততঃ তার প্রথমাংশ সুসংবদ্ধ ভাবে পাঠকের হাতে পৌঁচেছে এবং এ প্রত্যাশা অস্বাভাবিক নয় যে, সম্পাদিত অবশিষ্টাংশ অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে এবং বাঙ্গালী পাঠকের বহুদিন-পোষিত এক উৎকট অভাব দূরীকরণে সমর্থ হবে।

একথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, মীর মশাররফ হোসেন উনবিংশ শতকের মুসলিম সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রথম শক্তিমান গদ্য-লেখক তথুনন, সমসাময়িক কালের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তথাপি তাঁর সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল পাঠকের অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা প্রসঙ্গে খ্যাতিমান সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-সাধক চরিতমালা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (মীর মশাররফ হোসেন, পৃষ্ঠা ৪৮) মর্মান্তিক অভিযোগ উত্থাপিত করেছেন। এবং তা শুধু অর্ধ শতাব্দী পূর্বেকার পাঠক-সম্পর্কে সত্য নয়, সাম্প্রতিককালের পাঠক-সম্পর্কেও অভ্রান্ত। অথচ ইদানিং পাঠকমহলের কৌতূহল বেড়েছে অনেক অকিঞ্চিৎকর লেখক-সম্পর্কেও। সত্যবতঃ তাঁরা পরের মুখে ঝাল খাওয়ার স্বাদ গ্রহণে যতখানি তৎপর,

আপন রচনা-ব্যবহারে ততখানি উৎসাহী নন। সে জন্য মীর মশাররফ হোসেনের মত গুরুত্বপূর্ণ লেখকের সমগ্র রচনাবলীর একটি প্রামাণ্য সংকলন এতদিন অসম্পন্ন থেকে গেছে। তথাপি তাঁর রচনার মূল্যায়নে সর্বত্র সমালোচকবৃন্দের উদ্দীপনা স্তিমিত হয়নি, কোন অনিবার্য অন্তরায় তাঁদের গন্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি—সমালোচকবৃন্দের এই অপরূপ আচরণে, ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান কৌতুক অনুভব করেছেন, 'ফৌটা যেখানে তৈরী, কপাল সেখানে নেই।' 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা'; লেখকের নিবেদন, পৃষ্ঠা ।/, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।

তাই ডক্টর কাজী আবদুল মান্নানের এ জাতীয় গ্রন্থ-সম্পাদনা বিবিধ কারণে অভিনন্দন-যোগ্য। এক—তিনি পাঠক সমাজের একটি সঙ্গত অভাব দূর করেছেন। দুই—তিনি বিশিষ্ট সমালোচকদের ইতিপূর্বে 'তৈরী ফৌটার' জন্য একটি প্রশস্ত 'কপাল' সরবরাহ করেছেন।

এ কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, প্রায় পনের বৎসর পূর্বে বাংলা একাডেমী কর্তৃক মীর মশাররফ হোসেনের সমগ্র রচনাবলী সংকলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পড়ে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নানের উপর। তিনি ১৯৬৫ সালের মধ্যে ষোল খানি সম্পূর্ণ ও তিন খানি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। এ ছাড়া যে আটটি গ্রন্থ তিনি লণ্ডন ও কলকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দেখার সুযোগ পান, তার সংকলিত অংশবিশেষ এবং বিস্তৃত পরিচয় তিনি সংগ্রহ করেন। ডক্টর মান্নান কর্তৃক ১৯৬৫ সালেই এগুলি সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয় এবং তখন 'বিষাদ সিন্ধু', ও 'জমিদার দর্পণ' ছাড়া মীর মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ রচনাই এ দেশের পাঠক সমাজে অজ্ঞাত ছিল। তখন তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ পেলে তাদের আকর্ষণীয়তা এবং উপযোগিতা অনেক ব্যাপক হ'তো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নানা রকম বিপর্যয়ে, বাংলা একাডেমী কর্তৃক 'রচনা সম্ভার', (প্রথম খণ্ড) প্রকাশেই প্রায় একযুগ বিলম্ব ঘটেছে। ইতিমধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের একাধিক রচনা বিক্ষিপ্তভাবে

প্রকাশিত হয়েছে। (সম্পাদকের ভাষ্য অনুযায়ী মোট পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হবে ; শোনা যায় ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ সমাপ্ত প্রায়) আশা করা যায়, বর্তমান স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অতি দ্রুত অপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়ে, পাঠকের প্রত্যাশা পূর্ণ করবে।

বর্তমান গ্রন্থে চৌদ্দ পৃষ্ঠায় সুচিন্তিত ভূমিকা ও বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় সুবিন্যেষিত গ্রন্থ-প্রসঙ্গ সহ মোট আট খানি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া সন্নিবেশিত হয়েছে প্রাসঙ্গিক পাদটীকা, যেখানে বানান ও ব্যাকরণ-ঘটিত প্রমাদ সতর্কভাবে নির্দেশিত হয়েছে। সর্বত্র সম্পাদক সাহেব মূলগ্রন্থ অনুসরণ করেছেন ; কোথাও অনুমান ও বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে মূল রচনার সংশোধিত রূপ প্রকাশ করেননি ; সম্পাদকের এই নির্লিপ্ত সততা বর্তমান গ্রন্থটিকে অধিকতর প্রামাণিক করে তুলেছে, এবং অবান্তর প্রক্ষিপ্তির সম্ভাবনাকে বিদূরিত করেছে। সম্পাদনার এই পদ্ধতিটি কৌশলগত যাথার্থ্যে আকর্ষণীয়।

সংকলিত আটটি গ্রন্থের মধ্যে 'রত্নবতী' থেকে 'এর উপায় কি' পর্যন্ত পাঁচটি গ্রন্থ কালানুক্রমিক ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। ষষ্ঠ গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' আগেও বর্তমান সংকলনে স্থান পায়নি, সম্ভবত পরবর্তী খণ্ডগুলির আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং আয়তনের সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। সপ্তম গ্রন্থ 'সংগীত লহরী' যেহেতু সময়মত সংগৃহীত হয়নি, সুতরাং সে স্থান পেয়েছে সর্বশেষে। অষ্টম এবং নবম গ্রন্থের কালানুক্রম যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে।

সম্পাদিত রচনাবলীর ভূমিকায় প্রফেসর কাজী আব্দুল মান্নান যে আলোচনাটি সন্নিবেশ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা স্মরণ-যোগ্য যে, বাংলাদেশের সমালোচনা সাহিত্য, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় যেমন কনিষ্ঠ তেমন অপরিণত, তথাপি স্বল্প-সংখ্যক মননশীল লেখক, যাঁরা এই শাখায় যথেষ্ট সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান অন্যতম ব্যক্তিত্ব। সমালোচনা যে যথার্থ আলোক

ও লোচনের সার্থক সংযোগ যা অনগ্রসর পাঠক এবং অগ্রসর লেখকের মধ্যে সম্যক সেতুবন্ধ, তা বিভাগোত্তর কালে কাজী আব্দুল মান্নান প্রমুখ বিরল সংখ্যক লেখকবৃন্দের মধ্যেই লক্ষণীয়। স্মরণযোগ্য এই সমালোচকের গতিবিধি মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর দৃষ্টির এই দূর-বিস্তৃতি এবং গভীরতা পাঠকমাত্রেরই প্রশংসার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে যিনি দোভাষী পুঁথির উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করেন, এবং উনবিংশ শতকের সাহিত্য-সভায় মুসলিম লেখকবৃন্দের অবদান প্রথম সুশৃঙ্খল এবং সুসমঞ্জস-ভাবে নিরূপণে সাফল্য অর্জন করেন, তিনি আরেকবার তাঁর প্রাগ্রসর সমালোচন কুশলতার পরিচয় প্রমূর্ত করলেন বর্তমান রচনা-সম্ভারের ভূমিকা ও গ্রন্থ-প্রসঙ্গ আলোচনায়।

একথা সর্ববাদিসম্মত যে, মীর মশাররফ হোসেনের প্রধান পরিচয়, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান গদ্য-শিল্পী, গদ্য-শিল্পের সুষমা-বর্ধনে তাঁর অবদান কোন অংশে সমসাময়িক হিন্দু লেখকদের তুলনায় ন্যূন ছিল না। গদ্যভঙ্গীর অনন্যতা এবং উৎকর্ষে তিনি রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকবৃন্দের সগোত্র ছিলেন, ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান ভূমিকাংশে অবান্তর প্রসঙ্গ বর্জন ক'রে মীর মশাররফ হোসেনের ভাষাশৈলীর এই প্রধান দিকটি উদ্ঘাটিত করে তুলেছেন। মুখ্য প্রসঙ্গ নির্ধারণের এই ঋজুদীপ্ত সাফল্য তাঁর পরিণত সমালোচনশৈলীর সার্থক প্রস্তাবনা।

ডক্টর মান্নান বেশীদূর অগ্রসর না হয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন মশাররফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ, রত্নবতীর গদ্য-নমুনা; এবং পূর্বসূরী রাম রাম বসু, রামমোহন রায়, ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় গদ্য-উদাহরণের প্রেক্ষিতে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন মশাররফ হোসেনের গদ্য ভঙ্গিমা এবং আদৌ বিশ্লেষণ না করে এই কঠিন প্রসঙ্গটি, পাঠকের

বিচারবোধ ও বিবেচন-শক্তির কাছে উপস্থাপিত করেছেন। পাঠকবৃন্দ এই সুগ্রথিত নমুনাগুলি পরীক্ষা করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, গদ্য-শিল্পের আসরে মীর মশাররফ হোসেনের আসনও যথেষ্ট অলঙ্কৃত, এ ক্ষেত্রে ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নানের পদ্ধতি সাফল্য অর্জন করেছে একারণে যে তিনি সমালোচনা-সাহিত্যে মূলতঃ সংশ্লেষণ-পন্থী। খুব সংক্ষেপে, বিশ্লেষণ যথাসাধ্য বর্জন ক'রে তিনি বিষয়ের কেন্দ্রীভূত তাৎপর্য ও সৌন্দর্য পাঠকের অনুভূতি রাজ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেন। একজন সার্থক কবির মত তিনি নিজে অন্ধ বলেন, এবং পাঠককে বিস্তর বলান, আর একটি চরণের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করে দেন একাধিক অনুক্ত চরণ, যেখানে পাঠক-কল্পনা অনায়াসে সক্রিয় হ'তে পারে। তিনি পাঠকের অগ্রাভিযানে সূচনায় সাহায্য করলেও, তাকে বরাবর নির্ভরশীল রাখেন না, পাঠক অচিরেই অনুভব করেন যে, তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন। পাঠকের এই সচেতনতা এবং স্বাবলম্বন-শক্তির বিকাশে ডক্টর মান্নানের সহযোগিতা যাদুকরী শক্তির মত কাজ করে।

ডক্টর মান্নানের সংহত ভঙ্গী সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে যে দৃঢ়তা প্রকাশ করে তা আবেগবহুল নয়, বরং যুক্তি নির্ভর। তাই পাঠকও অজ্ঞাতসারে তাঁর পূর্ব সংস্কার ও গতানুগতিক ধারণা বিসর্জন দেন।

বর্তমান ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার ঘটেছে। ভাষা-শিল্পী মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে পাঠকের পূর্বধারণা যাই-ই-থাকুনা কেন তিনি অনুভব করেন ডক্টর মান্নানের মতের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। সেও মনে করে, "তাঁর (মীর মশাররফ হোসেনের) ভাষা সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুকরণ বা অনুসরণ করেছেন।..... কাজেই মীর মশাররফ হোসেনকে আমরা উনবিংশ শতকের প্রথম মুসলমান গদ্য শিল্পী বলে আখ্যায়িত করতে পারি।..... তিনি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক এবং মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গদ্য সাহিত্যিক।" (ভূমিকা, মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃষ্ঠা-৮)।

অবশ্য তথ্য—সংযোজনের ক্ষেত্রেও ডক্টর কাজী আব্দুল বায়ান ন্যূনতম আবেগ দ্বারা পরিচালিত হন না। তাই মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখককে তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র-প্রভাবিত মনে না হলেও বিদ্যাসাগর প্রভাবিত মনে হয়েছে; এবং সত্যের স্বার্থে তিনি তা অকপটে উচ্চারণ করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন ডক্টর বায়ান। সেখানে ছত্রিশখানি গ্রন্থের কথা উল্লেখিত হলেও, যে সব গ্রন্থ আদৌ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, অথবা যে সব গ্রন্থ বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে, কিন্তু সমগ্রীরে দেখা যায়নি, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তা নির্দেশিত হয়েছে। সংগ্রহণার ক্ষেত্রে সর্বত্র এই যৌক্তিকতা সততা অব্যাহত রাখার প্রয়াস আছে।

রচনা-সম্ভারের শ্রেণীকরণে ডক্টর বায়ানের বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধির গভীরতা ও বিচার শক্তির তীক্ষ্ণতা প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রেণীকরণের প্রথম ধারায় রয়েছে, পুঁথি সাহিত্য-প্রচলিত কাহিনী-নির্ভরতা এবং এই ধারায় সহজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, শিল্পমূল্য ও জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে বহু ব্যবধান-বিশিষ্ট গ্রন্থাবলী, যেমন অধ্যাত্ম রত্নবতী এবং 'বেহুলার গীতাভিনয়' স্থান পেয়েছে প্রখ্যাত 'বিষাদ সিন্ধুর' সঙ্গে। ভিন্ন ধর্মীয় প্রসঙ্গও এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর জাতিগত ঐক্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটায় না। দ্বিতীয় ধারায় আসে সমাজের বাস্তব অবস্থা-ভিত্তিক রচনা; যেমন অমিদার দর্পণ, এর উপায় কি, উদাসীন পথিকের মনের কথা, টালা অভিনয় ও গাজী মিয়ার বস্তানী। এ ক্ষেত্রে নাটক প্রহসন উপন্যাস প্রভৃতি ভিন্ন শাখায় রচনাবলী বিষয় বস্তুর সমতায় একত্র-গ্রথিত হয়েছে। তৃতীয় ধারায় তিনি সঙ্গত কারণেই 'মদিনার গৌরব', 'এসলামের জয়' প্রভৃতি গ্রন্থকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, ধর্মীয় নীতি ও উপদেশ-মূলকতা এই ধরণের অন্বয়কে অনিবার্য করে তুলেছে। চতুর্থ ধারায় এসেছে জীবনীমূলক রচনা, এতে স্থান পেয়েছে 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুম'। বিষয়বস্তু-নির্ভর এই শ্রেণীকরণ যে কতখানি বিতর্ক-নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত তা পাঠকমাত্রই অনুধাবন করেন। এই জন্য 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরীসেতু', কিংবা 'গাজীর মহত্বের' মত

পদ্য রচনার জন্য কোন শ্রেণীকরণের প্রয়োজন হয়না অথবা 'বিবি কুলসুম', 'আমার জীবনী'র সঙ্গে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কণ্টকিত পংক্তি-ভোজনের দরকার পড়ে না ; (যেমনটি ঘটেছে, মুনীর চৌধুরী কৃত 'নীল দরিয়া', যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর, 'উদাসীন পথিকের মনের কথাকে আত্মজীবনী মূলক পারিবারিক কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যে বিষয়ে পাঠকবৃন্দ একমত নাও হ'তে পারেন)।

ডক্টর মান্নান গ্রন্থটির ভূমিকায় পূর্বসূরী হিসেবে 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালার' রচয়িতা ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা কখনি ব্যক্তিগত আবেগ-প্রকাশক হয়ে দাঁড়ায়নি তা একজন সংগবেষকের যথার্থ গুণ-গ্রাহিতার স্বাক্ষরবাহী। প্রকৃতপক্ষে এই অনুসন-ান গবেষকটি প্রথম মীর মশার্রফ হোসেন সম্পর্কে বিস্তৃত অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন এবং অশেষ শ্রম-সহকারে তথ্য সংগ্রহ ক'রে সব-অতিক্রান্ত অথচ বিস্তৃত-প্রায় এই শক্তিমান মুসলিম লেখক সম্পর্কে গবেষণা-কর্মের ভিত্তি ভূমি প্রস্তুত করেছেন। সেজন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা সম্পর্কে ডক্টর মান্নান সচেতন। আত্মপ্রচার বর্জন ও নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা ডক্টর মান্নানের স্বভাবজ। তাই তাঁর শ্রদ্ধাবোধ শুধু পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ ও আপরাক সিদ্দিকীই লাভ করেননি, তাঁর সমীহের সমভাগী হয়েছেন উত্তর-সূরী ডক্টর আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী এমনকি তরুণতর আবুল আহসান চৌধুরী তাঁর সংকলিত ষোলখানি গ্রন্থ এবং আটখানি গ্রন্থ পরিচয়ের বাইরে, মীর মশার্রফ হোসেনের ব্যক্তিত্ব নিঃশেষিত বলে, তাই তিনি মনে করেন না, সংকলনে ও গবেষণায় উক্ত সূরীর সাফল্যকে তিনি অখিল স্বীকৃতি জানান এই বলে, "আশাকরি আগামী দিনে কোন যোগ্যতর সাহিত্যিক আমাদের অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করবেন।" (মশার্রফ রচনা সম্ভার (ভূমিকা) পৃষ্ঠা-১৩) এখানে যোগ্যতর এবং 'অসম্পূর্ণতা' শব্দ দুটি প্রয়োগের পশ্চাতে যে মানসিকতা কাজ করেছে, তা যে যথেষ্ট নম্র এবং নমনীয়, পাঠক তা পরম সন্তোষে উপলব্ধি করেন এবং সংগবেষকের এই বহৎ গুণটির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন।

'গ্রন্থ-প্রসঙ্গ' অংশে ভক্টর মান্নান সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ যে বিশ্লেষণী দান করেছেন তার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, বিষয় তেমনি চিত্ত-গ্রাহী। এই বিশ্লেষণে কোথাও কষ্ট-কল্পনার প্রশ্রয় নেই, উচ্ছ্বাস যথাসাধ্য বর্জিত এবং আবেগ পরিশীলিত হয়েছে সুরুচিত মননের সুচারু নিয়ন্ত্রণে। এখানে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে তা একান্ত নির্মোহ। তাই মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম রচনা রত্নবতীর বিস্তৃত পরিচিতি দানে ভক্টর মান্নানের প্রাথমিক অবদান নেহাৎ সত্য-ভাষনের তাগিদেই এসেছে, এবং পরবর্তী গবেষকদের স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতিকে তিনি বিন্দুমাত্র নিস্পৃহতার দ্বারা সমমূল্য দান করেছেন।

•

ভক্টর মান্নান প্রথম যুগের মুসলিম গদ্য লেখক মোন্সী শামসুদ্দীন মহম্মদ সিদ্দিকী, মুন্সী আজিমুদ্দীন, মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন প্রমুখের গদ্য-রচনার পরিপ্রেক্ষিতে রত্নবতীর গদ্য ভঙ্গীকে পরীক্ষা করেছেন, এবং যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মীর মশাররফ হোসেন প্রথম মুসলমান গদ্য শিল্পী। তাঁর প্রথম গদ্য গ্রন্থেই সুললিত এবং ঋজিষ্ঠ ভাষার যথাযথ ব্যবহার হয়েছে। 'রত্নবতী' সম্পর্কে ভক্টর মান্নানের সংহত এবং লক্ষ্য-ভেদী বিশ্লেষণ মীর মানসের রহস্যময় নিকেতনের ছায়াপাতে রমণীয় হয়ে ওঠে—"গল্পে রূপকথার মত অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাব থাকলেও এর মধ্যে লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসারও প্রতিফলন ঘটেছে। মশাররফ হোসেনের পিতা ছিলেন খ্যাতিসম্পন্ন জমিদার, অনেকটা নিজের বুদ্ধির দোষেই তিনি তাঁর বিশাল সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেন। ফলে জমিদার ঘরে জন্মেও লেখককে সংসার জীবনে প্রথম থেকেই জীবিকার তাড়নায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার দ্বারদেশে প্রবেশ করেও তাঁকে খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়েছে। ·····সুকুমার ও সুনন্তের বিতর্কের মধ্যে তরুণ শিল্পী হয়ত তাঁর আত্মজিজ্ঞাসার জবাব খুঁজেছেন।" (মশাররফ রচনা সম্ভার (গ্রন্থ প্রসঙ্গ) পৃষ্ঠা—৫) গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোন বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। এক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত ভাষ্যটি আমাদের

'সবেধন নীলমণি' ছিল। এমনকি পরিশ্রমী গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতির পরোক্ষ উৎস (Secondary source) ব্যবহার করেছেন।

ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান এ গ্রন্থটির পরিচিতি প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃতি ব্যবহার করলেও, মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—"লেখকের বাড়ীর কাছে গৌরী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গোরাই খ্রিজ রচিত। সমগ্র কাব্যটি ১৪ অক্ষরের পয়ারে লেখা, কবিতায় অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি আছে, আর আছে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব।" (মশাররফ রচনা সম্ভার (গ্রন্থ প্রসঙ্গ) পৃষ্ঠা—৬)।

•

'বসন্ত কুমারী'র প্রস্তাবনা অংশে নট-নটীর কথোপকথনে সমসাময়িক কালে মুসলিম লেখক সম্পর্কে হিন্দু সমাজে অবজ্ঞার যে তথ্যটি উপস্থাপিত হয়, সেটির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে ডক্টর মান্নান নিশ্চয়তা প্রকাশ করেন। নরেন্দ্রসিংহ ও শরৎকুমারের সংলাপে ব্যবহৃত 'কাদম্বরী প্রসঙ্গ' থেকে তিনি গ্রন্থকারের সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যয়ন সম্পর্কে যে সংশয়হীনতা প্রকাশ করেছেন, পরবর্তী গবেষকবৃন্দের কাছে তা যথোচিত গুরুত্বলাভ করলে, মীর মশাররফ হোসেনের অধ্যয়ন পরিধি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটতে পারে। পরিশেষে ডক্টর মান্নান বসন্তকুমারী নাটকে আধুনিক উপন্যাসের যে প্রধান উপজীব্য দেহাশ্রিত কামনা বাসনা, তার পূর্বাভাস যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন।

এর উপায় কি ? —গ্রন্থ সম্পর্কে ডক্টর মান্নানের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। "সেকালে এক শ্রেণীর পুরুষের ঘরের বৌয়ের প্রতি অবহেলা, বেশ্যা ও মদের প্রতি কুৎসিত আকর্ষণ তথাকথিত হাকিমদের গোপন কার্যকলাপ, হুগলি কলেজ পড়ুয়াদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতির ব্যঙ্গাত্মক চিত্র বইটিতে পাওয়া যায়।" (মশাররফ রচনা সম্ভার পৃষ্ঠা—১৬)। এই গ্রন্থে পরিকল্পিত মীর-মানস, সম্পাদক সাহেবের কাছে এভাবে ধরা

পড়েছে, 'ভয়ে ভীত বা নিন্দায় সঙ্কুচিত না হয়ে মানুষের উপকার সাধনের বহৎ কামনা মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-সাধনার মধ্যে জাগ্রত ছিল—'এর উপায় কি—তাঁর সে চেতনার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি'। —মশাররফ রচনা সম্ভার (গ্রন্থ প্রসঙ্গ) পৃষ্ঠা—১৭

জমিদার দর্পণ নাটকটির প্রথম সংস্করণের জন্য ডক্টর মান্নান সঙ্গত কারণে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন। এ গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব যে ভূমিকা লেখেন, ডক্টর মান্নানের মতে তা গ্রন্থটির যথাযথ মূল্যায়ণ। পরবর্তীকালে মুনীর চৌধুরী সাহেব 'মীর মানস' গ্রন্থে 'জমিদার দর্পনে'র যে বিরূপ সমালোচনা করেন, ডক্টর মান্নান সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করে' সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পাঠকের ওপরেই অর্পণ করেছেন। এই মানসিকতা সম্পাদকের সমন্বয়বোধের স্বাক্ষর বহন করে। ব্যক্তিগত ভাবে কারো কারো মত গ্রহণীয় বা বর্জনীয় হতে পারে, কিন্তু তার জন্য অসহিষ্ণুতা-প্রদর্শন, কিংবা উষ্মা-প্রকাশ সভ্য সমাজে গ্রহণীয় নয়, সমালোচনার ক্ষেত্রেও সেই আচরণ বিধি আরোপ করে' ডক্টর মান্নান দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন।

'জমিদার দর্পণ' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অসহিষ্ণুতার মূল নিহিত ছিল এর প্রশাসন-বিরোধী স্বভাবে। এ-গ্রন্থ প্রচলিত হলে, জমিদার বৃন্দের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, এবং সমসাময়িক প্রশাসনে বিপর্যয় ঘটবে বলেই গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচারণা তাঁকে বিচলিত করেছে, অথচ, গ্রন্থটিতে অত্যাচারীর যে পৈশাচিক চিত্র উন্মোচিত হয়েছে, তা তুলনারহিত; লেখকের অকৃত্রিম মানবতা ও জীবন-প্রীতি এ ধরণের চিত্রের দুর্লভ রচয়িতা। এ গ্রন্থ প্রসঙ্গে শুধু ডক্টর মান্নানেরই প্রশস্তি বাক্য উৎসারিত হয় নি—ডক্টর আবদুল আউয়ালও অনুরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন—"সত্যি এটি প্রশংসনীয় যে, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অপকর্ম প্রকাশ করার সৎসাহস মশাররফ দেখিয়েছেন" কিংবা "মশাররফ তাঁর দ্বিতীয় নাট্যরচনা জমিদার দর্পণে এমন একটি বিষয়-বস্তু অবতারণা করেন, যা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না"—মীর মশাররফের গদ্য-রচনা, পৃষ্ঠা—২১০।

ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান এ প্রসঙ্গে বলেন, "মুসলমান সাহিত্যিক দ্বারা মুসলমান চরিত্র নিয়ে কাহিনী রচনারও সূচনা হয়েছে জমিদার দর্পণেই। এর আগে মুসলমান সাহিত্যিকগণ নকসা, প্রহসন, গল্প প্রভৃতিতে যে সব আখ্যান রচনা করেছেন তার চরিত্রগুলো সবই হিন্দু।" —মশাররফ রচনা সম্ভার (গ্রন্থ-প্রসঙ্গ) পৃষ্ঠা—১৪। সংগীত লহরী (১ম খণ্ড) মীর মশাররফ হোসেনের সপ্তম গ্রন্থ। গ্রন্থটি বহুদিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য ছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর আব্দুল আউয়ালের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। "একই বছরে (১৮৮৭ খৃঃ) মশাররফের সংগীত লহরী প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য।" —(মীর মশাররফের গদ্য রচনা—পৃষ্ঠা-২১) এ কারণে সম্পাদক সাহেব প্রাথমিকভাবে গ্রন্থটি প্রসঙ্গে কলকাতার লাইব্রেরীতে—কৃত তাঁর নোটগুলি ব্যবহার করার মনস্থ করেন, সঙ্গে থাকে সংকলিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গীত। সংগীত লহরীর এই উপকরণগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডক্টর মান্নানের প্রাথমিক নোটগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সংগীত লহরীকে পাঠক-সমাজে প্রথম পরিচিত করেন এ ভাবে, "সংগীত লহরী লেখকের খণ্ড কবিতা এবং গান রচনার নিদর্শন এতে কোন গদ্য রচনা নেই, কোন ভূমিকা নেই। বইয়ের শুরু থেকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে একটির পর একটি গান ছাপা হয়েছে। গানগুলির নাম দেওয়া হয়নি, নম্বর দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন গানের সুর ও তাল নির্দেশ করা হয়েছে।" —মশাররফ রচনা সম্ভার-গ্রন্থ প্রসঙ্গ-পৃষ্ঠা—১৮। ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান মূল গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধি স্থানীয় যে আটটি গান সংগ্রহ করেছেন, তা এ পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; গানগুলির বিষয়-মহিমা, ও ভাব-গৌরব পাঠকের চিত্ত-গ্রাহী এবং তাদের মনোরঞ্জনে সম্পাদক সাহেবের মার্জিত রস-বোধের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

একথা উল্লেখযোগ্য যে মশাররফ রচনা-সম্ভার (প্রথম খণ্ড) মুদ্রণ-কালে কুষ্টিয়ার আবুল আহসান চৌধুরী, সংগীত লহরীর একটি কপি সংগ্রহ করতে সমর্থ হন এবং বিস্তারিত ভূমিকা-সহযোগে গ্রন্থটির সম্পাদনা করেন। তিনি গ্রন্থটি প্রসঙ্গে অনেক নূতন তথ্য উপস্থাপিত করেছেন।

ডক্টর মান্নান মীর মশার্‌রফ হোসেনের রচনাবলীর সামগ্রিক স্বার্থেই এই ক্ষুদ্র গীতি গ্রন্থটি রচনা-সম্ভারের শেষাংশে সংযুক্ত করেন এবং অনেকটা কৈফিয়তের ভাষায়, তাঁর বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে তিনি উল্লেখিত তরুণ গবেষকের নিষ্ঠা এবং 'নিরন্তর প্রচেষ্টা'র যেমন প্রশংসা করেন, তেমনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানান তাঁর সম্পাদক-সুলভ সতর্কতার।

ডক্টর মান্নান পাদটীকায় ৮৮ সংখ্যক গানের সঙ্গে ফিকির চাঁদের বিশিষ্ট গানটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন কারণ সমসাময়িক এই গীতিকারের গানের সঙ্গে মশার্‌রফ হোসেনের গানের সাদৃশ্য আছে। এছাড়া কাঙাল হরিনাথের প্রভাবও মীর মশার্‌রফ হোসেনের বিশেষ বিশেষ গানে লক্ষণীয় হয়েছে, সে তথ্যও ডক্টর মান্নান উপস্থাপিত করেছেন। এবং গ্রন্থটি সতর্ক-ভাবে পাঠ করলে গবেষক পাঠকের একথা মনে হ'তে পারে যে, এটি কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়, কোন কেন্দ্রীয় ভাব-সংহতি এখানে গড়ে ওঠেনি, কারণ গানগুলির প্রায় অধাংশ গ্রন্থরচনার পূর্বে প্রায় চৌদ্দ বৎসর ধরে', 'বসন্তকুমারী', 'জমিদার দর্পণ', এবং 'উপায় কি' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনে পাত্র পাত্রী-দ্বারা গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই, বিভিন্ন নাটক-অন্তর্ভুক্ত চরিত্র, ঘটনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী, গানগুলির বিষয় ও ভাবধারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, সম্ভবতঃ ব্যবসায়িক স্বার্থে গানগুলি লেখক-কর্তৃক সংকলিত হ'য়ে একটি গ্রন্থরূপ ধারণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক রূপের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, এমনকি সংকোচন ঘটে। গো-জীবন সম্পর্কে ডক্টর মান্নানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটি যথেষ্ট তথ্যপূর্ণ।

•

গো-জীবন প্রকাশিত হ'লে মুসলিম সমাজের অংশ বিশেষ, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, এই বিক্ষোভের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ যেমন ডক্টর মান্নান উপস্থাপিত করেছেন তেমনি প্রশংসা করেছেন মীর-মানসের মুক্ত-বুদ্ধি ও উদার অসাম্প্রদায়িকতার।

'বেহুলা গীতাভিনয়' গ্রন্থটি রচনা-সম্ভারে সংকলিত না হ'লেও ডক্টর মান্নান যখন কলকাতার কোন এক লাইব্রেরীতে বইটি পড়বার সুযোগ পান, তখন বইটির উপর যে নোট রচনা করেন, তা এখানে উপস্থাপিত হয়েছেন। এ জাতীয় নোট-রচনায় তিনি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। পাত্র পাত্রীর প্রধান সংলাপগুলি উদ্ধৃত ক'রে, ঘটনা সমূহ এমনভাবে সংযুক্ত করেছেন; যাতে কাহিনীর ধারাবাহিকতা এবং নাট্য-চমক একাধারে উপস্থিত থাকে; কাহিনীর গতানুগতিক বর্ণনায় চাইতে, পদ্ধতিটি মূল রচনার আস্বাদন-দানে অধিকতর সহায়ক।

সংকলনের শেষ পরিচিতিটি 'উদাসীন পথিকের মনের কথায়'। গ্রন্থটি বহুল আলোচিত না হলেও এ সম্পর্কে এ যাবৎ একাধিক সার-গর্ভ আলোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য সাধক চরিতমালায় এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, তা ছিল মূলতঃ বশীরুদ্দিনের মূল গ্রন্থের মুখবন্ধ-নির্ভর। বিভাগোত্তরকালে গ্রন্থটি সম্পর্কে গবেষক সুলভ অনুসন্ধিৎসার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ডক্টর কাজী আবদুল মান্নানের মধ্যে।

তিনি গ্রন্থটির উপর যে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ রচনা করেন তা প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমী পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) ১৩৬৫ সনের শ্রাবণ মাসে। পরবর্তী বিশিষ্ট আলোচনা দেখা যায় প্রায় ছয় বৎসর পরে, ডক্টর আনিসুজ্জামানের, (১৩৭১ সনের শ্রাবণে প্রকাশিত), গবেষণাগ্রন্থ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে। একই বছরে প্রায় ছয় মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত মুনীর চৌধুরীর 'মীর মানসে' গ্রন্থটির সম্পর্কে বিস্তৃত পর্যালোচনা উপস্থিত হয়। এবং এ সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে অপর মূল্যবান আলোচনা দেখা যায়, ডক্টর আবদুল মাউয়ালের গবেষণা-গ্রন্থ "মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য রচনায়।" (প্রকাশকাল : ভাদ্র, ১৩৮২) বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত ডক্টর মান্নান কৃত সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটির মূল্যায়ণের জন্য এসব আলোচনার তুলনা-মূলক উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি সম্পন্ন করেছেন, তা হলো গ্রন্থটির শ্রেণীকরণ। তিনি মনে করেছেন, গ্রন্থটি উপন্যাস; ডক্টর মায়ান গ্রন্থটিকে উপন্যাস হিসেবে 'সার্থক' মনে না করলেও এর বিস্ময়কর কাহিনীগুণ সম্পর্কে তিনি সচেতন এবং এটিকে সমাজের বাস্তব অবস্থা ভিত্তিক রচনা নামে তিনি অভিহিত করেন। বিস্তৃত তথ্য-সহযোগে তিনি গ্রন্থে-বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করেন—('উদাসীন পথিকের মনের কথা' বাংলা একাডেমী পত্রিকা ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৯-৫৯)

ডক্টর আনিসুজ্জামান গ্রন্থটির বহু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন এবং এর ঐতিহাসিক পটভূমির ব্যাপকতাকে উপেক্ষা ক'রে মন্তব্য করেছেন গ্রন্থটিতে, "লেখকের পারিবারিক ইতিহাসের কিছু উপাদান আছে।" (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা ২৩০) এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে' মুনীর চৌধুরী সাহেব মনে করেন, "গ্রন্থটি আত্মজীবনীমূলক রচনা।" (মীর মানস, পৃষ্ঠা-৫২)।

পরবর্তীকালে গবেষক ডক্টর আউয়াল উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান করেন। 'গ্রন্থখানি মীর মশাররফের পিতার জীবনীমূলক', তথাপি "কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রাম" এর উপজীব্য। (মীর মশাররফের গদ্য রচনা, পৃষ্ঠা ৮৪ ও ৪)।

মুনীর চৌধুরী তাঁর 'মীর মানস' গ্রন্থে বর্তমান গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও তাঁর আলোচনা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ঘটেছে। পূর্বসূরী অরবিন্দ পোদ্দারের বঙ্কিম-মানসের অনুসরণে তিনিও মীর মানস গ্রন্থে মশাররফ মানসে সঙ্কটের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন, অথচ সঙ্কটের কোন নির্ভরযোগ্য প্রেক্ষিত তিনি নির্মাণ করতে সমর্থ হননি, সে কারণে তাঁর আলোচনা, ডক্টর আউয়ালের ভাষায়, "বাগাড়ম্বর বা দুর্বোধ্য শব্দ যোজনার অন্তরালে তাৎপর্যহীন হয়ে গেছে।" মীর মশাররফের গদ্য রচনা পৃষ্ঠা ২০৪ প্রকৃত পক্ষে মুনীর চৌধুরী সাহেব

গ্রন্থটিকে বীর মশাররফ হোসেনের প্রথম জীবনের আত্মজীবনী হিসেবে ধরে নিয়ে প্রাথমিক ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। এ কারণে, যে কাহিনী নির্মাণে শৈশব স্মৃতির চেয়ে, লোকশ্রুতি এবং বয়স্ক-কল্পনার অবদান প্রবল, তাঁর শিল্প-চেতনাকে তিনি ব্যক্তি চেতনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বীর মশাররফ হোসেনের যে খণ্ডটি মূলতঃ ব্যক্তির নিহিত, তাকে তিনি শিল্পী-সত্তার আরোপ করে যথার্থ বিচারে নিমজ্জিত হয়েছেন।

একথা অনেকেই জানেন, বীর মশাররফ হোসেনের পিতার মৃত্যু সূত্রে নীলকর কেনীর প্রতি বালক মশাররফের সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক, অথচ তাঁর অত্যাচারী, প্রজা-পীড়ক ও শোষক রূপটি শিল্পী মশাররফের ঘৃণাই বহন করেছে। সুতরাং কেনীর গুণগ্রাহিতার ক্ষেত্রে বয়স্ক মশাররফ, (যে সময়ে তাঁর ব্যক্তিসত্তা এবং শিল্পীসত্তা সমন্বিত হতে চেয়েছে) এর যে সঙ্কট তা তাঁর ব্যক্তিমানসেরই, শিল্পী মানসের নয়। ব্যক্তি মানসের এ জাতীয় সঙ্কট অতিক্রম যদি শিল্পী-মানসের পক্ষে অসাধ্য হয়, তাহলে উনবিংশ শতকের, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকল প্রধান লেখকই তার বলি হতে বাধ্য। কেননা এই লেখকগুলি আবির্ভূত হয়েছেন, যে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে তার স্বভাবেই ছিল এই দ্বন্দ্ব; —একাধারে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সেবী ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শোষক শ্বেতাঙ্গের প্রতি ঘৃণা। কিন্তু আসলে তাঁদের শিল্পী-সত্তা, ব্যক্তি-সত্তার এ সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলেই, তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে অবিনশ্বর শিল্পকর্ম।

কিন্তু জনাব চৌধুরী বিস্মৃত হয়েছেন যে, মশাররফ হোসেন শক্তিমান সাহিত্যিক। তাঁর ব্যক্তিমানসের সঙ্কট কখনও শিল্পী-মানসে প্রভাব বিস্তার করে না। এ কারণে গ্রন্থ-অন্তর্ভুক্ত সা-সোনার, প্যারীসুন্দরী, ভৈরবদত্ত, ব্যক্তি মশাররফের পিতার বিরুদ্ধ—পক্ষ হয়েও আপন শ্রেণিতে ভাস্বরতা পায়। অন্যদিকে বীর সাহেব, সৌলতন্নেছা যথাক্রমে তাঁর জনক, জননী হয়েও শিল্পীমনে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং খুশবন্ত হয়ে ওঠে পাপাচারী কেনী,

শিল্পী মনোরঞ্জনের ব্যক্তিগত সম্পর্কে অনুগৃহীত হয়ে নয়, শিল্পেই অত্যাগ্রহ প্রয়োজনে। তাই রূপ-তৃষ্ণায় ও পৌরুষে, অসংযত কামনায় ও প্রচণ্ড শক্তি-অস্তায়, সে বিষাদ সিন্ধুর এলিজের মত লম্পট ও নিষ্ঠুর হয়েও আপন মহিমায় আদ্যন্ত উদ্ভাসিত হয়। এমনকি নিয়তি-লাঞ্ছিত তার যে পতনের বৃত্তান্ত শেষ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়, তাও তার নায়কোচিত গুণাবলী অনুক্ষন করে না। এ সবই সম্ভব হয় শিল্পী মনোরঞ্জনের উত্তরণে, ব্যক্তি মনোরঞ্জনের পরাভবে।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এর সাহিত্য-মূল্য সম্পর্কে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান যথেষ্ট সচেতন। তাঁর মতে এটি মীর মশাররফ হোসেনের "শ্রেষ্ঠ রচনা।" (উদাসীন পথিকের মনের কথা—বাংলা একাডেমী সাহিত্য পত্রিকা, ২৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃষ্ঠা—৫৯)। প্রায় বিশ বৎসর পরেও তিনি বর্তমান গ্রন্থটির পরিচিতি-প্রসঙ্গে তাঁর পূর্বমত অবিচল রয়েছেন। তাঁর ভাষায় "যে শিল্পী ছিলেন সত্য-প্রকাশে নিঃসঙ্গ, অত্যাচারীর প্রতি নির্মম এবং নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমতাশীল, সে শিল্পীর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উদাসীন পথিকের মনের কথায়।" (মশাররফ রচনা সম্ভার, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পৃষ্ঠা ৪) এবং একথা সর্ব-স্বীকৃত যে, শিল্পীর আত্মালোচন যে রচনায় সর্বাপেক্ষা উদ্ভাসিত, শিল্প হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব তার করায়ত্ত। ডক্টর মান্নান 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বিতর্কে অগ্রসর হননি; অথচ তাঁদের বিরোধী বক্তব্য সমূহ উপেক্ষাও করেননি, সেগুলি সযত্নে চয়ণ করে বিচারের দায়িত্ব যুক্তি-বুদ্ধি সম্পন্ন পাঠকের ওপরেই অর্পণ করেছেন। সর্বত্রই অক্ষুণ্ণ রয়েছে তাঁর সম্পাদক সুলভ নিরাসক্তি।

●

সুতরাং যোগ্য হাতেই মশাররফ রচনা সম্ভার সম্পাদিত হয়েছে। বাংলা একাডেমী গ্রন্থটির মুদ্রণে ও প্রকাশনায় যে সুরুচি ও সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন তা বর্তমান সময়ে দুর্লভ। এ গ্রন্থ বহুল-প্রচারিত হওয়া উচিত, তাই গ্রন্থটির মূল্য নির্ধারণে অধিকতর বিবেচনা বাঞ্ছনীয়।

—আসাদুজ্জামান

(২)

'লৌকিক বাংলা'

(প্রথম বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা একত্রে) ।

জানুয়ারী-জুন, ১৯৭৮ । সম্পাদনায় আবদুল হাফিজ

'লৌকিক বাংলা' বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ-এর মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে । একটি পত্রিকার শুরুতেই প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার যুগ্ম সংখ্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ অভিনব বটে । বলা হয়েছে বছরে চারটি সংখ্যা বের হয়, জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই, অক্টোবরে । অনিয়মেই এ দু'টি সংখ্যার একত্রে আত্মপ্রকাশ পত্রিকা কর্তৃপক্ষের দুর্বলতাই প্রকাশ করছে ।

পত্রিকায় শুরুতে বলা হয়েছে, ''বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এতে ছাপা হয় । সূচীপত্র অনুসরণ করে দেখা যাক, এতে লোক ঐতিহ্য সম্পর্কিত কি কি গবেষণামূলক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে । এতে মোট নয়টি প্রবন্ধ, তিনটি মূল্যায়ণ সবশেষে ফোকলোর পরিষদের প্রতিবেদন সন্নিবেশিত হয়েছে । সূচী পত্রের অব্যবহিত পূর্ব পৃষ্ঠায় শত সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদের তালিকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ''উপদেষ্টা পরিষদ''টি বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদের না পত্রিকাটির তার কোন উল্লেখ নেই । ইংরেজী ফোকলোর কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে এর কোন যথার্থ প্রতিশব্দ 'বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ' তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত করতে পারেনি । অবশ্য এটা কোন দোষের নয় । কেননা বহু ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ এখনও আমরা খুঁজে বের করতে পারছি না, বা শব্দ খুঁজে পেলেও তা ব্যবহার করতে পারছি না ।

'ফোকলোর' এর ধারণাটি আমরা বিদেশ থেকে পেয়েছি। 'লোক-সাহিত্য' নামে এর একটি প্রতিশব্দ বাঙ্‌লায় প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথও এ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে লিখেছিলেন তাঁর প্রাচ্য ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া ইত্যাদি প্রবন্ধে।

বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে এই 'লোকসাহিত্য' বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন চলছে। বিশেষ করে, নৃতত্ত্বের সঙ্গে এর নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তবে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে কোন পঠন পাঠন আদৌ হচ্ছে না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নয়। ফলে নৃতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের বিশেষ ধারণা নেই। নৃতত্ত্বের বিষয়বস্তু মানুষ। নৃতত্ত্বের দুটি শাখা : প্রাকৃতিক নৃতত্ত্ব (Physical anthropology) আর সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব (Cultural anthropology)। প্রাকৃতিক নৃতত্ত্বে আদিমকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষের বিবর্তন, তার দেহের গঠন বৈশিষ্ট্য (দেহের দৈর্ঘ্য, মাথার আকার, মুখের গঠন, নাকের আকার, চোখের রঙ্, গায়ের রঙ্, মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও রঙ্) আলোচিত হয়।

নৃতাত্ত্বিকগণ প্রাচীনতম কঙ্কালাস্থি বিশ্লেষণ করে মানবজাতির শ্রেণী-করণ করে থাকেন। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিষয় হলো মানুষের সৃষ্ট যা কিছু তা। তার সৃষ্ট সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত সবই সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বিষয় বস্তু।

প্রাচীনযুগের মানুষ মুখে মুখে সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, সেই মৌখিক সাহিত্যই লোক সাহিত্যের উপজীব্য। অবশ্য লোক সাহিত্য আর শালীন সাহিত্য এ দুয়ের ভেদ রেখা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবু আমরা অলিখিত সাহিত্যকেই লোক সাহিত্য বলে থাকি। আর যে সাহিত্যের রচয়িতার সন্ধান জানা যায় না, তা-ও লোক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিদেশে ফোকলোর বলতে এই অলিখিত সাহিত্যকেই বুঝানো হয়। আমাদের ধ্যান ধারণাও পাশ্চাত্যের অনুকরণেই। মনে হয় বাংলাদেশ 'ফোকলোর পরিষদ'ও ঐ ধারণা অনুযায়ী গঠিত হয়েছে এবং তাদের পত্রিকাও ঐ ধারণার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। দেখা যাক 'লৌকিক বাংলা'

পত্রিকায় কি জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এবং প্রবন্ধগুলির বিষয় বস্তু কি ?

প্রথম প্রবন্ধ 'মন্ত্র' লিখেছেন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, মন্ত্রের ব্যবহার প্রাচীন সমাজে ছিল। রূপকথার গল্পে এ সব মন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রবন্ধ লেখক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসবে যে সব মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তার উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে অবশ্য এ সব মন্ত্রের ব্যবহার বাংলাদেশে কমে যাচ্ছে। বৃষ্টির জন্য মন্ত্র পড়া, অথবা অতি বৃষ্টির জন্য, রৌদ্রের জন্য মন্ত্র পড়া কিছুকাল আগেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। সর্প-দংশ ব্যক্তিকে মন্ত্রের সাহায্যে আরোগ্য করা এ দেশে এখনও প্রচলিত রয়েছে। প্রবন্ধ লেখক মন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের উদাহরণ দিয়েছেন প্রাচীন মনসা মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গল কাব্য থেকে। উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করার সময় প্রবন্ধ লেখক কোন্ গ্রন্থ থেকে কোন্ অংশ নিয়েছেন তা উল্লেখ না করায় [পৃ. ৪-৫, লৌকিক বাংলা, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা] পাঠকের পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। তা ছাড়া কিছু কিছু অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দিলে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হতো।

শিরালীদের মন্ত্র সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। 'আদিবাসী সংস্কৃতির কিছু কথা' প্রবন্ধ লিখেছেন আবদুল সাত্তার। জনাব সাত্তার উপজাতিদের সম্পর্কে অনেক লিখেছেন। এখানে আদিম সমাজের যৌনজীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের কাহিনীর অবতারণা করেছেন। সাত্তার সাহেব শুধু বাঙলাদেশের নয়, বাঙলার বাইরেরও অনেক উপজাতির সংস্কার সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছেন। ইংরেজীতে এ ধরণের পুস্তকের অভাব নেই। সাত্তার সাহেব বিভিন্ন পুস্তক থেকে এ সকল কাহিনী সংগ্রহ করে বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। এ জন্য তিনি অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র।

'সমকালীন সঙ্গীতের ধারা' লোক সঙ্গীত প্রবন্ধটি লিখেছেন মোস্তফা জামান আব্বাসী। লোক সঙ্গীত আর আধুনিক সঙ্গীত এ দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন আব্বাসী তাঁর প্রবন্ধে। আধুনিকীকরণের ফলে 'লোক সঙ্গীত' তার অনেকটা স্বভাব ধর্ম হারিয়ে ফেলেছে সত্য, কিন্তু

আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় লোক সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, এবং বহুল প্রচারিত হতে পারছে। কিন্তু লোক বাদ্য যন্ত্রগুলো ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে; লোক সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে এই বাদ্য যন্ত্রগুলির ব্যবহারও হওয়া উচিত; নইলে, এগুলি শুধু মিউজিয়ামের শো-কেসের শোভা বর্ধন করবে। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "সঙ্গীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীন-য়ে কিছু কিছু নতুন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তিনজন লেখকের রচনা "ধনা, ডাক ও খনার বচন' ও তেলেগু কৃষি প্রবাদ" পাঠ করে বুঝতে পারা যায় না, যে আনি নওয়াজ (বাঙলাদেশী বাঙলাভাষী) রক্তিৎকুমার রায় (ভারতীয়, বাঙলাভাষী) ডঃ বি রামা রাজু (ভারতীয়, তেলেগু ভাষী) একত্রে কিভাবে কোথায় প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। তবে ডাক খনার বচনের সঙ্গে ভারতীয় তেলেগু ভাষায়, বিহারী ভাষায় অনেকগুলির প্রবাদ এ প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকে পাঠকেরা মোটামুটি লাভবান হবেন। কোথাও জাপানী প্রবাদেরও উল্লেখ রয়েছে।

'লালন শাহ' সম্পর্কে বাঙলাদেশে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের যোগাযোগ ঘটেছিল এবং তার পরই লালন শাহ বাঙালীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠেন। এস, এম, লুৎফর রহমান 'লালন শাহ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লালন শাহের আবিষ্কারক কে এই নিয়ে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার মতে মুন্সী মুহম্মদ হাদেক ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'জালালাতোল ফোকরা' গ্রন্থে লালন সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন; তারপর আব্দুল ওয়ালী বাঙলার ফকীরদের সম্পর্কে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তাতে তিনি লালন শাহকে "renowned and the most melodious versifier" বলেছিলেন।

লুৎফর রহমান প্রচলিত অনেকের মতকেই এ প্রবন্ধে খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে আরও প্রামাণ্য গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। তবে লালন শাহের প্রসঙ্গে গোপেনদাওয়ার বা হুবুসের উপমা দেওয়ার কোন অর্থ নেই। গাইফুদ্দীন চৌধুরীর 'অষ্ট্রিক সংস্কৃতির শিল্প গৌরবিক উপাদান' প্রবন্ধে অষ্ট্রিকদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, সেখানে সুনীতি

কুমার চট্টোপাধ্যায়ের দোহাই দিয়ে বলেছেন "প্রকৃত জাতীয়-লোকেরাই প্রথম কৃষিকার্য ও এতদবলম্বনে সংঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে"। (পৃঃ ১২২, লৌকিক বাংলা) কিন্তু ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা কিন্তু ভিন্ন কথা বলেছেন। অষ্ট্রাল সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলার লোক সংস্কৃতির মিল রয়েছে। লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়াতেও বৃক্ষ, পাথর, পশুপক্ষী ফলফুল ইত্যাদিতে দেবত্ব আরোপ করা হতো এবং পূজা প্রচলিত ছিল। আবুল হাফিজের 'আইভরি শিঙ' সর্বশেষ প্রবন্ধ। এরপর তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা 'বুলায়ন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। সেলিনা হোসেনের 'শাসনে সোহাগে ভালোবাসা' প্রবন্ধটি না থাকলেই ভাল হতো। কেননা সমালোচনার বৈশিষ্ট্য এ প্রবন্ধে অনুপস্থিত। অনুরূপ ভাবে রবিউজ জামানের সমালোচনা 'ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর গ্রন্থ 'লোক সাহিত্য' অনেকটা অতিপ্রশংসাবাদে পরিণত হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধটি রণীন আল হেলালের "লোক সংস্কৃতির ছাত্র ও গবেষকদের জন্য সহায়ক কোষ"। এটি ওয়াকিল আহমদের "বাংলার লোক সংস্কৃতি" গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা।

পরিশেষে 'ফোকলোর পরিষদের কার্যাবলীর প্রতিবেদন (২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী = ১০৪ পৃঃ থেকে ১৭৭ পৃঃ পর্যন্ত) মুদ্রিত হয়েছে। যদি গতানুগতিকতার গবেষণার উদ্দেশ্যে এ পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে তবে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই। আর যদি ব্যক্তিগত প্রচারণার মাধ্যম হিসাবে এটাকে ব্যবহার করা হয়, তবে তা হবে জাতির জন্য সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যজনক।

একটি কথা মনে হয়, বাংলাদেশের সকল লোক বিজ্ঞানী বা লোক সাহিত্য অনুরাগীরা রাজধানী ঢাকায় বসবাস করেন। কার্যনির্বাহী সংসদে ঢাকার বাইরের কেউ আছেন কি ?

পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব, মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন। সে হিসাবে মূল্য খুব বেশী নয়, মাত্র দশ টাকা।

—মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

লেখক-পরিচিতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম

এম. এ (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)

চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া

এম. এ (রাজশাহী) পি-এইচ. ডি. (কলিকাতা)

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুর রহীম খোন্দকার

এম. এ. (রাজশাহী), পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুখলেসুর রহমান

এম. এ. (কলিকাতা), পি এইচ. ডি. (লণ্ডন)

পরিচালক, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী

আতাউল্লাহ্ আহমদ

এম. এ. (ঢাকা), এম এ. (মেস্টার)

অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম সাকলায়েন

এম. এ. (ঢাকা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা)

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ওয়াকিল আহমদ

এম. এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি. (ঢাকা)

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহানারা হোসেন

এম, এ, (ঢাকা). এম, এ, পি-এইচ. ডি, (লণ্ডন)

অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আসাদুজ্জামান

এম, এ, (কলিকাতা)

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

এম, এ, (ঢাকা). পি-এইচ, ডি, (লণ্ডন)

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়